শেখ দরবার আলম

নজরুলের নানান দিক

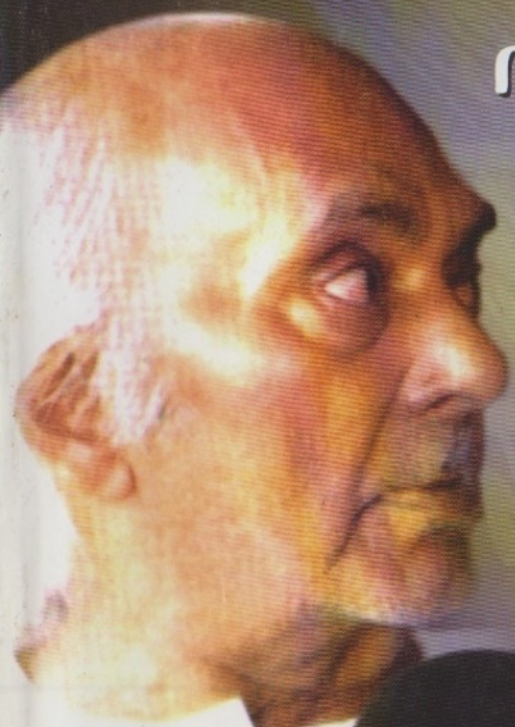

নজরুল চর্চা আমাদের কাছে কোনো বিলাসিতা নয়; একটা অপরিহার্য প্রয়োজন। একদিকে যেমন আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের জন্য। এ প্রয়োজন অন্তত বাংলার অন্য কোনো বড় মাপের কবিকে দিয়ে মিটাবার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নজরুল চর্চার পথে অন্তরায়ের অন্ত নেই। কেননা, গণমানুষের জন্য সাম্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার কোনো কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের কাম্য নয়। অশিক্ষা, অসচেতনতা, অনুদারতা, সমাজসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, অসূয়াপ্রবণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, এ রকম নানান কারণে নজরুল চর্চার পথে এই সব অবরোধ সৃষ্টির চেষ্টা নানানভাবে যেমন বাইরে চলে, তেমনি অজ্ঞতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে এ সব অবরোধ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হয় অন্দরেও।

আরো অনেক ক্ষেত্রের মতো নজরুল চর্চার ক্ষেত্রেও আমরা অবরুদ্ধ কেবল বাইরে থেকে নই, ভিতর থেকেও। কিন্তু এই সব অবরোধের স্বরূপটা কী রকম এবং কারণগুলোই বা কী কী সে সবই নানান উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে উপেক্ষার, অবজ্ঞার প্রতিবিধানকল্পে করণীয় কাজগুলোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। নজরুলের মহৎ অবদানের উল্লেখও আছে নানান প্রসঙ্গে। স্রেফ এই ধরনের জরুরী ও অপরিহার্য বিষয়গুলো নিয়ে কোনো গ্রন্থের প্রণয়ন এই প্রথম।

নিবন্ধগুলো নানান উপলক্ষে লিখিত এবং গত দেড় দশকের মধ্যে নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। সে সবই এখন পাঠক দুই মলাটের মধ্যে সহজে একত্রে সংরক্ষণ করার মতো করে পাবেন। কেবল তাই নয়, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক নানান কাজে কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই গণমানুষকে সহায়তা করতে পারবে। আর সেটা হলে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে স্থিত থেকে সাম্য ও মানবতার কবি, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিকে তুলে ধরার, চর্চা করার সুযোগ হবে আমাদের।

প্রচ্ছদ : জাহিদ হাসান বেণু

www.pathagar.com

স্কুল জীবনে শেখ দরবার আলম লিখতেন কবিতা,গান, ছোটগল্প। এ সময়েই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা স্কুলের দেয়াল পত্রিকায়। কলেজ জীবনেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কোনো গ্রন্থে বা পত্রিকায় নয়; বন্ধুজনের উপহারপত্রে।
বিশেষত কবিতা নিয়ে তাঁর একটা তুমুল উৎসাহ ছিল তখন।
কলেজ জীবনে তাঁর লেখা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু-বান্ধবদের উদ্যোগে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে।
ছোটগল্প তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পেরিয়েও লিখেছেন। গল্প তিনি এখনও লেখেন সাহিত্যের জন্য, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয়; একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, সমাজজীবনের প্রয়োজনে।
স্কুল জীবনে তাঁর পেশা হিসেবে আকর্ষণের বিষয় ছিল শিক্ষকতা। কয়েকজন আদর্শ শিক্ষককে দেখেই এমনটা হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সাংবাদিকতা। দৈনিক ইত্তেফাকে এক বন্ধুর প্রস্তাবে সুযোগ হিসেবে এটাই পেয়েছিলেন তখন।
এর পরই সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর কাজের বিষয় হয়েছে ইতিহাস এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টি।
নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গত পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি নানান পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে। নজরুল বিষয়ক তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে, তারপর দৈনিক নিউনেশনে, নজরুল একাডেমী পত্রিকায়, দৈনিক বাংলায় এবং আরো অনেক পরে নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকায়।
কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় নজরুল জীবনী বিষয়ক একক প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসেবে ২ জানুয়ারী ১৯৮২-তে ছাপা হয়েছে তাঁর 'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক'। ২৯ মে ১৯৮২-তে ছাপা হয়েছে 'রাজবন্দী কবি'। ২৫ আগস্ট ১৯৮৪-তে ছাপা হয়েছে 'নজরুলের পরিচালনায় লাঙ্গল' এবং ৩১ আগস্ট ১৯৮৫-তে 'ঢাকায় নজরুল'।
এই চারটি নিবন্ধই ১৭ জুলাই ১৯৮৮-তে ঢাকার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'অজানা নজরুল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা অজস্র দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি সমৃদ্ধ তাঁর গ্রন্থ। ' নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে জুলাই ১৯৮৯-এ।
ঢাকার নজরুল একাডেমী থেকে আগস্ট ১৯৯৮তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ 'নজরুল জীবন ও পালিত কন্যার স্মৃতিকথা'।
ফেব্রুয়ারী ২০০২-এ ঢাকার ইউরেকা বুক হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ 'নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা'।
লেখক পশ্চিমবঙ্গে নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার মুখপত্র 'সাম্পান' সম্পাদনা করেছেন। ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকার সম্পাদনারও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় ঢাকার নজরুল একাডেমী থেকে কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।
ঢাকার ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা ছাড়াও সাংবাদিকতা করেছেন কলকাতার দৈনিক পয়গামে এবং এখন সহকারী সম্পাদক হিসাবে আছেন ঢাকার দৈনিক ইনকিলাবে।
নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম হোক, এটা তিনি চান কেবল একজন নজরুল ভক্ত হিসেবেই নয়, গণমানুষের স্বার্থে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

www.pathagar.com

নজরুলের নানান দিক

শেখ দরবার আলম

কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১১২২০৪, ৭১২৪১০৯, ০১৭১৫২৯২৬৬, ০১৭১১০৭১২০

www.pathagar.com

নজরুলের নানান দিক

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৪
মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র
(একদামে ক্রয় করুন)
প্রচ্ছদ
জাহিদ হাসান বেণু
বর্ণবিন্যাস
কামিয়াব কম্পিউটার সেকশন
মুদ্রণ
পি এ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা
ISBN 984-8285-31-1

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দানবীর

হাজী মোহাম্মদ মহ্‌সিন

স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টির কতকগুলো দিক নিয়ে আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থটি ঢাকার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮'র জুলাই মাসে। আর এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি প্রণীত হয়েছিল ওটি প্রকাশিত হওয়ার আগের বছর দশেকের মধ্যে। গ্রন্থটিতে নজরুল জীবন ও সৃষ্টির দুষ্প্রাপ্য উপাদান অনেক আছে। আবার দুষ্প্রাপ্য নয়, এমন উপাদানাদি তারিখ-তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে অন্যরকম সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারটিও আছে। ফলে গ্রন্থটি মারফৎ একদিকে যেমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যে, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে কত বিপুল পরিমাণ কাজ করার আছে; অন্যদিকে গ্রন্থটি থেকে এ ধারণাও পাওয়া যাবে যে, নজরুল জীবন ও সৃষ্টির অনেক কিছুই ইতোপূর্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়নি।

এরপর আমার গ্রন্থ "নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে জুলাই ১৯৮৯-এ। "নজরুল জীবন ও পালিত কন্যার স্মৃতিকথা" ঢাকার নজরুল একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে আগস্ট ১৯৯৮-এ। ঢাকার ইউরেকা বুক হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে "নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা" ২০০২-এর ফেব্রুয়ারিতে।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই সব কিছুর আগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় ১৯৮২'র ২ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৫'র ৩১ আগস্টের মধ্যে নজরুল জীবনী বিষয়ক আমার লেখা চারটি একক প্রচ্ছদ নিবন্ধের প্রকাশ।

মূলত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ওই পত্রিকাটিতে কারো কোনো লেখা ছাপা হলে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের গুণীজনরা সেই লেখককে জাতে ওঠা লেখক বলে মনে করেন। এভাবে আমি আমার কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে কিংবা পরে এখনও জাতে ওঠা লেখক হয়েছি কিনা জানি না এবং ওটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই; তবে সে সময় যখন "দেশ" পত্রিকায় ১৯৮২'র ২ জানুয়ারি "বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক"; ১৯৮২-'র ২৯ মে "রাজবন্দী কবি", ১৯৮৪'র ২৫ আগস্ট "নজরুলের পরিচালনায় 'লাঙল", ১৯৮৫'র ৩১ আগস্ট "ঢাকায় নজরুল" একক প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল তখন যে আনন্দ পেয়েছিলাম এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলাম সেটা পরবর্তীকালে অনেক বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠনমূলক কাজ-কর্ম করে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

এখানকার অনেকে যা ক'রে ওখানকার সার্টিফিকেট পেতে চান, আমি সে রকম কোনো কিছুই না করে ওখানকার সার্টিফিকেট পেয়েও মনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের

www.pathagar.com

কোনো খায়েশ না রেখে স্রেফ সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্য রকম কিছু করছি। "দেশ" পত্রিকায় আমার সেই একক প্রচ্ছদ নিবন্ধগুলোও ছিল অন্য রকম কাজ।

আমি লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার জন্য কখনো লিখিনি। আমি কেবল প্রয়োজনে লিখেছি। "নজরুলের নানান দিক" সম্পর্কে আমার লেখাগুলোও ঠিক সে রকমই। লেখাগুলো নজরুল জীবন ও সৃষ্টিকে নানান দিক থেকে দেখার ব্যাপারে অনেককেই সহায়তা করবে, এ রকম একটা ধারণা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমার আছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো নিবন্ধ সরকারি পর্যায়ের নজরুল জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লেখা, অনেকগুলো আবার বিভিন্ন সময়ে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তবে এর কোনোটিরই আবেদন শেষ হয়নি। আর এ কারণেই লেখাগুলোকে একটা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করার প্রয়োজন হলো।

এই গ্রন্থে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা নানান নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে এক একটা বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনেই। বিষয়টিকে সেভাবে দেখে গুরুত্ব দিলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। গণমানুষের প্রয়োজনেই আমি অনেক সমস্যার কথা বলেছি এবং সমাধান চেয়েছি।

এই গ্রন্থটি প্রসঙ্গেও উল্লেখ করা দরকার যে, সব সময়েই আমার লেখালিখির কাজ-কর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে সহায়তা করেন, সব কিছু হেফাযত করেন আমার স্ত্রী আক্তারা বানু। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো আর একজন আছেন। তিনি আমার আদরের বড় সাহেব, আদরের স্যার, সন্তানপ্রতিম ফারহানা রহমান (মোহনা)। আমার যে কোনো বই প্রকাশিত হলে তার নামটা কোথাও আছে কিনা দেখেন। নামটা থাকলে একটা কপি তাদের আলমারিতে রেখে দেন।

বিনীত

শেখ দরবার আলম

২৫ নভেম্বর ২০০২ সোমবার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

নজরুলের পড়াশুনা ১৩
রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ১৩
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাঁধন প্রসঙ্গে নজরুল ১৪
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং নজরুল ১৫
পড়াশুনার ওপর জোর দিয়েছেন নজরুল ১৬
সংস্কৃত ১৮
ফার্সি ২০
আরবি ২৪
আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সব কিছুই আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় বন্দী ২৫
ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে আমাদের ক্ষতি করেছে ২৬
উর্দু ২৭
হিন্দী ২৯
কবির পাশ্চাত্য সাহিত্যপ্রীতি ৩০
বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য ৩৫
সঙ্গীত ৪০
জাতীয় কবি ঃ তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা ৪৬
সাম্য ও সহাবস্থানের কবি ৭৫
অসুস্থ ব্রাহ্মণকে রক্ত দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ৭৭
'জাত-জালিয়াৎ' কবিতায় মনুসংহিতার সমাজের কথা ৭৭
মনুসংহিতা ৭৮
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ ঃ ৭৯
শূদ্রের প্রতি ঘৃণা এবং ব্রাহ্মণ আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা ৭৯
ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান নয়, সমাজ প্রধান ৭৯
হিন্দু জাতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি ৭৯
বর্ণভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের পউবস্ত্র ৮০
'হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ' ৮০
সংরক্ষণ ৮১
এক জাতিতত্ত্বের ধারণা এবং শুদ্ধি আন্দোলন ৮১
আমরা যে উপমহাদেশে বাস করি সেই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী? ৮২
হেলাফেলার শিকার এখন নজরুল সঙ্গীত ৮৯
স্বরলিপি তো গানের কাঠামো ১১৩
অনন্য 'বিদ্রোহী' ১১৯
সব মানুষের কবি ১২৮

www.pathagar.com

গণমাধ্যমে নজরুল ১৩১
নজরুল গণকবি এবং গণমাধ্যমেরও কবি ১৩১
অবদান প্রসঙ্গে ১৩২
"কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম (পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীতে) ১৪০
গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা ১৪২
নজরুল জীবন ও সাহিত্যে রাজনীতি ১৪৭
নারী ও নজরুল ২৫৪
বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ ১৬৩
কেবল নজরুল কবিতারই আবৃত্তি ১৬৯
নজরুল চর্চার প্রয়োজন ১৭৩
নজরুল জন্ম-শতবর্ষের প্রার্থনা ১৭৮
আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট ১৮২
অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনা ১৮২
নজরুল রচনার শুদ্ধ পাঠ ১৮৩
নজরুল জীবনীর তারিখ-তথ্য ১৮৩
নাট্যকার নজরুল এবং তাঁর নাটক-নাটিকার বিষয়ে তারিখ-তথ্য ১৮৩
নজরুল চর্চায় উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ১৮৩
আলোচনা সভা ১৮৪
নজরুল জীবনী ১৮৪
নজরুল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ১৮৫
নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ১৮৫
নজরুল চর্চার নানান অন্তরায়ের উৎসমুখ ১৮৮
আমার নজরুল চর্চা ১৯০
নজরুল চর্চার নানান অন্তরায় ১৯৪
কবি কাজী নজরুল ইসলাম : (ফিল্ম ডাইরেক্টর) ১৯৮
নজরুল চর্চার অন্তরায়ের উৎসমুখ ২০০
নজরুল চর্চার হাল প্রতিবন্ধকতা ২০৭
নজরুল চর্চা ঃ অন্দরে অবরোধ ২১১
নজরুল একাডেমী ২১২
নজরুল ইন্সটিটিউট ২১৪
নজরুল উপেক্ষার পরিবেশেই নজরুলকে খর্ব করে এই নাটক ২২২
নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের সমস্ত সম্ভাবনাই ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে ২২৯
নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদের
সবাইকে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে দরকার ২৪৩
নজরুল ঃ তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক চেতনা ২৬১
মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা ঃ জাতীয় কবির দৃষ্টিতে ২৬৭

www.pathagar.com

নজরুলের পড়াশুনা

।। এক ।।

নজরুলের পড়াশুনা সম্পর্কে লেখাপড়া জানা লোকদেরও অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনা সম্পর্কেও। আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক এলেম অর্জনের ব্যাপারটি দিয়েই শুরু করছি।

রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ "দেশ" পত্রিকার ১৩ মে ২০০২ সংখ্যায় "দশটা-চারটের আন্দামান ঃ স্কুল পলাতক রবীন্দ্রনাথ" শিরোনামে নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"স্কুল পালানোর ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই বলতে ভালবাসতেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিখ্যাত মনীষী হওয়ার পরেই।"

৮ জুলাই ২০০০ তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত "দেশ" পত্রিকায় কলকাতা-৭০০০৭৮ থেকে এক চিঠিতে শিব প্রসাদ নিয়োগী লিখেছেন ঃ

"প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হননি বলেই রবীন্দ্রনাথ বড় সাহিত্যিক ও বড় মাপের মানুষ হতে পেরেছিলেন, তা বলছি না। মানসিক গঠনে শিশু রবীন্দ্রনাথ একটু আলাদা ছিলেন। এই সত্যটা তাঁর অভিভাবকরা বুঝতে ভুল করেননি। তাঁরা শিশুটির শিক্ষার ত্রুটিও রাখেননি। তাঁদের পারিবারিক অবস্থান ওই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষে উপযোগী ছিল।"

এই চিঠিতেই ইতোপূর্বে তিনি লিখেছেন ঃ

"এ তথ্য সকলের জানা যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারেননি। কেন পারেননি তাও রবীন্দ্রনাথ নিজেই বারবার জানিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৈশব এবং কৈশোরে তাঁকে যে নিদারুণ কষ্ট পেতে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর লেখায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। ওই সময়কার লাঞ্ছনা আর মানসিক নির্যাতনের স্মৃতি তাঁকে সারাজীবন পরিচালিত করেছে অন্য রকম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তিনি বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন তাও আমাদের অজানা নয়। শ্রী ঘোষ তাঁর নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর তীব্র বিকর্ষক ও সমালোচক মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শৈশব থেকেই তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জেগে ওঠার যে কারণগুলো রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রচনায় বলেছেন তার একটা লিস্টও শ্রী ঘোষের নিবন্ধে রয়েছে। তবু.... তাঁর মনে হলো 'উপরের কোন কারণই স্কুল পালানোর কৈফিয়ৎ হতে পারে না।".... পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের কৈফিয়ৎ দেবার দায় ছিল না কি? তিনি ভিন্ন ধরনের শিশু ছিলেন। যে পরিস্থিতিতে অন্যেরা কষ্ট করে মানিয়ে নেয়— মানিয়ে নিতে হয় বলে— কেউ কেউ তা পারে না।.... তীব্র

www.pathagar.com

অনুভূতি সম্পন্ন, হয়তো একটু বেশি লাজুক, আত্মমুখী শিশু রবীন্দ্রনাথ তা পরেননি। অনন্যোপায় অনেক শিশুই যখন মাস্টারমশাইয়ের বেত আর তর্জন গর্জন মেনে নিয়েছে, একটি শিশুর কাছে তাই বিভীষিকা হয়ে উঠল। ত্রাসের যে বাস্তব চেহারা ছিল তা হয়তো ওই শিশুটির বিশেষ মানসিক কাঠামোয় বিবর্ধিত হয়ে অতিকায় দানবের চেহারা নিয়েছিল।

স্কুল-শিক্ষার যাঁতাকলে পড়ে মানসিক সুস্থতা হারানো বা আত্মহনন করা ছাত্রছাত্রীদের কথাও শ্রী ঘোষ খবরের কাগজে পড়েন নিশ্চয়ই।

এখানে হয়তো এই বোধ আমরা পেতে পারি যে, শিক্ষা ব্যবস্থা নামে প্রচলিত কাজি, যাদের ফালতু বলে রায় দিচ্ছে, তারাও হয়তো কেউ কেউ শিশু রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ মনের অধিকারী শিশু। যে তিক্ত অনুভবে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বলেছেন, যার স্মৃতি তাঁকে অন্যরকম কিছু একটা গড়বার প্রত্যয় দিয়েছে— সেই অনুভবকে, সেই কষ্টকে পাত্তা না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্কুল পলায়নকে...

রবীন্দ্রনাথ যদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বিখ্যাত মনস্বী না হতেন তাহলে এইসব বলতেন না। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্যাতিত শৈশবের কথা মনে করে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আর এ ব্যবস্থার একটা বিকল্প গড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত করেছেন।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকেও একেবারে অবজ্ঞাত ছিলেন না। তবে তখন তিনি পুরোদস্তুর আত্মমগ্ন কবি। পরবর্তী সময়ে তাঁর খ্যাতি বেড়েছে— বলার সুযোগও বেড়েছে। এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কেউ যদি বেশি বয়সে, অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করে কোনো সমস্যার কথা বলেন তাহলে কি আমরা এই অভিযোগ করবো, কম বয়সে তিনি তা বলেননি কেন?"

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাঁধন প্রসঙ্গে নজরুল

শিক্ষার যে সুযোগ, যে যত্নআত্তি রবীন্দ্রনাথের জন্য ছিল, অর্থনৈতিক কারণে ততখানি সহজলভ্য, অবাধ এবং অবারিত নজরুলের জন্য ছিল না ঠিকই। কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য এসবই তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পড়াশুনার রেঞ্জ, ব্যাপ্তি আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনার যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি এবং সেটা তাঁর সততা, মানবিকতা, সহানুভূতি, মনুষ্যত্ববোধ এবং ভাষা অঞ্চল গোত্র ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গির মতো গভীর। তথাপি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বন্ধনটাকে তিনি অন্তত তাঁর নিজের ব্যাপারে এলেম অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করেননি। তাঁর অন্যরকম একটা অনুভূতি এখানে কাজ করেছিল। সে অনুভূতি হুবহু ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। একটু অন্যরকম। তবুও কোথাও যেন একটা মিলও আছে। কবি ১৬ মার্চ ১৯৪১ (২ চৈত্র, ১৩৪৭) তারিখ রবিবার বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বলেন ঃ

"আমার সাহিত্য-সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মদিন থেকে যেন আমার

www.pathagar.com

শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে, Existence-কে খুঁজে ফিরেছি। যখন আমি বালক, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কান্না আসত— বুকের মধ্যে বায়ু যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম— ঐ আকাশটা যেন ঝুড়ি, আমি যেন পাখির বাচ্চা, আমি ওই ঝুড়ি চাপা থাকব না— আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাই য়ুনিভার্সিটির দ্বার থেকে ফিরে য়ুনিভার্সের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়ালাম। জীবনে কোনোদিন কোনো বন্ধনকে স্বীকার করতে পারলাম না। কোনো স্নেহ-ভালবাসা আমায় বুকে টেনে রাখতে পারল না। এই তৃষ্ণা যে কোনো পরম-সুন্দরের, তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলেই অবুঝের মতো পথ থেকে পথান্তরে ঘুরেছি।"

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা নজরুলের কাছে ছিলো সামগ্রিক বন্ধনেরই একটা অংশ। সে বন্ধনের অনুভূতিরও আছে এক বিশাল ব্যাপকতা। বিষয়টি এতখানি অপরিসীম যে, সেটা একটা আধ্যাত্মিক স্তর পর্যন্ত ছুঁয়েছিল। আর সেটা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং নজরুল

১৯০৮-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে নজরুল ইসলাম ছিলেন চুরুলিয়ার মক্তবে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১১'র জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে নজরুল ইসলাম ছিলেন ময়মনসিংহের কাজীর সিমলা দরিরামপুর হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

১৯১২'র জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে তিনি বর্ধমান মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

১৯১৪'র জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান শহরে অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশন (নিউ স্কুল)-এর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

১৯১৫'র জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে নজরুল রাণীগঞ্জ শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষাবর্ষ ১৯১৬'য় সেখানে তিনি ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র।

নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সে সময় ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তারিখ শুক্রবার বর্ধমান টাউন হলে বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে ভর্তির আহ্বান জানিয়ে সভা হয়। নজরুল সাড়া দিলেন ব্রিটিশ বিতাড়নের লক্ষ্যে রণ-কৌশল আয়ত্ত করার বাসনায় শুধু নয়, আর্থিক অনটনের তাড়নায়ও বটে।

বদ্ধঘরে আটকে না থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং দুনিয়াকে জানার একটা আকাঙ্ক্ষাও এক্ষেত্রে কাজ করেছে।

দশম শ্রেণীর শেষ পর্যায়ে তিনি যখন স্কুল ছাড়লেন তখন তিনি ছিলেন তাঁর ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

মেধার পরিচয় তিনি স্কুলেও কিন্তু বরাবরই দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্কুল জীবনের সঙ্গে তাঁর একটা পার্থক্যও আছে।

www.pathagar.com

তাঁর স্কুল জীবন সম্পর্কে নজরুল নিজে কী বলেছেন এখন সেটাই দেখা যাক।

৯ জানুয়ারি, ১৯৪১ (২৫ পৌষ ১৩৪৭ ঃ ১০ যিলহজ্জ ১৩৫৯) তারিখ বৃহস্পতিবার ছিল ঈদুজ্জোহা। সম্ভবত এই ঈদের তিনদিন পর ১২ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখ রবিবার কিংবা এরপর হপ্তাখানেকের মধ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে এক জায়গায় নজরুলের নিজের উক্তি ঃ

"দুঃখকে বিপদকে দেখে আমি ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাস্টারের বড় আশা ছিল আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশে থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে।"

পড়াশুনার ওপর জোর দিয়েছেন নজরুল

তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এ হেন হাল তাঁর নিজের হাতে হলেও ব্যাপক পড়াশুনার ব্যাপারটার ওপর বরাবরই জোর দিয়েছেন নজরুল। পড়াশুনাকে তিনি আনন্দ প্রকাশের পুঁজি বলে অভিহিত করেছেন।

কবি কৃষ্ণনগর থেকে ৩ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখে শচীন করকে এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"পড়া ছাড়িসনে তুই, তাহলে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হতে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি তো আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ। কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে, নদীর মতো সে চলে গাইতে গাইতে, দান করে করে দু'পাশে ফুল ফুটিয়ে।"

স্কুল জীবনে তিনি যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন তখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন। তাঁর স্কুল জীবনের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দুটো স্মৃতিকথায়ও এ তথ্য আছে।

এখন থেকে বছর বিশেক আগে আটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় একক প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত 'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক' শিরোনামে আমার প্রথম লেখায় উল্লেখ করেছিলাম ঃ

"সেনাবাহিনীতে নজরুল ইসলাম যখন যোগ দেন তখন তিনি রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে ফার্স্ট বয় এবং সন্ত্রাসবাদী মতবাদে আকৃষ্ট। ইতোপূর্বে অতি অল্প বয়সে মাতৃভাষায় পালা গান ও কবিতা লিখেছেন। ইংরেজি ছাড়াও আরবি, ফার্সি ও উর্দু চর্চা করেছেন। সংস্কৃতও পড়েছেন। সেনাবাহিনীতে থাকতে ব্যাপক ফার্সি সাহিত্য অনুশীলন করেছেন জনৈক পাঠান মৌলবীর কাছে। পারিবারিক ভাষা হিসাবেও ভাল উর্দু জেনেছেন। হিন্দীও শিখেছেন। সেনাবাহিনীতে থাকতেই এক উস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রপ্ত করার সুযোগ করে নিতে পেরেছেন আগের চেয়ে অনেক বেশি।

www.pathagar.com

তাই সবদিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় অনুচিত হবে না যে, নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সচেতনভাবেই সৈনিক জীবনে বিবিধ বিষয়ে মোটামুটি তাঁর প্রস্তুতিপর্ব শেষ করেছিলেন। এর পরে তিনি এসেছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন।

'বিদ্রোহী' যখন লেখেন তখন তাঁর বয়স বাইশ বছরও পূর্ণ হয়নি। এ কবিতা ব্যাখ্যা করতে গেলে দেশ-বিদেশের যেসব পৌরাণিক ও আধুনিক ঘটনার খোঁজ-খবর রাখতে হয়, উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে ক'জন তা রাখেন, জানি না। প্রতিভার মতো তাঁর এ প্রস্তুতিও আমাদেরকে কম বিস্মিত করে না। একটা চালচুলোহীন মানুষের পক্ষে এ প্রস্তুতি কী করে সম্ভব তা ভাবতেও অবাক লাগে।"

নানান বিষয়ে নজরুলের যেমন ছিল ব্যাপক এবং অপরিসীম পড়াশুনা, আমাদের পণ্ডিতমন্য লেখাপড়া জানা লোকজনদের তেমনি ছিল এবং এখনও আছে অজ্ঞতা। একটা উদাহরণ দিই।

১৯৬৪'র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এবং ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে পুনর্মুদ্রিত "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় সুফী জুলফিকার হায়দার লিখেছেন ঃ

"বিদ্রোহী কবিতা লিখে কবি যদি তোমার দরবারে কোন অপরাধ করে থাকে, হে খোদা! নজরুলের হয়ে আজ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

কিন্তু সুফী জুলফিকার হায়দার সাহেব প্রয়োজনীয় পড়াশুনা না থাকায় জানতেন না যে, পৌরাণিক কাহিনী মোতাবেক সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু এক সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতার মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা যাচাই করতে ত্রিলোক পরিভ্রমণে বেরিয়ে দেখলেন ভগবান বিষ্ণু সে সময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লালন-পালন ছেড়ে দিয়ে গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন এবং লক্ষ্মী তাঁর পদসেবায় রয়েছেন মগ্ন, তখন ভৃগু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে সজোরে পদাঘাত করে বসলেন।

এই পৌরাণিক কাহিনী স্মরণে উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় বালিয়া রেল স্টেশনের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ছয় বর্গ কিলোমিটার জুড়ে আজো ভৃগু-দর্দরী বা ভৃগু ছত্রের এক মাসব্যাপী মেলা হয় সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু এবং ভৃগুজীর প্রিয় শিষ্য দর্দরী মুনি স্মরণে। প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার দিন খুব ভোরে একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গায় পুণ্য স্নানের মাধ্যমে এই মেলার সূচনা হয়। উত্তর প্রদেশের বালিয়ার ভৃগু মন্দিরে শ্বেত পাথরে তৈরি তিনটি ধাপঅলা বিশাল চৌকো বেদি আছে, যেখানে ভৃগুজীর সেই পদ চিহ্নও সংরক্ষিত আছে।

"ভৃগু-দর্দরী মেলা" শিরোনামে ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের ৫৮ বর্ষ ঃ ৮ সংখ্যা "দেশ' পত্রিকায় স্বপন রায়ের নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে।

www.pathagar.com

।। দুই ।।

সংস্কৃতি

অনেক স্মৃতি কথায় দেখেছি এবং নজরুলের নানান ধরনের লেখার দিকে নজর দিলেও বোঝা যায়, হিন্দু পুরাণ নজরুল মূলত সংস্কৃত ভাষাতেই পড়েছিলেন। সংস্কৃত ছন্দে কবিতাও লিখেছেন তিনি। ২৬ জুলাই ১৯৪১ (১০ শ্রাবণ ১৩৪৮ ঃ ৩১ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬০) তারিখ শনিবার কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 'ছন্দিতা' অনুষ্ঠানে দশটি সংস্কৃত ছন্দে লেখা কবি কাজী নজরুল ইসলামের দশটি গান পরিবেশিত হয়েছিলো। এ থেকেও বোঝা যায়, সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ছন্দ এবং সংস্কৃতে লেখা সাহিত্য ও শাস্ত্রের ওপর তাঁর কতখানি দখল ছিলো।

তাঁর মৃত্যুর মাস চারেক আগে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে এক সন্ধ্যায় নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন, "আমি হিন্দুর ছেলে। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না, মূল সংস্কৃতে রামায়ণ-মহাভারত পড়েছি। নজরুল পড়েছিলেন।"

স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি এসব কথাও বলেছিলেন যে, বীরভূমের লাভপুরে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কবি একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ পুরোহিতের মতোই পূজা অর্চনা করেছিলেন। মন্ত্রোচ্চারণে ও আনুষ্ঠানিকতায় কোথাও কোনো ভুল হয়নি, ত্রুটি হয়নি।

রবীন্দ্র সদনে নজরুল জয়ন্তীর সে অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা উভয়েই নজরুল-সুহৃদ।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভাইপো সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্তি করেন, "নজরুলকে বিদ্রোহী কবি কেন বলা হয় বুঝি না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বিদ্রোহী কবি।"

অনুষ্ঠান হচ্ছিল প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায়।

অনুষ্ঠান শেষে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জয়ন্তী কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের নবজাতক প্রকাশনীর মালিক মাজহারুল ইসলাম সাহেব আমাকে বলেছিলেন, 'প্রতিবাদ করলেন না!'

সামনের সারিতেই ছিলাম।

প্রতিবাদ করাটা খুবই সহজ হতো। কিন্তু সঠিক হতো না। বললাম, 'বাক্‌স্বাধীনতা তো সবারই থাকা উচিত!'

সে যাই হোক, সেদিনের অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলোই কেবল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ওই কথাগুলোর মধ্যে আছে নজরুলের ব্যাপক পড়াশোনা এবং স্মৃতিশক্তির পরিচয়।

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে মহালয়া ১৪০৫-এ প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত 'শত কথায় নজরুল' গ্রন্থে

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" শীর্ষক স্মৃতিকথায় শাস্ত্রজ্ঞ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন ঃ

"ইসলামী শাস্ত্র ও হিন্দু শাস্ত্র তিনি যে কত পড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। একদিন মনে আছে বেতার অফিসে আমরা দু'জন বসে আছি—বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কেউ বেরুতে পারছি না; তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো— ঠিক দুটি ঘন্টা নজরুল আমাদের শাস্ত্র, আধ্যাত্মমার্গের এত কথা বলতে শুরু করলেন যে, বিস্ময়ের অবধি রইল না।..... সত্য আবিষ্কার ও সেই সত্য জীবনে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর ব্রত— সে সত্য ইসলামের হোক, খ্রিস্টানের হোক, কিংবা হিন্দুর হোক তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।"

কবির অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা রাইচাঁদ বড়াল একবার আমাকে বলেছিলেন 'সাপুড়ে' ছবির গানে সুর দেয়া প্রসঙ্গে।

তখন টেপ রেকর্ডার ছিল না।

হঠাৎ বর্ধমানের আর বীরভূমের সাঁওতাল পল্লীতে চলে গিয়ে সেসব জায়গায় কবি দিন পনেরো থেকে ফিরে এসেছিলেন। তারা যেভাবে গান করেন সেভাবে গান লিখে হুবহু সেভাবেই সুর করেছিলেন।

নজরুলের কবিতা, গান, নিবন্ধ, চিঠিপত্র, নাটক, গল্প-উপন্যাস, অভিভাষণ— এসব কিছুই খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে একাধারে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনা এবং অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় আছে।

নানান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরাণ, ইতিহাসও যেন তাঁর নখদর্পণে। যখন যেমন প্রয়োজন, সব জায়গা থেকে উপাদানাদি সেভাবেই চলে এসেছে তাঁর লেখায়, তাঁর ভাষণে, তাঁর অভিভাষণে।

এত ব্যাপক পড়াশোনা এবং অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় আর কারও ছিল কি-না জানি না।

মূলত আমাদের সাহিত্য সমালোচকদের পড়াশোনার অভাবের কারণেই তাঁর এক একটা লেখা, এক একটা গ্রন্থ ধরে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজও হলো না। আর এই কাজটা পূর্ণাঙ্গরূপে না হওয়ার ব্যাপারটাও স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পাঠ্য তালিকায় তাঁর উপযুক্ত মর্যাদায় ঠাঁই পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হয়ে আছে।

নজরুলের বহুশ্রুত 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতার ওপর দেশ-বিদেশে অনেকে অনেক মন্তব্য করেছেন। অনেকে অনেক প্রশংসা করেছেন। নিন্দাও এক আধজন যে করেননি তাও নয়, কিন্তু এমন একটা কবিতারও পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা কোথাও কেউ করেছেন বলে জানি না। সমস্যাটা হলো এই যে, এ রকম কাজগুলো করতে হলে দীর্ঘদিন ব্যাপক পড়াশোনা করতে হয়।

এই সাহিত্য সমালোচনার কাজ এক হাতে নিশ্চয়ই হওয়ার নয়। অনেককে দিয়ে করাতে হবে। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে এ ধরনের কাজ করানোর উদ্যোগ নজরুল একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউটের মতো নজরুল

www.pathagar.com

চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান নিলে ভাল হয়।

নজরুলের লেখাগুলোর, গ্রন্থগুলোর পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হলে তখনই পাওয়া যাবে নজরুলের অপরিসীম পড়াশোনার পরিচয়।

এমনিতে অনেকখানি বোঝা গেলেও পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা না হওয়া পর্যন্ত এত ব্যাপক এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

একটা উদাহরণ দিই।

নজরুলের "জাত-জালিয়াৎ" কবিতাটির আবৃত্তি খুব ছোটবেলা থেকে আমার আব্বার মুখেও বহুদিন বহুবার শুনেছি।

তার মুখে শুনে এবং পড়ে স্কুল জীবনেই কবিতাটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

কবিতাটিতে এক জায়গায় মনুর কথা আছে। এই নামটিকে আমি খেয়াল করে গুরুত্ব দিতে শিখিনি বছর দশেক আগেও। অথচ এই মনু এবং মনুসংহিতা যে এক বিশাল এলেম অর্জনের বিষয়, সেটা নজরুল তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সেই আমাদের জানিয়ে গেছেন।

"নজরুলের গান" শীর্ষক স্মৃতিকথায় সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপধ্যায় লিখেছেন ঃ

"শুনেছিলাম নজরুল রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। আমি এক রকম চ্যালেঞ্জ করেই বলেছিলাম,— লেখ দেখি দুর্গাসুরের যুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া চাই। এই কবিতা লিখে নজরুল তখনকার সাহিত্যিক সমাজকে বিস্মিত করেছিলেন।"

কল্যাণী কাজী সম্পাদিত 'শত কথায় নজরুল'/সাহিত্যম, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩/মহালয়া ১৪০৫।

নজরুল সৃষ্টিতে এ রকম অজস্র হিন্দু, মুসলিম, গ্রীক, ইত্যাকার পৌরাণিক উপাদানাদি আছে।

হিন্দুর ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির এবং মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির পুরো পরিচয়টাই ধরা আছে নজরুল সাহিত্যে। এভাবেই আছে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সঙ্গীতের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই। আমরা আজও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি বলেই সে সব সম্যকভাবে চর্চা করিনি।

নজরুল কী রকম পড়াশোনা করেছেন সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কোন একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু পরিচয় এখানে উল্লেখ করছি।

ফার্সি

১৩৩৭ সালের আষাঢ় (জুন-জুলাই ১৯৩০) মাসে প্রকাশিত "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ"-এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি।...সেখানেই প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়।

www.pathagar.com

আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলো কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেই দিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।

তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনও কবিতা লিখবার মতো যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়, গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলালো না এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল।

তারপর এস সি চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে।

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।

বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাযা' (শব-যান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হল....।

অন্যত্র হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম। যদি সময় পাই এবং পরিপূর্ণ 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করব।

সত্যিকার হাফিজকে চিনতে হলে তাঁর গজল—গান—প্রায় শতাধিক—পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলো পড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে।

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব পড়ে একে রামধনুর কণার মতো রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হতেই অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কটি ফার্সি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' আছে, তার প্রায় সব ক'টাতেই পঁচাত্তর রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of persian literature-এ এবং মৌলানা শিবলী নোমানী 'শেয়রুল আজম'-এ মাত্র ঊনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন; এবং এই দু'জনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority—বিশেষজ্ঞ।

www.pathagar.com

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি— যদিও আর তিন-চারটি বাদ দেয়া উচিত ছিল। যে দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছে তার অনুবাদ নিম্নে দেয়া হল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সাথে অন্তত এই দু'টি রুবাইয়াতের সুরের কোন মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে বলে আমি এ দু'টির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।...

রুবাইয়াতের আগাগোড়া শারাব, সাকি, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের বদ-সুর কানে রীতিমত বেখাপ্পা ঠেকে।

এ জন্যই ব্রাউন সাহেব বলেছেন, ফার্সি কবিতার সবচেয়ে শুদ্ধ সংস্করণ হচ্ছে— তুরস্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো। তাঁর মতে— তুর্কি নাকি হিন্দুস্থানী বা ইরানীর মতো ভাবপ্রবণ নয়। কাজেই তারা নিজেদের দু'-দশ লাইন রচনা অন্য বড় কবিদের রচনার সাথে জুড়ে দিতে সাহস করেনি বা পারেনি। অথচ ভারতের ও ইরানের সংগ্রাহকরা নাকি ঐরূপ দুঃসাহসের কাজ করতে পশ্চাৎপদ নন এবং কাজেও তা করছেন।

ও অনুযোগ হয়তো সত্য। কেননা, আমি দেখেছি, ফার্সি কাব্যের (ভারতবর্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংস্করণের কবিতার বিভিন্ন রূপ। লাইন, কবিতা উল্টোপাল্টা তো আছেই, তার ওপর কোনটাতেই সংখ্যায় বেশি, কোনটায় কম কবিতা। অথচ তুরস্ক-সংস্করণ বই সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্য।.....

হাফিজকে আমরা কাব্য রস-পিপাসু দল—কবি বলেই সম্মান করি, কবি-রূপেই দেখি। তিনি হয় তো বা সুফি-দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রমুখ হাফিজের কবিতা উপাসনা মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খৈয়ামের দর্শন প্রায় এক।

এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানে অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এ-ও মিথ্যা নয়।

তবে এ-ও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক, কাব্যে প্রেমের আনন্দ প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন।

শারাব বলতে, এঁরা বোঝেন—ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে তোলো। 'সাকি' অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করান। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পানশালা—সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা নিকেতন।

ইরানী কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না।

বিনয়াবনত

নজরুল ইসলাম"

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" গ্রন্থের ভূমিকায় ওমরের কাব্য ও দর্শন সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে কেবল ওমর খৈয়ামের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে নয়, তামাম ফার্সি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমিকায় তিনি ওমরের কাব্য ছয় ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন।

উল্লেখ করেছেন ঃ

"ওমরের কাব্যে সারাব-সাকীর ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা, অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনি, তাঁর জীবনও ছিল তেমনি।

ফিট্‌জেরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই বলে থাকেন, ওমর যে শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষাসব, তাঁর সাকিও রক্ত-মাংসের। ফিট্‌জেরাল্ড তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোন প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও কোন প্রমাণ দিতে পারেননি। ওমর তাঁর 'রুবাই'তে অবশ্য শারাব বলতে আঙ্গুরের ক্বাথ-এর উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ওটা পারস্যের সকল কবিরই অন্তত 'বলার জন্য বলা'র বিলাস। শারাব, সাকী, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা যেন ভাবতেই পারেন না।"

ব্যক্তি ওমর এবং তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কবি এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"প্রায় হাজার বছর আগে এত বড় জ্ঞানমার্গী কবি কি করে জন্মাল, বিশেষ করে ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে—তা ভেবে অবাক হতে হয়। ওমরকে দেখে মনে হয়, কোন বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি এত মডার্ন হতে পারেন না। ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ঐ হাজার বছর আগে জন্মানোর জন্যই। আজকাল পৃথিবীর কোন মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-প্রবুদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না।...

ওমর তাঁর অসময়ে আসা সম্বন্ধে যে কত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর লেখার দুঃসাহসিকতা, পৌরুষ ও গভীর আত্মবিশ্বাস দেখেই বোঝা যায়। তিনি যেন তাঁর কাছে আর সব মানুষকে অতি ক্ষুদ্র Pigmy করে দেখতেন।

... তিনি যেন জানতেন—তাঁর জীবনে তাঁর লেখা বুঝার মতো কেউ জন্মায়নি, তিনি যা লিখেছেন তা অনাগত দিনের নতুন পৃথিবীর জন্য।"

নজরুল যে ফার্সি সাহিত্য এবং বিশেষ করে ওমরের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন সেটা বোঝা যায়, যখন তিনি লিখেছেন ঃ

"আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ' রুবাই বেছে নিয়েছি; এবং তা ফার্সি ভাষার রুবাইৎ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলো ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের সাথে একেবারে মিশ খায় না।

www.pathagar.com

আমি আমার ওস্তাদী দেখানোর জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি— অবশ্য আমার সাধ্যমতো। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেগ পেতে হয়েছে। কাগজ পেন্সিলের, যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ, তাই করে ছেড়েছি। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গি বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের ' পোজ' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন— মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না—সব। কত বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলো লিখেছিলেন, অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনও এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয়, এক দিনেই বসে লেখা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি— ওমরের সেই ঢংটির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যতটা পারি কায়দায় আন্‌তে। কতদূর সফল হয়েছি, তা ফার্সিনবীশরাই বলবেন।"

ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে নজরুলের দখল যে কত বিশাল এবং ব্যাপক, সেটা এই ভূমিকাটাও মনোযোগ দিয়ে পড়লে উপলব্ধি করা যাবে।

ফার্সি ভাষায় গানও লিখেছেন নজরুল।

আরবি

চৈত্র ১৩২৯ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২৩ ঃ রজব-শাবান ১৩৪১)-এর মাসিক "প্রবাসী"-তে চোদ্দটি আরবি ছন্দের কবিতা লিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর লেখা ভূমিকা এবং এতগুলো আরবি ছন্দে লেখা তাঁর কবিতাগুলো পড়লে বোঝা যায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল কতখানি গভীর ছিল।

আরবি ভাষার ওপর আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছিল প্রগাঢ় দখল এবং সে কারণেই পবিত্র কোরআন শরীফের অনুবাদের কথা তিনি চিন্তা করতে পেরেছেন।

আরবি ছন্দে কবিতা লেখার বছর দশেক পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কবি পবিত্র কুরআন শরীফের ৩০ অধ্যায় "আমপারা শরীফ"-এর পদ্যানুবাদ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কবির 'আরজ' ঃ

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কোরআন' শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এত দিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বছর সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্তত পড়ে বুঝার মতো আরবি-ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোরআন শরীফের মতো মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনও সাহস করতাম না বা তা করার দরকার হত না— যদি আরবি ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি, ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য, সব কিছু—কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষায় চাবি দেওয়া। আমরা— বাঙালি মুসালমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষা যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি। আজ যদি আমার চেয়ে

www.pathagar.com

যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদিস, ফেকাহ প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন তাহলে বাঙালি মুসলমানদের তথা বিশ্ব মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তারা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মতো অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন— অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোরআন হয়তো মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে— কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মতো দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে। কেননা, আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্পশিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন— আমার সকল শ্রম সার্থক হলো মনে করবো।"

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের গ্রন্থাদি ছাড়াও আমপারা শরীফের এই পদ্যানুবাদ করতে গিয়ে কবি আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ভাষায় লেখা দেশ-বিদেশের অনেক পুস্তকের সহায়তা নিয়েছিলেন।

তালিকায় আছে "Sale's Quran, Moulana Md Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-i-Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofisir-i-Azizi, Tofisir-i-Mowlana Abdul Hoque Dehlavi, Tofisir-i-Jalalain Etc."

কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা মেসার্স করিম বখ্শ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আব্দুর রহমান খান সাহেব এবং তাঁর যোগ্য পুত্র বেঙ্গল কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মৌলবী রেজাউর রহমান খান (এমএ, বিএল) সাহেবের উদ্যোগে আয়োজিত একাধিক অধিবেশনে তখনকার সমাজের বিখ্যাত আলেমরা এই অনুবাদ যথাযথ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। 'নজরুলের কাব্য আমপারার অন্তরালে' শিরোনামে ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত মাহফুজুর রহমান খানের স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সব কিছুই আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় বন্দী

নজরুল ইসলাম মনে করতেন, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সব কিছুই আরবি, ফার্সি ও উর্দু— এই তিনটি ভাষায় বন্দী। ফলে এই তিনটি ভাষায় তিনি দখল অর্জন করেছিলেন। এবং এই তিনটি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রগুলো পড়ার

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই লক্ষ্যে এই তিনটি ভাষায় পড়াশুনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রসঙ্গেই এসেছে মুসলমানদের ভাষার কথা।

জানুয়ারি ১৯২৯ (পৌষ-মাঘ ১৩৩৫)-এ চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে কবি তাঁর অভিভাষণে বলেন ঃ

"হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না; অথচ আমাদের শাস্ত্র সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুরই ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতোই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী।

....কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকামুক্ত হলো না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই।

অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিতি, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম-সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। তা না হলে ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গী রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি!"

ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে আমাদের ক্ষতি করেছে

।। তিন ।।

নজরুল কেবল বাংলায় নয়, উর্দু হরফে, হিন্দী হরফেও লিখেছেন, ফার্সি হরফেও লিখেছেন, এমনকি ইংরেজি হরফেও লিখেছেন কবিতা। কিন্তু এই একই সঙ্গে এই উল্লেখও তিনি করেছেন যে, ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষা অপূরণীয় ক্ষতি করেছে আমাদের।

তদুপরি তিনি মনে করতেন, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন ও ইংরেজি সংস্কৃতির দাপট ব্রিটিশ ক্ষমতা স্থাপনের সুপরিকল্পিত পূর্ববর্তী সোপান।

বিজেতার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধিতা তিনি করেছেন। বিজিতের

www.pathagar.com

আত্মসংজ্ঞা নির্মিতির প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেছেন তিনি।

জানুয়ারি ১৯২৯ (পৌষ ১৩৩৫)-এ চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে কবি তাঁর অভিভাষণে বলেন ঃ

"ইংরেজ শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের—আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি—দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া।...দরিদ্র, মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে অ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের কাছে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে— ও শুধু কাহিনী। হয়তো একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করতো না। তখন রাজভাষা State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন— এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্ব সভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা কোন মুসলমান নওয়াব-বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলিম জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজী-প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব-আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে, person-এর against-এ, গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের বড় ট্রাজেডি এই যে, আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি।"

উর্দু

"আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সব কিছুই আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় বন্দী" থাকার কথা বলেছেন নজরুল।

ফার্সি এবং আরবি ভাষায় তাঁর দখলের বিষয়ে উল্লেখ করার পর উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে নজরুলের যে অপরিসীম আগ্রহ ছিল সে উল্লেখ প্রসঙ্গে এটুকু অন্তত বলা দরকার যে, নজরুল কেবল উর্দু ভাষায় কবিতা আর গান লেখেননি, উর্দু ভাষায় অনেক কিছুই তিনি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেছেন।

প্রাচ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা প্রসঙ্গেই উর্দু ভাষায় নজরুলের ব্যাপক পড়াশুনার বিষয়ে আসছি।

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকার নজরুল জন্ম-বার্ষিকী সংখ্যা (১৪০৫-১৪০৬)'- "উর্দু ভাষায় নজরুল চর্চা" শীর্ষক নিবন্ধে কানিজ-ই-বাতুল লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"ওয়াফা রাশেদী বেশ কয়েকটি বইয়ের রচয়িতা। তন্মধ্যে 'বেঙ্গল মেঁ উর্দু' উর্দু সাহিত্যে তাঁর একটি মহৎ সাহিত্যিক অবদান।

তিনি উর্দু এবং বাংলা, উভয় ভাষাই ভালভাবে জানেন। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু। কলকাতায় তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং নজরুল ইসলামের সাথে একটি নাটকে অভিনয় করার সুযোগ লাভ করেন। মনে হয় পরিবেশ তাঁকে উর্দু এবং বাংলা, উভয় ভাষা শেখার আগ্রহকে ত্বরান্বিত করেছিলো। ১৯৬৫ সনের মাসিক পত্রিকা 'নাদীম'-এর নজরুল সংখ্যায় 'নজরুল ইসলাম ও উর্দু' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি নজরুলের কবিতায় ও গানে উর্দু, ফার্সি ও আরবি শব্দের ব্যবহারের উপর গবেষণামূলক একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। এই প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যের প্রতি নজরুলের আগ্রহ বুঝাতে গিয়ে তিনি একটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

"এক ফিল্ম কোম্পানীর স্টুডিও ছিল কলকাতার টালিগঞ্জে। তাঁদের ইচ্ছা ছিল একটি ফিল্মে পরলোকগত কবিদের মুশায়েরার এমন একটি দৃশ্য দেখানো যাতে মীর (পরলোকগত ঃ ১৮১০), গালিব (পরলোকগত ঃ ১৮৭৯), মুমিন (পরলোকগত ঃ ১৮৫১), দাগ (পরলোকগত ঃ ১৯০৫) প্রমুখকে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখা যাবে। কবি নজরুলকে মীরের এবং ওয়াফা রাশেদীকে গালিবের চরিত্রে অভিনয় করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

ওয়াফা রাশেদী মনে করেছিলেন, নজরুল মীরের চরিত্রে অভিনয় করতে ব্যর্থ হবেন। কিন্তু মীরের চরিত্রে নজরুলের অভিনয় দেখে ওয়াফা রাশেদী অবাক হয়ে গেলেন। তিনি কবি নজরুলকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি এত সুন্দর উর্দু কোথায় শিখলেন!"

উত্তরে তিনি বললেন, "আমার দেশীয় কবি ওয়াহ্শতের কবিতা পড়ার জন্যই আমি উর্দু শিখেছি।"

লেখক আরো বলেন,

আমাদের অভিনয় শেষ হবার পর আমি কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "যে মীরের অভিনয় আপনি করেছেন, তিনি আপনার দৃষ্টিতে কেমন কবি?"

উত্তরে তিনি বললেন, "আমি বেশি প'ড়েছি গালিবকে, তাঁকেই বেশি জানি এবং তাঁর কাব্য ভালোবাসি। কিন্তু মীরের কবিতা আমাকে পাগল করে দেয়! পাগল তো আল্লাহ্র ফজলে আমি আছিই! আমার এক পুরোনো পীর (কবি হাফেজ) আছেন, যাঁর শরাব খানার দরজা আমার জন্য খোলা সব সময় থাকে।"

এই কথাটি বলে তিনি হাফেজের রচনাবলীর প্রথম শেরটি প'ড়ে শোনালেন ঃ

আলা ইয়া আইয়ুহ্স সাকী আদির কা সাঁও ওয়ালা ভেলহা
কে ইশক আসান নমুদ আউয়াল ওয়ালে আফতাদ মুশকিলহা।

www.pathagar.com

খোদ উর্দু হরফে লেখা গজলও আছে নজরুলের।

উর্দু হরফে লেখা তাঁর কবিতাও আছে।

হিন্দী

হিন্দীতে মার্চ সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, ভজন, নাটকের গান, ছায়াছবির গান, এ রকম নানা ধরনের হিন্দী গান লিখেছেন নজরুল। 'জন্মাষ্টমী' রেকর্ড নাটিকা তিনি লিখেছেন হিন্দীতে। চিত্র-নাট্যও লিখেছেন হিন্দীতে। তাঁর বেশ কিছু হিন্দী গান আছে হিন্দী হরফে লেখা। 'বিদ্যাপতি' চলচ্চিত্রের হিন্দী ভার্সানের দীর্ঘ চিত্রনাট্য তিনি হিন্দী হরফেই লিখেছেন।

বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী— এই সাতটা ভাষা জানতেন নজরুল।

নজরুলের ইংরেজিতে লেখা একটি কবিতা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা তেমন বড় কথা নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা হলো ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনা এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনার বিষয়টি।

পাশ্চাত্য সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনার খবর কেবল শান্তিপদ সিংহের স্মৃতিকথায় নয়, "বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য" শিরোনামে তাঁর নিবন্ধেও পাওয়া। পাশ্চাত্য সাহিত্য বিষয়ে নজরুলের পড়াশুনা যে অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর ছিল সে উল্লেখ ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের লেখায়ও আছে।

।। চার ।।

নজরুলের কাছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আদর্শ কখনো ইউরোপ বা পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ছিল না। তা ছিল প্রাচ্যকেন্দ্রিক।

বাস্তবতার একটা দিক যখন এটা, তখন আর একটা দিক হলো এই যে, নজরুলের মূল কর্ম জগত ছিলো বাঙলাভাষী হিন্দু প্রাধান্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরী।

কিন্তু নজরুল ছিলেন উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের সাধক, অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক সুবিচারের স্বাপ্নিক এবং এই প্রেক্ষিতে যথার্থ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দার্শনিক।

যত দিন যাচ্ছে, তাঁর জীবন ও সৃষ্টি ততই আগের তুলনায় বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। কেবল দেশের নয়, তামাম উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ কার্যত কেবল তাঁর জীবন ও সৃষ্টিতেই আছে। এই বাস্তবতা তামাম উপমহাদেশকেই কার্যত একদিন স্বীকার করতে হবে। যাঁরা তাঁকে বোঝেন, তাঁরা তাঁর এ ব্যাপারটা স্বীকার করেন। এই স্বীকার করার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তাঁর জীবৎকাল থেকেই।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের মূল সমস্যাটা হলো সাংস্কৃতিক; প্রতিবেশী মনুসংহিতার সমাজের এক জাতিতত্ত্বের ধারণা। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতিতে নজরুল তাঁর স্বধর্মীদের অধিকারটাও অস্বীকার করেননি।

জানুয়ারি ১৯২৯-এ চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে তাঁর অভিভাষণে কবি বলেছিলেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎভার আপনারা গ্রহণ করুন— আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্য সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমসি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। আপনারা রুদকীর মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণ-ধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে।"

মুসলমানদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস ঐতিহ্য চর্চার জন্য রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের অনুরূপ মুসলমানদের পৃথক সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন নজরুল।

।। পাঁচ ।।

কবির পাশ্চাত্য সাহিত্যপ্রীতি

কবির পাশ্চাত্য সাহিত্যপ্রীতির একটা বিবরণ তাঁর অনুজপ্রতিম শান্তিপদ সিংহ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ তারিখে কলকাতার নবজাত প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তাঁর "নজরুল কথা" গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"কবি তখন বিবেকানন্দ রোডের একটা পুরোনো ভাঙা বাড়িতে থাকেন। প্রায় রোজই যাই। আমি তখন একটা বড় লাইব্রেরীর সদস্য। দু'হপ্তার ওপর টলস্টয়ের Resurrection বইটা এনেছিলাম। ইচ্ছা ছিল যাবার পথে বইটা বদলে নিয়ে যাবো। কিন্তু কোন কারণে লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় বইটা নিয়েই সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

কবি বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

বললাম, ওটা আর পড়তে হবে না। অনেক সময় নেবে শেষ করতে; বরং এক চাল খেলি।

দু'জনে খেলতে বসলাম।

তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখলাম। খেলার মাঝে মাঝে বইটার পাতা উল্টে যাচ্ছেন। দাবা তিনি ভাল খেলতেন এবং আমার খেলার শিক্ষাগুরু ছিলেন।

হেরেই যেতাম!

www.pathagar.com

কখনো হারাতে পারিনি।

সেদিন কিন্তু দু'বাজি খেলায় তাঁকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ড্র করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বাজি খেলার পর বইটা নিয়ে তিনি উঠে গেলেন।

আমিও অন্য ঘরে চলে গেলাম।

চলে আসবার সময় দেখলাম কবি বইটা নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বসে আছেন।

আমি বললাম, যাচ্ছি। কোনো জবাব না দিয়ে তিনি ঘাড়টা একটু কাত করলেন। অথচ আমি চলে আসবার সময় যাচ্ছি বললে খ্যাঁক করে উঠতেন, সে কি রে! এত শিগগির? তা কাল আসছিস তো?

তার পরের দিন যেতে পারিনি। তার পরের দিন যেতে কোন কিছু বলবার আগে সেই বইটা আমাকে দিয়ে বললেন, এটা বদলে আর একটা বই আনবি।

বইটা পড়তে আমার দু'হপ্তা লেগেছিল। আর তিনি দু'এক দিনের ভিতর সেটা পড়ে ফেললেন! সন্দেহ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, পুরো বইটা এর মধ্যে পড়েছো?

বললেন, কালই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিলাম, তুই আসবি। এটা বদলাবার জন্য দিয়ে দেবো।

আমার অবিশ্বাস হলো।

পরীক্ষা করার জন্য বইটা খুলে শেষের দিককার একটা জায়গা পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন ঘটনার পর বলো তো?

তিনি যা হুবহু বললেন, শুনে আশ্চর্য হলাম।

বইটা আমি ভাল করেই পড়েছিলাম। দেখলাম, তিনি তার চেয়েও ভাল করে পড়েছেন।

এটা অবশ্য টাটকা পড়া বলে মনে থাকার কথা। আমার মনে হয় দু'-চার বছর পরেও পরীক্ষা করলে তিনি হুবহু তা বলতে পারতেন।

প্রতিভাবান লোকদের কথাই আলাদা। এর আগে কবি বলেছিলেন যে, দু'-চারখানা বই বাদে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছুই পড়েননি।

সেই থেকে দু'চার দিন অন্তর আনতে লাগলাম ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, গর্কী, ভিক্টর হিউগো, টুরগেনীভ, মোপাসা প্রভৃতি নামকরা লেখকের বই। আর তিনি মুড়িমুড়কি খাওয়ার মতো সব পড়ে শেষ করতে লাগলেন। কিছু ইংরেজি কাব্যের বইও এনে দিয়েছিলাম।

এদিকে আমার লাইব্রেরীতে আর কোনো বই পাচ্ছি না এক শেক্সপিয়র ছাড়া। তাও ক'খানা এনে পড়তে দিলাম। ব্যাপার একই। ঐ দাঁত ভাঙা শব্দের লেখা এক দিনেই শেষ।

একদিন বললেন, 'কইরে, আর বই আনছিস না কেন?'

বললাম, এই ক'মাস ধরে যা খেয়েছ তা হজম করা হোক।

www.pathagar.com

দেখি, কবি বেশ ক্ষুণ্ন হলেন। আমি তখন সত্য কথা বললাম যে, তেমন বই আর আমাদের লাইব্রেরীতে নেই। কবির তখন ইংরেজি পড়বার একটা নেশা ধরে গেছে। ইংরেজি বই পেলে আর রক্ষা নেই। রাত ফুটো করে শেষ না করে আর ছাড়ছেন না। এমনকি, হুইলার স্টল থেকে আনা ছ' পেনি সংস্করণের বইও তিনি ভাল করে পড়তেন। এতে বাড়িতে একটা অশান্তি এসেছিল কিছুদিন— কবির স্নান-খাওয়া-শোয়া নিয়ে। এ নিয়ে আমাকেও কিছু বাক্যবাণ সইতে হয়েছে বই এনে দিই বলে।

কবি বললেন— কাল থেকে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে যাবেন। আমি বললাম, না, যেতে হবে না। আমি বন্দোবস্ত করেছি। বই বাড়িতেই পাবে।

তারপর আমার এক বন্ধুর সাহায্যে অনেক বই অনেক জায়গা থেকে চিনির বলদের মতো এনে পড়িয়েছি।

এমন একদিন এলো যখন ইংরেজি, রুশ, ফরাসি সাহিত্যের প্রায় সব বই-ই তিনি পড়ে ফেললেন। যেমন তেমন করে নয়, সত্যিকার পড়ার মতো করে পড়া।

এই বই সংগ্রহ করে পড়বার ভিতরে একটা কথা আছে। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল বাবু একদিন বলেছিলেন যে, কাজীর পড়াশুনা কম, ওকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাল করে পড়াতে হবে। সংস্কৃত পড়া ওর পক্ষে অসম্ভব। ইংরেজি জানে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের যত ভাল বই আছে সেই সব যদি কেউ যোগাড় করে দিয়ে পড়ায় তবে ওর যে প্রতিভা ও শক্তি আছে সেটা চার গুণ বাড়বে।

উনি নিজেও বিকেলে কবির কলেজ স্ট্রিটের, টার্নার স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে প্রায় রোজ মিলটন, শেলী, কিটস প্রভৃতি পড়ে শোনাতেন ব্যাখ্যা করে। অবশ্য তিনি কাব্যের বই-ই বেশি পড়তেন।

একদিন কবিকে বললাম, কবি, সিনেমা দেখতে যাবে? কবি বললেন, ধেয়াৎ, আয়, একটু খেলি।

আমি বললাম, ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল এসেছে, যাবে?

শুনেই কবি সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, কোথায়?

আমি বললাম, ম্যাডানে।

কবি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

বললাম, লোক পাঠিয়ে টিকিট আনিয়ে নেবো। তুমি ৫টা নাগাদ তৈরি থেকো। আমি এসে নিয়ে যাব।

কবি বললেন, তোর আসার দরকার নেই। ৬টার আগে আমি কাউন্টারের কাছে থাকব।

আমি বললাম, না, তুমি সব চিন লোক। কেউ গান গাইতে ধরে নিয়ে চলে যাবে।

কবি-পত্নী বললেন, সে সম্ভাবনা আছে।

আমি বললাম, আমি এসে গাড়ি করে নিয়ে যাব।

অবশ্য বুঝেছিলাম, তিনি লা মিজারেবল পড়েছেন। চিত্রে কী রকম দেখায় তা তিনি দেখবেনই। অন্য কোন আকর্ষণ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

www.pathagar.com

তার পর দিন দু'জনে সিনেমা দেখতে গেলাম। বই আরম্ভ হল। মনে হল তিনি খুব একাগ্র মনেই ছবিটা দেখছেন।

ছবি শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন— হ্যাঁ, এরা ছবি তুলতে জানে। বইটার sprit সব বজায় রেখেছে।

এই বইটাকে তিন-চার মাস আগে তাঁকে পড়তে এনে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি অনেক আগে বই পড়েছিলেন। কিন্তু এই বইটার সবটাই তিনি বেশ স্পষ্ট মনে রেখেছেন। এইটিই হল সবচেয়ে যোগ্যতার কথা।

একদিন কবির সীতানাথ রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখি, কবি বেরিয়েছেন প্রায় ঘণ্টা দুই আগে।

তখন বেলা ৩টা। উদ্দেশ্য কিছুটা টাকা যোগাড় করে আনা। ঘরে সব জিনিসই বাড়ন্ত।

আমি রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে কবি পরিবারের সাথে কথা বলছি। কবি ফিরে এলেন হাতে চারখানা চকচকে ইংরেজি বই নিয়ে। আমাকে বললেন, বাইরে বইওয়ালাকে বসিয়ে এসেছি, তুই যা, ওর সাথে কথা বল। টাকা আসছে, তা থেকে ওকে ৮টা টাকা আর ওর গাড়ির ভাড়ার জন্য চারআনা দিয়ে দিস।

কবির তখন আট টাকা চার আনা দিয়ে বই কিনবার মতো সচ্ছল অবস্থা নয়। একটু আগে শুনেছিলাম, চাল, ডাল, ময়দা, তরিতরকারী সব আনতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, টাকাটা আসছে কোথা থেকে?

গোপালদা এক্ষুণি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি উপরে গেলেন।

ব্যাপারটা যা সংগ্রহ করেছিলাম সেটা হচ্ছে, খরচের তাগিদে কবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে যান অধমতারণ ডিএম লাইব্রেরীতে। গোপাল বাবু দোকানে না থাকায় কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি কলেজ স্ট্রিটের দিকে চলে যান। উদ্দেশ্য ছিল, আফজাল সাহেবের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা। বিপদ হয় ঐ প্রেসিডেন্সী কলেজের সীমানা রেলিং-এর কাছে। সেখানে পুরানো বই টাঙানো থাকে। হঠাৎ ঐ বইগুলো চোখে পড়ে যায় এবং কিনে ফেলেন। দরদস্তুর করার স্বভাব ছিল না। বইওয়ালাকে বললেন, চল আমার সাথে, দাম দিয়ে দিচ্ছি।

বইওয়ালা কবিকে চিনত।

ব্যাস!— তাকে নিয়ে পদব্রজে আবার হেদোর কাছে ডিএম লাইব্রেরী, তারপর বাড়ি।

বের হওয়ার সময় পয়সা কড়ি সাথে নেয়ার অভ্যাস কবির ছিল না। যদি তাঁর স্ত্রী কিংবা শাশুড়ী কিছু পয়সা পকেটে দিয়ে দিতেন তাহলে হয়তো ট্রামে উঠতেন। তা না হলে টালা-টালিগঞ্জ হেঁটেই মেরে দিতেন।

সৌভাগ্যবশত গোপাল বাবু ততক্ষণ দোকানে ফিরেছেন। কিন্তু ক্যাশে টাকা বিশেষ কিছু নেই। গোপাল বাবু বললেন যে, তুমি বাড়ি যাও। আমি টাকা আনিয়ে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কবি বইওয়ালাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসেন।

www.pathagar.com

গোপাল দা যে কখন টাকা পাঠাবেন তার ঠিক নেই। আমি বাইরে গিয়ে বইওয়ালার সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। কথাবার্তায় কতকটা বুঝে নিলাম ব্যাপারাটা কি হয়েছিল।

দেরি হচ্ছে দেখে গোপালদার ওখানে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় দশ টাকার নোট নিয়ে গোপাল বাবুর লোক এসে হাজির হল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এখন ঐ দশ টাকাই দিয়েছেন। কাল আবার দেবেন।

সংসারের সব জিনিসই কিনে আনতে হবে। আট টাকা চার আনার পাওনাদার মেটার পর থাকবে মাত্র এক টাকা বারো আনা।

বইওয়ালাকে দশ টাকার নোটটি দিতেই সে চট করে এক টাকা বারো আনা দিয়েই সরে পড়ল। আমি সেটা মাসিমার হাতে দিতেই তিনি সবগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ওপরে ওঠে গেলাম।— দেখলাম কবি ধ্যানমগ্ন। আমার উপস্থিতিটা সাড়া দিয়ে জানাতে হল।

মুখ তুলেই বোস বলেই আবার বইয়ের ভেতর ডুবে গেলেন।

তাঁর খেয়ালই নেই যে, যে বই নিয়ে তিনি মশগুল হয়ে রয়েছেন তার দামটা দেয়া হল কিনা কিংবা গোপাল বাবু টাকা পাঠালেন কিনা কিংবা কত টাকা পাঠালেন ইত্যাদি। শেক্সপিয়র নিয়ে তিনি এত মগ্ন যে, সাংসারিক খরচপত্রের কথা তাঁর একদম মনে নেই।

তাঁর এই ইংরেজি সাহিত্য প্রীতিটা আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু সংসারের ঐ শোচনীয় অর্থাভাব যে তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি এই জন্য আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে যখন তাঁর কোন সাড়া পেলাম না তখন বললাম, গোপাল দা কত টাকা পাঠিয়েছেন জান? কথাটা তাঁর কানে বোধ হয় প্রবেশ করল না। তখন অপেক্ষাকৃত একটু চেঁচিয়েই বললাম, কি শুনতে পাচ্ছো না?

কবি বই থেকে মুখ তুলে বললেন,— হ্যাঁ, গোপাল দা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে তো? বইওয়ালাকে দিয়েছিস?

বললাম, হ্যাঁ, তা তুমি আজ দুপুরে যে জন্য বেরিয়েছিলে তার কি হল?

কবি আমার দিকে বোকার মতো চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, কী? বুঝতে পারনি?

গোপাল দা দশটি টাকা মাত্র পাঠিয়েছেন। তার ভেতর তো আট টাকা চার আনা নিয়ে গেল। চাল, ডাল, নুন, তেলের জন্য এক টাকা বারো আনা আছে।

বললেন, 'আমি এখুনি গোপালদার কাছে যাচ্ছি টাকা আনতে।' বলে আবার বইতে মনোনিবেশ করলেন। গোপালদার ওখানে যাবার কোন উৎসাহ উদ্যোগ দেখতে পেলাম না।

'ওঠো তাড়াতাড়ি। বাজারে দোকানে লোক পাঠাতে হবে' বলে আমি অন্য ঘরে চলে গেলাম। যাবার সময় দেখে গেলাম তিনি সেই রকমই নিবিষ্টমনে বই পড়ছেন।

থিয়েটারের লোকটাকে বিদায় দিয়ে এলাম। এখন উনি থিয়েটারে চলে গেলে

www.pathagar.com

গুষ্টিশুদ্ধ লোকের উপোস অনিবার্য। উপরে এসে দেখি কবির সেই পূর্বাবস্থা। তখন আমি বেশ রাগত কণ্ঠস্বরে কিছু জোর দিয়েই বললাম, 'তুমি শেক্সপিয়র খেয়ে পেট ভরাতে পার', বাড়ির আর সকলের, বিশেষ করে বাচ্চাগুলোর পেট শেক্সপিয়র দিয়ে ভরবে না। ওঠো, চলো গোপাল মজুমদারের ওখানে। আমিও সাথে যাচ্ছি।'

কবি বই থেকে মুখ তুলে আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমি আবার জোর দিয়ে বললাম, 'ওঠো, ওঠো, জামা গায়ে দাও।'

কবি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই-ই যা। আমি এটা শেষ করে ফেলি।'

আমি গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, 'বইগুলো টান মেরে ফেলে দেবো; ওঠো শিগগির।'

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইটা একবার দেখে নিয়ে উঠে পড়লেন।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওপর কবির যে ব্যাপক পড়াশুনার কথা শান্তিপদ সিংহ তার স্মৃতিকথায় বলেছেন তার ব্যাপক সমর্থন পাই ১৩৩৯ (১৯৩২-১৯৩৩) সালে প্রকাশিত কবির "বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য" নিবন্ধে। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিশ্ব সাহিত্য কেবল পড়া নয়, তার স্বীকরণও আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় নানান ভাষায় যেসব স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক অবদান রেখেছেন তাদের সাহিত্য যে কবি কত ব্যাপক এবং গভীরভাবে পড়েছেন সে পরিচয় তাঁর এই দীর্ঘ নিবন্ধটিতে আছে।

বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য

১৩৩৯ (১৯৩২-১৯৩৩)-এ প্রাতিকায় প্রকাশিত কবির নিবন্ধ "বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য" নানান ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কেবল ব্যাপক নয়, বিস্ময়কর পড়াশুনার পরিচয় দেয়। তাঁর অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তিরও পরিচয় রয়েছে এখানে। বিস্ময়কর পড়াশুনা এবং বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, এই উভয় ব্যাপারই না থাকলে এই নিবন্ধ এভাবে তিনি লিখতে পারতেন না। এই একই উল্লেখ তাঁর অনেক কবিতা, গান, অভিভাষণ, এ রকম তাঁর নানা সৃষ্টি প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

"বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য" শীর্ষক নিবন্ধে শুরুতেই তিনি বিশ্বসাহিত্যের দুটো রূপের কথা লিখেছেন ঃ

"বর্তমান বিশ সাহিত্যের দিকে একটু ভালো করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মতো, মিল্টনের Bird of Paradise-এর মতো এই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে,...

আর এক রূপে সে মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে— অন্ধকার নিশীতে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে— ...

ধূলিমলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না— তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে স্বর্গ যদি থাকেই তবে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধুলায় নামিয়ে আনব। আমাদের এই পৃথিবী চিরদিনই তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের

www.pathagar.com

মাটির মায়ের দাসী করবো। এর এ ঔদ্ধত্যে সুর-লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন ঃ অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামী।

এরাও চোখ পাকিয়ে বলে ঃ আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন ঃ দৈত্যের এ ঔদ্ধত্য কোনো কালেই টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে ঃ কেন যে টেকেনি, তার কৈফিয়ৎই তো চাই দেবতা!...

দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী।

একদিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers, স্বপ্নচারী; আর এক দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্বসাহিত্যে এ দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই তা নয়।

এই দুই Extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পঙ্খীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালোবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে— স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা, সে রাজরাণী বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার ওপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়— তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। তার আর ভাইদের মতো, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি— সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে— লিওঁনিদ আঁদ্রিভ, ক্নুট হামসুন, ওয়াদিশল রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মতো হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী— তাঁরা ভৃগুর মতো বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন— এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল্ নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করবো। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি, নতুন স্রষ্টা সৃজন করবো।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন ঃ

A thing of beauty is a joy for ever : (ENDYMION)

Beauty is truth, truth beauty.

www.pathagar.com

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whiteman বলেন ঃ

Not Physiognomy alone—
Of physiology from top to toe I sing,
The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সগারের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে, বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদেরে বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রুজার পাইন যমরাজা প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার ল্যাজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাত মুখ যদি পোড়েই— তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব। বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে— এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়।....

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করায় পুণ্যবান মুখ-পোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে।

সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না— এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে।...

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে— 14th December— ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের 14th December. এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-'র বেদনা-চীৎকার—14th December...." । এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি, বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভা-দীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস! এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লট্‌কানো মৃত্যু-পাণ্ডুর মূর্তি!

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Grime and Punishment। রাস্কলনিকভ্ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ্ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বল্‌লে,— "I bow down not to thee but to suffering humanity to you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠ্‌ল। নিখিল মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠলো। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে! সে মহাপ্লাবনে নূহের তরণীর মতো ভাসতে লাগলো সৃষ্টি— প্লাবন-শেষে নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

www.pathagar.com

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মতো— ভয়াবহ সাইক্লোনের মতো বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। শেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে ঃ তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন ঃ That man has only one God and that is Satan। কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না।

গোর্কি বললেন ঃ "দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।..."

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে! জার গেল— জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত— হয়ত-বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তাঁর প্রভাব আজও রাশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্ক্সের ইকনমিক্সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে! পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মতো এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে!

গোর্কির পরে যেসব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কিনা, তা আজ বলা দুষ্কর!

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যান্ডিনেভিয়া। আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবী রাশিয়া যেমন করে— তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের ক্নুট্ হ্যাম্সুন—যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের ওঁরাই-বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি-বা ইবসেনের মানস-পুত্র!

হ্যামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer অর্ধেক ঔপন্যাসিক। যোহান বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপে-পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হ্যাম্সুনের Growth of the Soil-এর, Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মতো স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—তার তুলনা জগতে কোন কালে কোনো সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃখ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু

www.pathagar.com

যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রুক্ত-তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখ ভরা জল। রাশিয়া বলে: এ বেদনাকে পরুষ শক্তিতে অতিক্রম করব, ভুজ বলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধকারা! নরওয়ে বলে ঃ প্রার্থনা কর! ঊর্ধ্বে আঁখি তোল! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না!

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উঠে যায়— হঠাৎ কোন অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে! চোখের জলকে তারা মুখের বিরূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি চার্বাকের মতো, জাবালির মতো, দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্নাড শ'—আনাতোল ফ্রাঁস—জেসিঁতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড! শ' বলেন ঃ Love টাভ কিছু নয়— ও হচ্ছে মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে Sex. আনতোল ফ্রাঁস বলেন ঃ কি হে ছোকরারা! খুব তো লিখছ আজকাল! বলি, ব্যালজাক জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leo-nardo-'র মুখ দিয়ে বলে— "বন্ধু! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল, তাকে ভুলতে হলে ভালো করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়, সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে দিতে না পারে— তবে তার মরাই মঙ্গল!...

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম, কিন্তু সে বার্নার্ড শ'-র মতো অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ জীবনের সহজ দুঃখ-সুখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল্ রেমন্ট— পোলিশ— আর একজন গ্র্যাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালীয়ান।

কিন্তু গল্পশোনা হয় না।—হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, আবার যুদ্ধ বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধবাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি, তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালীর দ্যুআননতৃসিও, কিংলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনী এবং তাঁর কৃষ্ণ-সেনারা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনির মতো শ্রেষ্ঠ স্বপন-চারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—"The sound of the bell, that leaves the bell itself!" তারপরেই সে বলে, "আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না, ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে, তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা!"

www.pathagar.com

শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে! ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব-গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি— পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র-চালকের বাঁশী,—তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মতো দেহ!

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলিখেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি— "Thou wast not born for death, immortal Bird!"

কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে নজরুল নিজের অবস্থানটার কথা উল্লেখ করেছেন নিবন্ধটির একেবারে শেষের দিকে।

নজরুল আসলে রোম্যান্টিক কবি। বিদ্রোহী কবি তিনি বাধ্য হয়েই হয়েছেন গণমানুষকে ভালোবাসেন বলে!

নিবন্ধটি পড়ে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যে দখল তাঁর চেয়ে কারো বেশি ছিলো না। তবে এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, তাঁর আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আদর্শ কখনো পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ছিল না। তা ছিল প্রাচ্যকেন্দ্রিক, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক, যেটা তাঁর ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং আধিপত্য চেতনার বিরোধিতার সঙ্গে খাপ খায়, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির চেতনার সঙ্গে খাপ খায়।

নজরুল পড়াশুনা করেছেন সব রকমের, কিন্তু দিয়েছেন সে রকমই যেটা আমাদের প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে, স্বকীয়তা বিকাশের সঙ্গে, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মশক্তি বিকাশের সঙ্গে খাপ খায়।

সঙ্গীত

সঙ্গীতের বিষয়েও তিনি যে ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন সেটা তো আর এক বিশাল অধ্যায়।

কবি সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের 'লক্ষ্য সঙ্গীত' মূল সংস্কৃতে পড়েছিলেন। রাজা নওয়াব আলী খানের সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ 'মারিফুন্নাগমাত' তিনি পড়েছিলেন মূল উর্দুতে। সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক আমীর খসরুর গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন মূল ফার্সিতেই।

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও 'রাগ-লক্ষণ', 'সারামৃত' 'রাগ-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থ যে মূল সংস্কৃত ভাষায় কবি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন সে কথা "অপ্রকাশিত নজরুল" গ্রন্থে আবদুল আজীজ আল আমানও লিখেছেন।

কবি ব্যাপকভাবে তাঁর অনেক পুরোনো গান হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন। অনেক নতুন গানও তিনি হিন্দীতে লিখেছিলেন।

রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কবির পঠন-পাঠন ও অভিজ্ঞতা যে কত গভীর সে পরিচয় তাঁর অসামান্য ঐতিহাসিক সৃষ্টি 'স্বর ও শ্রুতি'-তে আছে। এই গ্রন্থে কবি প্রায় তিন শ' রাগ-রাগিণী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

সঙ্গীতে নজরুলের বিস্ময়কর অবদান নিয়ে সঠিক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত তাঁর নানান গ্রন্থে ও নিবন্ধে। কবির সঙ্গীত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অবশ্য আরও অনেকেই, যেখানে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনা এবং সাধনা ও সৃজন ক্ষমতার পরিচয় আছে। সব মিলিয়ে পড়াশুনার, সাধনার ও অবদানের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর নজরুল!

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে কবি তালিম নিয়েছেন ছাত্রজীবনে শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক সতীশ চন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে, সৈনিক জীবনে এক খান সাহেবের কাছে, সেনাবাহিনী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর হুগলীতে থাকাকালে এক উস্তাদের কাছে, ঠুংরীর রাজা উস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে, গজলের নামকরা শিল্পী উস্তাদ মস্তান গামার কাছে, মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কোবিদ উস্তাদ কাদের বখশের শিষ্য, ঠুংরী ও গজলে পারদর্শী মুর্শিদাবাদের উস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে, পিয়ারু সাহেবের কাছে, মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কোবিদ উস্তাদ কাদের বখশের কাছে, তানসেন ঘরানার উস্তাদ দবীর খাঁর কাছে, উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে, আসফাক হোসেন খাঁর কাছে, এমনকি উস্তাদ বাদল খাঁর কাছেও। মুস্তাক হোসেন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, বসির খাঁ, এনায়েত খাঁ, আগ্রার মুস্তারী বাঈ, মজিদ খাঁ, কেরামৎ খাঁ, হীরা বাঈ, সুন্দরী বাঈ, এদের কাছ থেকেও কবি অনেক কিছু নিয়েছেন বলে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র 'কাজীদা' শিরোনামে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। কবির বিষয়ে এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন ঃ

"সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠেও তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। সঙ্গীত সম্পর্কে সুলভ দুর্লভ যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। সে হিন্দী ভাষায় হোক, উর্দু, ইংরাজি বা বাংলা ভাষারই হোক, তিনি কোন্ সুর কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার সম্পূর্ণ খবর কেউই রাখেনি। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তার কিছু এখানে উল্লেখ করছি।" (তথ্য সূত্র ঃ "কাজীদা"/ ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র/১৪০৫-এর মহালয়ার দিন ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত "শত কথায় নজরুল"।)

কল্যাণী কাজী সম্পাদিত উক্ত "শত কথায় নজরুল" গ্রন্থে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগী সঙ্গীত শিল্পী ও বাসন্তী সঙ্গীত বিদ্যাবীথির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন সেন "সঙ্গীত-স্রষ্টা নজরুল" শিরোনামে তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"কাজী সাহেব রাগ-রাগিণীর এই বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে। গ্রামোফোন কোম্পানীতে তিনি ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানের সান্নিধ্যে আসেন এবং কার্যত শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ নিবাসী ওস্তাদ কাদের বক্স ও মঞ্জু সাহেবের নিকটও তিনি বহু রাগ-রাগিণী আয়ত্ত করেন। ঠাকুর নবাব আলি চৌধুরী প্রণীত সঙ্গীত-পুস্তক থেকে তিনি বহু অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর হদিশ পান।"

কেবল পড়ার ব্যাপারে নয়, শেখার ব্যাপারেও কবির ছিল অপরিসীম আগ্রহ এবং এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার ছাপটাও থাকতো। পূর্বোক্ত "কাজীদা" শীর্ষক স্মৃতিকথায়

www.pathagar.com

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে রাই চাঁদ বড়ালের বাড়িতে 'লাল চাঁদ' উৎসব হতো। এ উপলক্ষে সর্বভারতীয় সঙ্গীত গুণীদের সমাগম ঘটতো বড়াল বাড়িতে। ফৈয়াজ খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, হরিশ চন্দ্র বালী, বসির খাঁ, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, এনায়েৎ খাঁ, আগ্রার মুস্তারী বাঈ ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের গান শুনতে কাজীদা বড়াল বাড়ি যেতেন, গুণীদের সাথে আলাপ করতেন, আলাদা করে ও নিভৃতেও কিছু গান শুনে নিতেন। লাল চাঁদ উৎসবে গাইতে বা বাজাতে এসে কয়েকজন ওস্তাদ রাইবাবুর দাদা গঙ্গা বাবুর (কিষণ চাঁদ বড়াল) পৃষ্ঠপোষকতায় বড়াল বাড়ির পিছনের অংশে অনেক দিন পর্যন্ত থাকতেন। এভাবে বড়াল বাড়িতে দীর্ঘদিন বাস করেছেন ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন ও আশফাক্ হোসেন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, মজিদ খাঁ, কেরামৎ খাঁ এবং আরো কেউ কেউ। আসফাক হোসেন ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার ওস্তাদ। কি চমৎকার যে তিনি গাইতেন যারা শুনছেন তারাই জানেন। ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন তাঁর দাদা ও সঙ্গীত গুরু ছিলেন।

বড়াল বাড়িতে বাস করার সময় আস্ফাক্ হোসেনের কাছে অন্তত দু'জন তালিম নিয়েছেন। তার মধ্যে একজন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অপরজন আমাদের কাজীদা। নতুন নতুন চীজ্ সংগ্রহ করার জন্য কাজীদা আসফাক হোসেন সাহেবের কাছে সপ্তাহে দু'দিন দক্ষিণা দিয়ে গান শিখতেন। একদিন ওস্তাদ (আসফাক হোসেন) একটি চমকপ্রদ গান শোনাচ্ছিলেন। ওস্তাদ কিন্তু ওই গানটি শেখাতে রাজি হলেন না। বললেন, কাজী সাহাব—এতো মেরে ঘরকা খাস্ চীজ্ হ্যায়, ইয়ে ম্যয় ন্যহি দে শক্তা।

কাজীদা অনুনয় করতে লাগলেন, কিন্তু ওস্তাদ নারাজ।

শেষে তিন শ' টাকার বিনিময়ে ওস্তাদ গানটি দিতে রাজি হলেন। অত টাকা কাজীদা'র পক্ষে দেয়া সম্ভব হলো না, ওস্তাদও আর ওই গান দ্বিতীয়বার শোনালেন না।

কাজীদা কিন্তু একবার শুনেই ওই গানের মধ্যে সুরের বিশিষ্ট চলনটুকু আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন, যা ওস্তাদ কল্পনাও করেননি। কয়েক দিনের মধ্যে এই কাজীদা ওই সুরে একটি গান বাঁধলেন। গানটি কেমন হয়েছে জানবার জন্য কাজীদা ওই ওস্তাদের কাছে গিয়ে শোনালেন।

ওস্তাদ গানটি এত পছন্দ করলেন যে— বলে উঠলেন, কাজী সাহাব, ইস্কো হিন্দি মে লিখকে দিজিয়ে।

কাজীদা বললেন, ওস্তাদজি, হিন্দি গান তো আপ্কা পাসই হ্যায়, আপহি তো শুনায়া, উসিসে তো বাংলা গান বানা লিয়া।

ওস্তাদ বললেন, আরে ছোড়িয়ে উস্কো, ইয়ে বাংলা গানা হিন্দীমে লিখ্ দিজিয়ে।

এর মানে নিশ্চয় এই যে, কাজীদার বাংলা গানটি ওস্তাদের ঘরের খাস চীজের চেয়েও ভালো হয়েছে, ওস্তাদ এটিকেও সংগ্রহের মধ্যে রাখতে চান। কাজীদার সেই গানটি হলো– 'সন্ধ্যা মালতী যবে ফুল বনে ঝুরে।' এই গানের সুরে কী নতুনত্ব

www.pathagar.com

সেটা একটু বুঝিয়ে বলি।...

"সন্ধ্যা মালতী যবে" গানটি ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রী রাগে বাঁধা। ধানশ্রী রাগটির বেশ কয়েক রকম প্রকারভেদ আছে। প্রথম প্রকার হল পূরবী ঠাটের ধানশ্রী, যাকে পুরিয়া ধানেশ্রী বলা হয়। এই প্রকার ধানশ্রী খুবই প্রচলিত, অনেকেই জানেন। দ্বিতীয় প্রকার ধানশ্রী হয় কাফি ঠাটে, এতে ভীমপলশ্রী রাগের ছায়া পরিস্ফুট হয়, এই প্রকারও যথেষ্ট প্রচলিত। তৃতীয় প্রকার ধানশ্রী হয় ভৈরবী ঠাটে, যেটি যথেষ্ট প্রচলিত নয়, কদাচিৎ কোন ওস্তাদ গেয়ে থাকেন, যেমন আসফাক হোসেন কাজীদার সামনে একবার গেয়েছিলেন। এই রাগের আরোহণ অবরোহণ এই রকম–

ণ্ স জ্ঞ ম প ণ র্স

র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স।

এই রাগের আরোহণে একটু ভীম পলশ্রী ছায়া আসে। কারণ তার পর্দাগুলিও একই রকম, যদিও পঞ্চম থেকে কোমল নিষাদে ওঠার মধ্যে বা কোমল নিষাদের বিশিষ্ট আন্দোলনে ভীমপলশ্রীর যে স্বকীয়তা সে রকম প্রক্রিয়া ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রীতে আনা কর্তব্য নয়। এর অবরোহণে ভৈরবী অঙ্গ এসে পড়ে এবং এটাই এই রাগের অভিনবত্ব। এটি এমন একটি মনোহর রাগ, যাতে সন্ধি প্রকাশের এক বিশেষ রূপ প্রস্ফুটিত হয়, সন্ধ্যার সুরে প্রভাতী সুর মিশে যায়। সন্ধ্যার দিকে যখন সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে তখন ভোরবেলার সেই আলো আঁধারী রূপটির একবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, যারপর অন্ধকার ঘনীভূত হয়। গানের কথাতেও কাজীদা সেই বর্ণনা ক'রেছেন–

সাঁঝের পূর্ণ চাঁদে অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠল গাহিয়া...."

এর অপূর্ব বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র তাঁর 'কাজীদা' শিরোনামে উক্ত স্মৃতিকথায় দিয়েছেন সেটা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও নজরুল সঙ্গীত শ্রোতা সবারই জানা দরকার। এরপর ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের মন্তব্য ঃ

"উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কত সূক্ষ্ম-কৌশল যে কাজীদা তাঁর গানে প্রয়োগ করতেন সেসব ঠিক ভাষা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। ওঁর ইচ্ছা ছিল, যাবতীয় রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে বাংলা গান বাঁধবার। অপ্রচলিত অনেক রাগে তিনি গান বেঁধেও ছিলেন, নতুন রাগও উদ্ভাবন করেছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।..."

পূর্বোক্ত "শত কথায় নজরুল" শীর্ষক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "সুরলিপি" শিরোনামে স্মৃতিকথায় জগৎ ঘটক লিখেছেন ঃ

"কবিকে আমি তন্ময় হয়ে সঙ্গীতগ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছি, দেখেছি নির্জন পরিবেশে মনের মতো সুর উদ্ভাবনের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, দেখেছি আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলে সঙ্গীতের ধ্যানে মগ্ন অবস্থা, একদিন শুধু নয়, দিনের পর দিন।"

এরপরে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

"অপ্রচলিত ও নতুন রাগের গান বাঁধবার ইচ্ছা কবির মনে বাসা বাঁধে ত্রিশের

www.pathagar.com

দশকের শেষ দিকে!... যেসব রাগ-রাগিণী ওস্তাদরা হাতছাড়া করেন না, কোন জায়গায় কেউ গেয়েও শোনান না, সেই রকম রাগগুলি অবলম্বনে বাংলা গান রচনা করে ওইসব সুর সহজলভ্য করতে হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি বই করতে হবে, তাকে স্বল্প প্রচলিত রাগ-রাগিণী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং স্বরলিপিসহ বাংলা গান থাকবে। রাগ-রাগিণীর একটা লিস্ট তৈরি হয়েছিল। নানা সঙ্গীত গ্রন্থ থেকে নোট লেখা হয়েছিল। কবি সমসাময়িক নানা ওস্তাদের সঙ্গলাভ করেও অনেক চিজ্ সংগ্রহ করতেন, প্রখর স্মৃতিশক্তিতে রাগের চলন মনে মনে ধ'রে রাখতেন। বেশ কিছু অপ্রচলিত রাগের বাংলা গান কবি তৈরি করে ফেললেন।

আবার নতুন রাগের লিস্ট হলো। এই সময় কবি প্রত্যহ আমাদের বাসায় এসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অপরিসীম নিষ্ঠায় সঙ্গীত গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে সুরেশদা আসতেন (সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী)। কবির সাথে তাত্ত্বিক আলোচনা করতেন, নতুন রাগ সৃষ্টি এবং রাগ মিশ্রণ সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করতেন। এই সময় কবি নবাব আলি চৌধুরীর একটি উর্দু বই 'মারিফুন্নাঘমাউ' খুব ব্যবহার করতেন। বইটি শতছিন্ন ছিল, কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন জানি না, আঠা দিয়ে যত্ন করে জুড়ে ব্যবহার করেছিলেন। কবি ফার্সি সঙ্গীত গ্রন্থও সংগ্রহ করেছিলেন— আমির খসরুর লেখা প্রাচীন বই। ভাতখণ্ডের বই তো ছিলই, আরো অনেক বই ছিল। প্রত্যেকটি বই তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, দাগ দিতেন, পাশে নোট লিখতেন। অনেকেই জানেন না, সঙ্গীতশাস্ত্র ঘেঁটে কবি কি বিপুল সঙ্গীত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সুরেশদা কবিকে ভৈরব রাগের প্রচলিত রূপ এড়িয়ে নতুন সুরের রূপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। কবি সেই নিয়ে মেতে উঠলেন, এমন কি ঘুমের মধ্যেও রাগ-রাগিণীর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, নতুন ভৈরব রাগের উদ্ভাবন করলেন— অরুণ ভৈরব, উদাসী ভৈরব, রুদ্র ভৈরব ইত্যাদি।"

নজরুলের প্রতিভার বিষয়ে যেমন, তেমনি তাঁর পড়াশুনার বিষয়ে আলোচনা নিশ্চয়ই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণা করাটা নিশ্চয়ই সম্ভব যে, নজরুলের পড়াশুনা এবং জানাশুনার আগ্রহটাও ছিল অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। অন্তত বাংলার যে কোনো কবি-সাহিত্যিক, গীতিকার, সঙ্গীত শিল্পীর তুলনায় তাঁর ছিলো অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক পড়াশুনা এবং শিক্ষা। সে পরিচয় আমরা তাঁর সৃজনশীল কাজের, অবদানের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেই কেবল পেতে পারি। কিন্তু সেই কাজটা আজও হয়নি। হলে নানা ক্ষেত্রে নজরুলের অপরিসীম অবদান যে আমাদের জন্য কতখানি মহৎ বিশাল অবদান সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম। সেটা উপলব্ধি করে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রে, তাঁর জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক চর্চার ক্ষেত্রে আরো উৎসাহী ও উদ্যোগী হতে পারতাম। আমাদের স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটির পাঠ্য তালিকায় তাঁকে এখনো যে উপযুক্ত মর্যাদায় ঠাঁই দিইনি সেটাও বুঝতে পারতাম, উপলব্ধি করতে পারতাম এবং এ বিষয়ে আমাদের একটা উদ্যোগ আসতো।

www.pathagar.com

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে মহালয়া ১৪০৫-এ প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত "শত কথায় নজরুল" গ্রন্থে "নজরুল ইসলামের সাহচর্যে" শীর্ষক স্মৃতিকথায় নজরুলের শিখবার ক্ষমতা ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন ঃ

"আমাদের ছেলেবেলায় ও কৈশোরে সাঈদ বখ্শ মিয়া খুব নামকরা পাহ্লোয়ান ছিলেন। তিনি সিলেটের অপর বিখ্যাত কুস্তিগীর যশোদা লালকে পরাজিত করেছিলেন। সেই বখ্শের মতো ইলু মিঞাও ছিলেন একজন নামকরা কুস্তিগীর। দেখতেও ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের সিলেটের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আলহাজ্ উসমান মিঞা সাহেবের ছোট ভাই।

সেই পাহ্লোয়ান ইলু মিয়া নজরুলের দাওয়াতের বন্দোবস্ত করেন নয়া সড়কের লাল মিঞা মোক্তার সাহেবের বাড়িতে। তাঁর পক্ষে খানাপিনা পরিবেশনে নিযুক্ত ছিলেন উসমান মিঞা সাহেবের ছেলে আমাদের সহপাঠী আবদুল হামিদ ও দিলাল মিঞা সাহেবের ছেলে আমাদের অপর সহপাঠী আবদুর রহমান। খানার আয়োজন ছিল প্রচুর। নজরুল ইসলাম ছাড়া আমি, আমার বন্ধু ঢাকা ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস মরহুম আবদুস সুবহান চৌধুরী, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর মরহুম আতিকুর রাজা চৌধুরী এবং আরও জন দুয়েক ছিলাম। প্রত্যেক মেহমানের জন্য পরিবেশন করা হলো দুটো করে মস্ত বড় পরোটা, খাঁটি ও টাট্কা ঘিয়ে ভাজা; তার সঙ্গে দেওয়া হল একটি করে আস্ত মুরগীর মুসল্লাম। নজরুল একটা মুরগীর রাণ ছিঁড়ে নিয়ে একটা পরোটার কিছুটা খেতে লাগলেন। প্রায় পনের মিনিটই এই পরোটা ও মুসল্লাম নিয়ে কসরত করছেন দেখে ইলু মিয়ার আর ধৈর্য রইল না। তিনি করজোড়ে আরও বেশি খাওয়ার জন্য নজরুলকে অনুরোধ করেন ঃ "কাজী সাব, আরও বেশ্ করি খাউকা, হক্কলতা নুরুইছে। বিরিয়ানী, কুফতা, কালিয়া— আপনি তো খালি পরোটাই খাইতা পারলা না"—

নজরুল এ ক'দিনে সিলেটি ভাষাও কিছুটা রপ্ত করেছেন। সে ভাষাতেই উত্তর দিলেনঃ "খালি খাউকা, খালি কাউকা, আর কত খাইতাম বা, খাইতে খাইতো নু হেষে পেট ফাটি যাইবো গি।"

কথা শেষ করে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ "কি হে জিরাফ, হলো তো? তোর সঠিক সিলেটি ভাষাই হয়েছে?"

আমরা সকলেই সায় দিয়ে বললাম ঃ "ঠিক হয়েছে।"

আশ্চর্য প্রতিভা ছিল এই নজরুলের। এ ক'দিনেই ধরে ফেলেছিলেন সিলেটে 'খ'-এর উচ্চারণ kh নয়, আরবি বা ফার্সি খের মতো।"

নজরুলের এই বিস্ময়কর প্রতিভা এবং স্মরণশক্তি তাঁর জ্ঞানাহরণ এবং অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই নিবন্ধটি ২৪ মে ২০০২ তারিখ শুক্রবার থেকে দৈনিক ইত্তেফাকে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জাতীয় কবি ঃ তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা

।। এক ।।

একজন সাহিত্যিক বা শিল্পীর কাজটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাই, উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে তাঁর জীবনকে সম্যকভাবে জানতে হবে। কেননা, কাব্যে, কথাসাহিত্যে, শিল্পে আমরা যা কিছুর অভিপ্রকাশ দেখি, সেটা প্রথমে ঠাঁই পেয়ে থাকে এর স্রষ্টা কবির, সাহিত্যিকের, শিল্পীর মনে।

অন্যদিকে মানুষ মনে মনে যা ভাবে, যা চিন্তা করে, তার একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই প্রকাশ পায়। আবার দেখি, একটা মানুষ কোন্ কোন্ বিষয়ে গুরুত্ব দেবে বা না দেবে, কোন বিষয়কে কীভাবে দেখবে বা না দেখবে, সেটা নির্ভর করে কোন পরিবেশে বা এনভায়রনমেন্টে তিনি বেড়ে উঠেছেন তার ওপর।

অনুরূপভাবে, কোন কোন বিষয়ে তিনি কি প্রকাশ করবেন বা না করবেন সেটাও সব সময় নির্ভর করে বহুলাংশেই এই এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের ওপর।

মনোবিজ্ঞান বলে, এক একটা মানুষ এক একটা সাইকোফিজিক্যাল অর্গানিজম। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেরই যেমন সাইক বা মন আছে, তেমনি ফিজিক বা শরীর আছে। এই দেহ এবং মনের একটি অর্গানিজম বা সংগঠনই হলো মানুষ। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পের স্রষ্টা যে মানুষ, তার স্বরূপ সম্যকভাবে জানবার জন্য এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ বিষয়টিকে প্রথমে এবং মূলত দেখতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। এর অতিরিক্ত কিছু দেখার এবং দেখানোর থাকলে সেটা আসবে পরে।

মনোবিজ্ঞান বলে, জন্ম মুহূর্ত থেকে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে নানা ধরনের ইন্সটিঙ্কট বা সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যে ভাল এবং মন্দ পরস্পর বিরোধী নানান রকমের ইন্সটিঙ্কট থাকে। এই ইন্সটিঙ্কটগুলোর মধ্যে কোন কোনটি ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ কোন্ কোন্‌টি বিকাশ লাভ করবে এবং কতখানি করবে তা সেই এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, যে এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের মধ্যে তিনি বেড়ে ওঠেন, বিশেষত যে এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের মধ্যে তার শৈশব, বাল্য এবং কৈশোর জীবন কাটে। যে কোন মানুষের মানসিক গঠনটা পরিপূর্ণতা পায় অর্থাৎ পুরোপুরি একটা শেপ পায় তার কৈশোর জীবনের মধ্যে। বিশেষত তার কৈশোরে অর্থাৎ তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে।

এই প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যদি আমরা নজরুল জীবনের স্বরূপ সন্ধান করতে চাই তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে কোন আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর শৈশব, বাল্য এবং কৈশোর জীবন কেটেছে সেই দিকটি।

www.pathagar.com

এরপর নজর দেওয়া দরকার কোন আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় চাওয়া-পাওয়ার কোন আনন্দ-বেদনার মধ্যে, কোন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, কোন সুবিধা-অসুবিধাদির মধ্যে থেকে নজরুল কোন ধরনের অবদান রেখেছেন বা রাখতে পেরেছেন সেই দিকটি।

আমার মনে হয়, একজন কবির, সাহিত্যিকের, সঙ্গীত রচয়িতার, এমনকি, একজন রাজনীতিবিদের জীবনের স্বরূপ সন্ধানের কাজটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় এভাবেই হওয়া উচিত।

।। দুই ।।

আমাদের অধিকাংশেরই আলোচনায় নজরুল প্রসঙ্গে প্রায়শই রবীন্দ্রনাথের কথা আসে।

উভয়েরই জন্ম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। এই জায়গাটায় উভয়ের মধ্যে একটা মিল আছে।

এই জায়গাটিতে আবার অমিলেরও একটা দিক আছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম দিকে, বিশেষত ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, এই প্রথম এক শ' বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে শাসক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই দুটি পরিবারের একটির যেমন উত্থান ঘটে, তেমনি অন্যটির ভাগ্যে জোটে অবিচার ও বঞ্চনাজনিত পতন।

উত্থানের সুযোগ পায় রবীন্দ্রনাথের পরিবার।

পতনের শিকার হয় নজরুলের পরিবার।

পতনের ব্যাপারটি আমি ভাগ্যে জোটার কথা বলেছি এই কারণে যে, ১৭৫৭-য় পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার যে হাত বদল হয়েছিল, তাতে কাজী পরিবারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার এই হাত বদলের মধ্য দিয়ে কার্যত মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন হয়েছিল। যে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সিংহভাগটি সেদিন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে সহযোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, নজরুলের কাজী পরিবার কোনক্রমেই তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অথচ কোম্পানীর শাসনামল থেকেই নজরুলের এই কাজী পরিবারটি আরও সব সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মুসলিম পরিবারের মতো এবং সাধারণভাবে আরও সব মুসলমানদের মতো নানান রকমের বঞ্চনা এবং শোষণের শিকার হয়েছে। বিশেষত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত লর্ড কর্ণওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' যখন দেওয়ানী বিভাগ থেকে মুসলমান বিতাড়ন সম্পূর্ণ করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে উইলিয়ম হান্টার সাহেবও স্বীকার করেছেন যে, যেসব হিন্দু রাজস্ব আদায়ের নিম্নস্তরে অবস্থান করে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো'র ফলে তারা জমির মালিকানা লাভ করে জমিদার হিসেবে ধনী হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে, আর অভিজাত মুসলমান জমিদারী হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। আর ১৮৩৬ সালে অফিস-আদালত থেকে ফার্সি ভাষা পুরোপুরি তুলে দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকচক্র মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিল। সৈন্য বিভাগের উঁচুপদ, দেওয়ানী ও বিচার বিভাগের পদগুলো এবং উঁচু রাজনৈতিক পদগুলোতে মুসলমান নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হান্টার সাহেবের বিবৃতিতেই আছে, বড় বড় পদগুলো ইংরেজ এবং ছোট ছোট পদগুলো হিন্দুরা পূরণ করেছিল।

এই আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেখা যায় যে, জন্ম মুহূর্ত থেকে শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে দু'জন কবি ছিলেন দু'রকম। একেবারে পরস্পর বিপরীত দুই মেরুর।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মেছিলেন তখন তাঁর ঠাকুর পরিবারটি ছিল একটি জমিদার পরিবার।

অন্যদিকে, রবীন্দ্র জন্মের আটত্রিশ বছর পর নজরুল যখন জন্মেছিলেন তখন তাদের কাজী পরিবারটি ছিল কোন এক জমিদারের প্রজা এবং প্রায় আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব, সর্বহারা।

অস্বীকার করতে বা এড়িয়ে যেতে না চাইলে মানুষের অনুভূতির এই বাস্তবতাটা স্বীকার করা দরকার যে, মানুষের জীবনধারাই তার শ্রেণী-চেতনা তৈরি করে। নিজস্ব জীবনধারা থেকে যে শ্রেণী-চেতনা নজরুল পেয়েছিলেন, স্বভাবতই সেই শ্রেণী-চেতনার প্রতিফলন আমরা তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, এমনকি তাঁর জীবনাচরণেও যে পাব সেটাই স্বাভাবিক।

শ্রেণীগত অবস্থান, সময় এবং পরিবেশ পরিস্থিতির ভিন্নতায় মানব প্রকৃতিতেও একটা না একটা নিয়ম কাজ করে। এই বাস্তব সত্যটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং কারো জীবনের স্বরূপ সন্ধান করতে হলে সেটা সব সময় স্মরণও রাখতে হবে।

মৃত্যুর মাস সাতেক আগে ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে শান্তিনিকেতনে লেখা 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের শ্রেণীগত অবস্থান, শ্রেণী-চেতনা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই অপূর্ণতার খেদ থেকে এক জায়গায় তাঁর একটি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আক্ষেপ করে স্বীকারোক্তি করতে পেরেছিলেন ঃ

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই তা সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা প্রসূত যে আভিজাত্য এবং জীবনধারা, যে শ্রেণী-চেতনা,

www.pathagar.com

যে উচ্চবিত্ত মানসিকতা তাঁকে দিয়েছিল সেই গণ্ডিটাকে রবীন্দ্রনাথ কোন উদার মানসিকতাবোধ থেকে না হলেও তাঁর আপন মননশীলতার এবং প্রতিভার ঔদার্যে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

২৫ মে ১৯৯৩ তারিখে নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত "নজরুল জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা ১৪০০ সাল"-এ 'নজরুল ঃ বাম ধারার সমালোচকদের চোখে' শীর্ষক নিবন্ধে আতাউর রহমান ঠিকই বলেছেন ঃ "লেখক যে ধরনেরই হোক, তার চেতনা ও চিন্তায় তার স্বীয় সমাজ ও শ্রেণীর প্রভাব থাকবেই।"

"ঐকতান" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে আক্ষেপ এবং আহবান জানিয়েছেন তার পনেরো বছর আগেই অগ্রহায়ণ ১৩৩২-এ হুগলীতে নজরুল "সর্বহারা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কৃষাণের গান' লিখেছিলেন ঃ

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি— ভাল করেই মরব এবার চল॥
মোদের উঠান ভরা শস্য ছিল হাস্য ভরা দেশ,
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ।
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাতসাগরের জল।"

এর শেষ স্তবকটায় আছে ঃ

"আজ জাগরে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল।"

নারায়ণ চৌধুরী ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এ ঢাকার 'মুক্তধারা' থেকে প্রকাশিত 'নজরুল চর্চা' গ্রন্থে দশম এবং একাদশ পৃষ্ঠায় ঠিকই লিখেছেন ঃ

"১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্বর্তী চুরুলিয়া গ্রামে এক নিঃস্ব দরিদ্র মুসলমান গৃহে যে সন্তানটির জন্ম হলো তিনি কিন্তু সব দিক দিয়েই ছিলেন কবি-বর্ণিত 'মাটির কাছাকাছি' স্তরের মানুষ। একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন 'স্টক্' থেকে আসা ভূমিজ পুরুষ।"

তাঁর উক্তি ঃ

"কাজী নজরুল কি অমনি অমনি 'সর্বহারা' কবিরূপে পরবর্তীকালে নন্দিত হয়েছিলেন? সর্বহারার কুলতিলক কপালে জয়টিকারূপে প'রেই যে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন! সত্য বটে, চুরুলিয়ার কাজী বংশ একদা খুবই সম্ভ্রান্ত ছিলেন; কিন্তু যে সময়ে নজরুল এ বংশে শিশু হয়ে আবির্ভূত হন সেই সময় এই বংশটি আভিজাত্যের পশ্চাৎপট থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে দৈন্যদশার একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। গাঁয়ের আর দশটি চাষী পরিবার থেকে এই পরিবারটিকে

www.pathagar.com

আলাদা করে দেখার আর কোন উপায়ই ছিল না, যে জন্য দেখা যায়, নজরুলের শৈশব ও বাল্যকাল মর্মান্তিক দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল।"

কাজী নজরুল ইসলামের মানসিক গঠনটা কোন প্রতিবেশে পূর্ণ হয় সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

"নজরুল জীবনীর প্রথম পর্বের ছক অনুসরণ করলে দেখা যাবে, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপমান- মনস্তাপের মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রাক্ যৌবন কেটেছে। অপর একাধিক ভাগ্যবান কবির মতো তিনি রূপোর চামচ মুখে নিয়ে তো জন্মানইনি, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কবি যশোপ্রার্থী কিশোর তরুণদের প্রাপ্য শিক্ষাগত সুযোগ কিংবা জীবিকাগত সুবিধা কিছুই তাঁর কপালে জোটেনি তাঁর বেড়ে ওঠার, হয়ে ওঠার বয়সে। নিরবচ্ছিন্ন জীবন সংগ্রামের কঠোর বেদনার ঘায়ে নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাঁকে পদে পদে এগিয়ে চলতে হয়েছে, আর এ সমাজের হাত থেকে জন্ম অবহেলিতের পাওনা তাল তাল অবমাননা ও উপেক্ষা কুড়োতে হয়েছে।"

শৈশবে, বাল্যে এবং কৈশোরে নজরুলের মানসিক গঠনটা ক্রমে সম্পূর্ণতা পায় কেবল মাটির কাছাকাছি থেকে নয়, একেবারে তৃণমূল স্তরে মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয়ে, যথার্থই কৃষাণের জীবনের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার শরীক হয়ে। শৈশব থেকে বাল্য এবং কৈশোরের সময়সীমার মধ্যে একটা ডি-ক্লাসড্ বা সর্বহারা জীবন যাপন থেকে অন্তরায় হিসেবে, প্রতিপক্ষ হিসেবে, শ্রেণীশত্রু হিসেবে তিনি যা কিছু এবং যাদেরকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তার মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর মধ্যে যে জীবনবোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সে-সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর জীবনাচরণে, কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং রাজনীতিতে। এসব কিছুতেই তাঁর অবস্থান ছিল প্রায়শই রবীন্দ্রভাবনার বিপরীত মেরুতে।

নারায়ণ চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এর পর লিখেছেন ঃ

"কিন্তু যেহেতু এই কবি মাটির কাছাকাছি স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, সেই কারণে এই নিদারুণ নিগ্রহ আর ক্লেশ ভোগকালেও তিনি কখনও, কোন অবস্থাতেই জনগণের সঙ্গে সংযোগসূত্র হারাননি, বরং ওই জন্যই আরও বিশেষ করে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছেন। সমাজের অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁর কবিতায় ও গানে গভীর বাস্তবতায় মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে সে শুধু তাঁর জীবনের পশ্চাদভূমিতে তাঁর প্রথম বয়সের এই মর্মঘাতী জীবন সংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতাসমূহের পৃষ্ঠপটটি বিম্বিত ছিল বলে। তাঁর নিজ জীবনের দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি অন্য বহু মানুষের দুঃখের শরিক হয়েছিলেন, তাঁদের হৃদয়-ব্যথার ক্রন্দন তাঁর রচনায় স্বতই মর্মন্তুদ অভিব্যক্তি লাভ করে সার্থক প্রকাশের গৌরব অর্জন করেছে।

সুতরাং এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে নজরুলের বাল্যের দুঃসহ দারিদ্র্য আর তজ্জাত নানাবিধ বিষামৃতময় অভিজ্ঞতা শাপে বর হয়েছিল। এই পৃষ্ঠপটটি যদি তাঁর না থাকত তবে বোধহয় এমন করে তাঁর কবিতায় সম্পূর্ণ নয়া সুর বেজে উঠত না।

www.pathagar.com

এতকাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যের আঙিনায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা প্রসূত অভিজাত চিন্তা-চেতনা ও বুর্জোয়া জীবন যাত্রা সজ্ঞাত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মানবিকতার যে অবিচ্ছেদ্য আধিপত্য ছিল সেই ধারাতেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রবাহ গড়িয়ে চলত, আর নতুন খাতে বওয়া হত না। কিন্তু নজরুল এসে ধারাটি পাল্টে দিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের এ তাবৎ প্রবহমান মধ্যবিত্ত সংস্কারটিকে সজোরে আঘাত করে তাকে ক্ষীণবলই শুধু করলেন না, তার জায়গায় ক্ষেতে-খামারে ও কারখানায় খেটে খাওয়া অযুত গণমানুষের বাণীকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সুখী ও ভোগী শ্রেণীর অলস বিলাসের চাহিদা পূরণের জন্য যে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি, সেই নিছক বিনোদনমূলক ললিত মধুর কাব্য-সাহিত্যের অসার কলকাকলিকে বিদায় দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন জনগণের আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত অগ্নিবীণার বহ্নিমূর্ছনাকে! জনতার রুদ্র উল্লাস তাঁর কম্প্রহস্তে বাঁশির সুরের মতো বেজে না উঠে অসির ধ্বনির মতো ঝনঝনিয়ে উঠল। করাচীর সৈন্য ব্যারাক থেকে ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনের এক হাবিলদার সৈনিক হিসেবে প্রথম দিকে কলকাতার বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে হয়ত তখনও এই তূর্যবীণার সংগ্রামী সুর তেমন করে ফুটে উঠেনি; কিন্তু যুদ্ধফেরত হয়ে কলকাতায় এসে স্থিতিলাভ করার পর ধীরে ধীরে তাঁর কবিতায় এই গণমুখীনতা স্পষ্টই ফুটে উঠতে লাগল।...পরিষ্কার বোঝা গেল, বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কবির আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর সমাজ, জীবন ও মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব-পূর্ব কবির জীবনদৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি নাগরিক মধ্যবিত্তসুলভ নিরাপদ জীবনবৃত্তের আরাম মসৃণ বাঁধা পথে তাঁর কলমকে চালনা না করে তাকে দৌড় করালেন অভিনব দুঃসাহসের অভিযানের পথে, স্থিতাবস্থার সঙ্গে কোন অবস্থাতেই রফা না করে চলার আপসহীন ঊষর রাস্তায়। মানুষের সংসারে বড় ছোট বলে কেউ নেই, জাত-বেজাত বলে কিছু নেই, জাতি-সম্প্রদায়, বর্ণগোত্র ইত্যাদির ভেদগুলো শুধু তার বহিরঙ্গ পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্নমাত্র, আসলে সব মানুষ সমান— এই বোধের বলিষ্ঠ ঘোষণায় নজরুলের কবিতা এক নতুন মাত্রা পেল একটা সচেতন প্রয়াসের আকারে। নজরুল বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী ভাবাদর্শের নান্দী রচনা করলেন এবং বিধিবদ্ধ প্রাণালীতে তাকে তাঁর গানে ও কবিতায় আহবান করে আনলেন।"

নজরুল যে নিখাদ মানবতাবাদী হতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের ও সম্প্রীতির কথা এবং সাম্যবাদের কথা অত্যন্ত আন্তরিক ও বলিষ্ঠভাবে বলতে পেরেছিলেন এবং অকুতোভয়ে মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা, আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করতেন, এসব কিছুর জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতির কাজটা তাঁর কৈশোর জীবনের মধ্যেই হয়েছিল। এমনকি, সঙ্গীতেও পরবর্তী জীবনে তিনি যে বিশাল অবদান রেখেছিলেন সে বিষয়েও প্রস্তুতির কাজটা মোটামুটি তাঁর কৈশোর জীবনেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

সময়টা স্মরণে রেখেই উল্লেখ করছি, ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে শান্তি নিকেতনে পূর্বোক্ত 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছেন ঃ

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

মূলত, শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না, আপন শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে নজরুল সে সবই পেরেছিলেন।

আমাদের সাহিত্য ও সংগীতের আঙিনায় এ রকমই একটা 'ফাঁক' পূরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই আহবানের বছর পনের আগেই ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ তারিখে নজরুল বলিষ্ঠ হাতেই লিখেছিলেন 'শ্রমিকের গান', যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের কথাটা স্পষ্টতই আছে ঃ

"ও রে ধ্বংস-পথের যাত্রী দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি, ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙবো চল্।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি বলে পাহাড় টলে তুষার গ'লে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলেরে।
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধার বিন্দুজল।

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি
কলুর বলদ চক্ষে ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ শিরে দিই তুলি রে।

আজ মানব কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।"

শান্তি নিকেতনে ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে পূর্বোক্ত 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানজাত সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করে লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

উচ্চবিত্তের আভিজাত্য এবং শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে রবীন্দ্রনাথ যেখানে এবং যাদের কাছে পৌঁছতে পারেননি, নজরুল ঠিক সেখান থেকেই সেই তাদের মধ্য থেকেই উঠে এসে সেখানকার কথা, সেই গণমানুষের কথা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উক্ত আহ্বানের বছর পনের আগে ৮ মার্চ ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগরে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'ধীবরদের গান'। শুরু থেকে এর অংশবিশেষ ঃ
"আমরা নিচে প'ড়ে রইব না আর
শোনরে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব সভায় উঠল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে।
আমরা এমনি মড়া কইনে কিছু
মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে।"

সর্বহারাদের জন্য, মেহনতী মানুষের জন্য, গণমানুষের জন্য নজরুল এসব লিখেছিলেন 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত আহ্বান জানানোর প্রায় দেড় দশক

www.pathagar.com

আগে। এমনিতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বয়সে নজরুলের চেয়ে আটত্রিশ বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে ১৮৬১)। নজরুলের জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯)। স্মরণ রাখা দরকার, পঁচিশ বছরে এক প্রজন্ম হলে রবীন্দ্রনাথ বয়সে নজরুলের অন্তত দেড় প্রজন্ম বড় ছিলেন ঠিকই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই আহবান জানানোর মাস সাতেকের মধ্যে ৭ আগস্ট ১৯৪১ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) তারিখে পরলোকগমন করেন এবং এক আকস্মিক আঘাতে অসুস্থ হয়ে নজরুল কর্মক্ষমতা হারিয়েছিলেন ১৯৪২-এর মাঝামাঝি সময়ে। অতএব, নজরুল যে রবীন্দ্রনাথের আহবান শোনার পর সমাজের নিপীড়িত মানুষের সম্পর্কে, শোষিত এবং বঞ্চিত মানুষের সম্পর্কে, মেহনতী মানুষের সম্পর্কে লিখেছিলেন— এমনটা আদৌ নয়। বস্তুত, নজরুল এদের সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করার, এদের নিয়ে সংগঠন করার মোটামুটি দশক দেড়েক পরে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করে কবিতা লিখেছিলেন।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর ধারাপাতটা স্মরণ না রাখলে অনেক সময় ভ্রান্তি বা ভুল সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

এবার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রেখে নজরুল জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটির দিকে নজর দিয়ে তার স্বরূপ সন্ধানের একটা চেষ্টা করা যাক।

।। তিন ।।

নজরুল যে কাগজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, ১৯৪১-এর শেষভাগে ২০ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখে প্রকাশিত সেই তৃতীয় পর্যায়ের "দৈনিক নবযুগ"-এ কর্মরত অবস্থায় এক আকস্মিক আঘাতে কবি ১৯৪২-এর মাঝামাঝি চিরতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে গিয়ে এই কাগজের ফাইল ঘেঁটে নজরুলের এমন কোন লেখা আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না যেখানে এক বা একাধিক জায়গায় তিনি আল্লাহর কথা স্মরণ করেননি। এই দৈনিক 'নবযুগ'-এ তিনি গণমানুষের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার অনুকূলে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যেন দু'হাতে লিখেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের এই দৈনিক 'নবযুগ'-এ ৯ মার্চ ১৯৪২ তারিখে আত্মজৈবনিক "চির-নির্ভয়" কবিতায় তিনি তাঁর জন্মকাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"অবিশ্বাসীরা শোন শোন সবে জন্মকাহিনী মোর,
আমার জন্মক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহদ্বার,
ইস্রাফিলের বজ্র বিষাণ বেজেছিল বারবার।
আল্লাহু-আকবার ধ্বনি শুনি প্রথম জনমি আমি,
আল্লাহ নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি।
সেই পবিত্র ধ্বনি রণরণি উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।

www.pathagar.com

জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে এনে গৃহ হ'তে
লইয়া ফিরিছে কত অনন্ত কত অজানা অদেখা পথে।

কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারে বারে
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লাহর অহেতুক কৃপা-রহমত।

নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম সৈনিক।"

এই কবিতাটির শুরুতে প্রথম দু'টি পঙক্তিতে কবি লিখেছিলেন ঃ
'আমি পেয়ে আল্লাহর সাহায্য হইয়াছি চির নির্ভয়,
আল্লাহ যাহার সহায় তাহার কোন ভয় নাহি রয়'।

এই কবিতাটির মাঝামাঝি এক জায়গায় আছে ঃ
"যে নদীতে স্রোত প্রবাহ মরেনি, সাগরের তৃষ্ণা যার,
কোনো মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্র শোক!
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
....
যে যায় আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।

আত্মা আমার চিরদিন কেঁদে কয়— 'দেরী হয়ে গেল,
পুণ্যের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন যে হয়ে এল।"

এরপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ
"মোর আরাধ্য মোর চির চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান?"

www.pathagar.com

আত্মজৈবনিক এই কবিতাটির শেষের দিকে আছে ঃ

"আমি আল্লাহর সৈনিক, মোর কোন বাধা-ভয় নাই,
তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
' জেহাদ', ' জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ', মোর গান গাওয়া।
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির উন্মনা"।

কাজী নজরুল ইসলাম যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিনটি ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে ১৮৯৯) বুধবার এম্পেশ বার্থ ডে। আর 'চির-নির্ভর' কবিতাটি যেদিন প্রকাশিত হয়েছিল এর আগের দিন ৮ মার্চ ১৯৪২ তারিখে জাপানীরা রেঙ্গুন আক্রমণ করে। এক আকস্মিক আঘাতে চিরতরে অসুস্থ হয়ে পড়ার কাছাকাছি সময়ে লেখা নজরুলের এই আত্মজৈবনিক কবিতাটি।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সঠিক উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ হ'লে এই আত্মজৈবনিক কবিতাটি স্মরণ রাখা একান্তই দরকার। নজরুল সব সময়ই বিশ্বাস করেছেন যে, সার্বভৌম শক্তি হিসাবে তাঁর স্রষ্টা আল্লাহই তাঁকে সব কিছুতে পরিচালিত করেছেন। তিনি যা করেছেন সেসব কিছুই আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়ে করিয়েছেন। নজরুলের বিস্ময়কর সৃষ্টিও কিন্তু সেই সাক্ষ্যই দেয়।

আত্মজৈবনিক 'চির-নির্ভয়' কবিতায় কবি আপন স্বরূপের যে পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে দেখা যায় যে, ১. কবি কেবল পুরোপুরি আস্তিকই নন, তৌহীদবাদী ছিলেন। অর্থাৎ সার্বভৌম স্রষ্টার একাত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

দুই, তৌহিদবাদী অর্থাৎ আল্লাহর একক সার্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব মানুষকে আল্লাহর সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে। নজরুল যে যথার্থই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান, উপমহাদেশের এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের জন্য সর্বতোভাবে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সে বিষয়ে বিশ্বাসের, প্রেরণার উৎসমুখটা ছিল ঠিক ওখানেই, অর্থাৎ এই তৌহীদবাদেই। তৌহীদবাদী মানুষ স্বীকার করে যে, মানুষের কাছে আল্লাহর যেমন হক আছে; অনুরূপভাবে ঠিক তেমনি মানুষের কাছে মানুষেরও একটা হক আছে। আল্লাহর হক না মানলে আল্লাহ তা হয়তো ক্ষমা করতেও পারেন, কিন্তু মানুষের হক, মানুষের অধিকার না মানলে বা কোন মানুষকে তার হক থেকে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে বা কোন রকম নিপীড়ন চালালে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না উক্ত মজলুম মানুষটি ক্ষমা করেন। সামাজিক সমস্ত দায়-দায়িত্বকে নজরুল এই সদর্থক এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছেন। মানুষের প্রতি নজরুলের ভালবাসা, নজরুলের মানবতাবাদ এবং সাম্যবাদের উৎসমুখটাও কিন্তু এই তৌহীদবাদ অর্থাৎ সার্বভৌম

www.pathagar.com

স্রষ্টার একত্ববাদ বা এক আল্লাহর সার্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাস। নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কিছুর মধ্যে আবার নজরুলের সংবেদনশীল মনের কাজও আছে। কিন্তু নাস্তিক্য কখনো প্রকৃত সংবেদনশীল মনকে সংরক্ষণ করতে পারে না।

এই তৌহীদবাদ প্রসঙ্গেই স্মর্তব্য যে, নজরুলের কাব্য, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে স্পষ্টতই শ্রেণী সংগ্রামের আহবান থাকলেও পার্টির সার্বভৌমত্বের ধারণা বা কোন পার্টিকে সার্বভৌম জ্ঞান করার ব্যাপারটা সেখানে নেই। পার্টির সার্বভৌমত্বের অর্থ যে এক সময় পার্টির দু-একজন সর্বময় কর্তার স্বেচ্ছাচারিতায়ও পর্যবসিত হতে পারে সে প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো দেশে পেয়েছি। আর দীর্ঘ দিনের নাস্তিক্যের চর্চা যে সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যেও কোনো রকম মানবিকতাকে লালন করে না সে প্রমাণ আজও সার্বরা বসনিয়ায় এবং রুশরা চেচনিয়ায় দিচ্ছে।

নজরুলের জীবন ও সৃষ্টি সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মকে বরং নজরুল সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ, বঞ্চনা, অমানবিকতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন।

নজরুলের এই বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আতাউর রহমান সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন। ২৫ মে ১৯৯৩ তারিখে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'নজরুল জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা ১৪০০ সাল'-এ তিনি লিখেছেন ঃ

"ডান-বাম-মধ্য সবাই চেয়েছেন নজরুলকে তাদের মনের মতো করে। নজরুল তাঁর পাঠক ও সমঝদারদের এই মনোভাব লক্ষ্য করেই লিখেছেন 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি। কোন বিশেষ দেশ, সমাজ, নীতি, আদর্শ বা গোষ্ঠীর বাঁধা কবি হলে নজরুল ইসলাম হারিয়ে ফেলতেন স্বাধীন চিন্তা— সার্বজনীনতা।"

ধর্মকে নজরুল কীভাবে দেখতে চেয়েছেন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট তুলে ধরার জন্য ২১ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখে দৈনিক 'নবযুগ'-এ তাঁর "ধর্ম ও কর্ম" শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধটির দিকে নজর দেব। এতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্ত বিষয়ে নেতৃত্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য একটি মৌলিক উপাদানের অনটনজনিত সংকটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। জিহাদের বিকল্প চিন্তা বুকে গচ্ছিত রেখে তৌহীদবাদের ভিত্তিতে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য স্থাপন মারফত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনেক গভীর সংকটের সুরাহা প্রত্যাশা করা হয়েছে এভাবে ঃ

"যে স্বধর্মে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কোন অধিকার নেই। আজ যারা দেশের কর্মী বলে খ্যাত, তাদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেতে লাঙল চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে? যার নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তা লাভ করেননি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন শক্তিতে দৈত্য, অসুর,

www.pathagar.com

দানবকে সংহার করবেন? ধর্মভাব মানে এ নয় যে, শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে, সংস্কারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন, কর্ম, সংস্কার ও মায়ার স্রষ্টাকে তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম যার কোন শরীক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তার সৃষ্টির বিচার করবে কে?

আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বাতীত হলে— লোভ, অহঙ্কার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তার অটল ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ ও ভাল দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবি অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি, দুই-ই তখন তার সমান প্রিয় হয়ে ওঠে।"

নজরে পড়া খুব কঠিন নয় যে, নজরুলের সঠিক পরিচয় আছে এখানে। কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যেমন, রাজনীতিসহ কর্মজীবন তাঁর ধর্মজীবনের সাথে অচ্ছেদ্য।

আতাউর রহমান ২৫ মে ১৯৯৩ তারিখে নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত "নজরুল জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা ১৪০০ সাল"-এর পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধে রবীন্দ্র দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্র কুমার গুপ্ত লিখেছেন ঃ

"উপনিষদের মায়াবাদ হল রবীন্দ্র দর্শনের সারমর্ম। এই দর্শনই শ্রেণী সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। মজুর শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রাম ভুলিয়ে দেবার মতো এত বড় শক্তিশালী হাতিয়ার ধনিক শ্রেণীও আবিষ্কার করতে পারেনি।" অন্যদিকে লক্ষ্য করি, নজরুল বলছেন ঃ "সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।"

১৯৪০-এর নভেম্বরের প্রথম ভাগে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে নজরুল বলেছেন ঃ

"সকল ঐশ্বর্য, সকল বিভূতি আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে; কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবী আছে— এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি।"

২. আত্মজৈবনিক 'চির-নির্ভয়' কবিতার পূর্বোদ্ধৃত অংশে নজরুল নিজেকে আল্লাহর চির নির্ভীক, আজন্ম সৈনিক বলে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

৩. উল্লেখ করেছেন, দারিদ্র্য এবং হরেক রকমের অভাব যন্ত্রণা তিনি যেমন পেয়েছেন, তেমনি আল্লাহর অহেতুক কৃপাও লাভ করেছেন।

৪. উল্লেখ করেছেন, ' জেহাদ','বিপ্লব', 'বিদ্রোহ', তাঁর ইসলামী জীবনবোধ সম্পৃক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত। কবি যে আট বছর সমাজের নানান অংশের মেহনতী মানুষদের সংগঠিত করেছিলেন সে সময় আনওয়ার হোসেনকে এক চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের বাঙালি মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে করে যাও— তার জবাবদিহি করতে হয়না এ সমাজে, কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ত তলব করা হয়। অথচ কুরআনে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।"

আর 'বিদ্রোহ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি, ১৯৪১-এর জানুয়ারীর প্রথম ভাগে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে কবি বলেছিলেন ঃ

"দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দিইনি। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির'— এ গান আমি আমার এ শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি।"

আর 'বিপ্লব' প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল তাঁর কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত নয়, কবি তিনের দশকে আটটি বছর তামাম বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সর্বহারা এবং মেহনতী মানুষদেরকে এই একই লক্ষ্যে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

৫. উল্লেখ করেছেন, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত শক্তির অসি সঞ্চালন করেই তাঁর চলার পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করেন, সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করেন। প্রথম দিক থেকেই এই কথাটা নজরুলের আরও অনেক রচনাতেই বলিষ্ঠভাবেই বিবৃত হয়েছে। রাজবন্দীর জবানবন্দিতেও কথাটা আছে।

৬. তাঁর ব্যক্তি স্বরূপের মধ্যে তীব্র বেগে এগিয়ে চলার, আর পিছন পানে না তাকিয়ে ছুটে চলার গতির একটা তাগিদ, একটা জীবনী শক্তি আছে। বোঝা যায়, সব কিছুতেই একটা তীব্র, প্রবল গতি তিনি পছন্দ করতেন। স্থবিরতা, মন্থরতা তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত ছিল না। আর এ রকমটা না হলে দারিদ্র্য এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে এগিয়ে চলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

৭. প্রবল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্যেও সুবাস এবং সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো একটা মানসিকতা তাঁর ছিল। তাঁর অন্তর্জগতে এমন একটা জিনিস ছিল যা তাঁকে এক মুহূর্তে সাংসারিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের ওপর এক শাশ্বত আনন্দ জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারত, তাঁর মধ্যে অনন্তমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত করে দিতে পারত, বিশ্বের সব সৃষ্ট পদার্থের সাথে একাত্ম অনুভব করার ক্ষমতা দিত, তাঁর মনোযোগ, আগ্রহ এবং আকর্ষণ চারদিকে প্রসারিত করে দিয়ে তাঁকে আনন্দ দিত। সৌন্দর্য, সৌরভ এবং অন্যান্য সব রকমের গুণাবলিতে মুগ্ধ হওয়ার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর।

www.pathagar.com

১৯৪১'র জানুয়ারীর প্রথম ভাগে, কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে কবি বলেছিলেন ঃ

"এ দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম।"

পরে এ প্রসঙ্গে নিজের জীবনের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন ঃ

"আমার ছেলে মরেছে। আমার মন তীব্র পুত্র-শোকে যখন ভেঙে পড়েছে, ঠিক সেদিনই সে সময়ে আমার বাড়িতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে— এই হল পূর্ণ জীবন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে।"

৮. তিনি তাঁর চলার পথে বরাবরই অগ্রসর হয়েছেন অকুতোভয়ে, কেবলমাত্র তাঁর চলার পথটি ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। মাথা নত করেছেন কেবল সার্বভৌম শক্তির আধার সেই স্রষ্টার কাছে। অন্য কোথাও নয়।

৯. এটা তাঁর বিশ্বাসের অন্তর্গত ছিল যে, চলার পথে ছুটে চলার এই ঝড়ের গতি, এই তুফানের বেগটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জন্মক্ষণ থেকেই। পিতৃ বিয়োগের পর তাঁর উপযুক্ত অভিভাবকহীন জীবন, তাঁর আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা এবং আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, এই সব কিছুরই অনিশ্চয়তা তাঁর এই গতিময় জীবনের পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

১৯৪১'র জানুয়ারীর শেষ ভাগে কলকাতার উক্ত ঈদ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে কবি বলেছিলেন ঃ

"দুঃখকে, বিপদকে দেখে আমি ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।"

এই গতির ব্যাপারটা ১৯২৯-এ "উপাসনা" পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে জুলাই ১৯২৯-এ কবিতা ও গানের সংকলন "চক্রবাক" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "পথচারী" কবিতাতেও আছে। কবিতাটির প্রথম স্তবক ঃ

"কে জানে কোথায় চলিয়াছি, ভাই, মুসাফির পথচারী,
দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের মাঝে আমি স্রোত বারি।
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম শিখর হতে
বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আন পথে।
নিজ বাস হল চির পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে— ফিরি নাই আর ঘরে।
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে।"

www.pathagar.com

।। চার ।।

নজরুল জীবনের স্বরূপ সন্ধান প্রসঙ্গে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর জীবনের প্রতিবেশের যেসব উপাদান তাঁর মানসিকতা গঠনে কাজ করেছিল সেগুলোর কোন কোনটির দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে উপাদানগুলো স্রেফ উল্লেখ করে যাচ্ছি ঃ

এক. এক গৌরবজনক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক পরিবারে নজরুলের জন্ম।

দুই. নজরুল যখন জন্মেছিলেন তখন তাঁদের পরিবারে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ছিল।

তিন. নজরুল যখন জন্মেছিলেন তখন তাঁদের পরিবার ন্যূনতম আর্থিক সচ্ছলতাটুকুও হারাতে বসেছিল। সে সময় পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠছিল।

চার. পারিবারিক পরিবেশে এবং মক্তবে নজরুল শৈশবে ও বাল্যে ধর্মীয় ভাষা আরবি, মুসলিম শাসনামলের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সী, বিশেষত উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম ভাষা উর্দু, তাঁর সময়কার শাসনামলের রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলা, এই পাঁচটি ভাষায় কিছু কিছু তালিম নিয়েছিলেন। নজরুল জন্মশত বার্ষিকীর সময় নজরুল একাডেমী পত্রিকায় কবি পরিবারের আত্মীয় ডি. এফ. আহমদ লিখেছেন যে, কবি পরিবারের অন্দর মহলের ভাষা ছিল উর্দু এবং বাড়ির অন্দর মহলে উর্দু চর্চার ব্যাপারটা বয়স্ক মহিলারা খুব গুরুত্ব দিতেন। তাঁর আব্বা কাজী ফকির আহমদের হাতের লেখা বেশ গোটাগোটা এবং পরিচ্ছন্ন ছিল। শৈশবে এবং বাল্যে হাতের লেখাটা নজরুল তাঁর আব্বার কাছেই শিখেছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে তাঁর আব্বা খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন। এর প্রভাবও নজরুলের ওপর পড়েছিল।

পাঁচ. কবিত্ব শক্তির স্ফুরণও তাঁর এ সময়ই হয় চাচাত চাচা মুন্সি বজলে করিমের সান্নিধ্যে।

ছয়. সঙ্গীত শিক্ষায় এবং সঙ্গীত রচনায় তালিমও পান চাচাত চাচা কবি মুন্সি বজলে করিমের কাছে।

সাত. বালক নজরুল যখন গ্রামের মক্তবে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন ২০ মার্চ ১৯০৮ তারিখ শুক্রবার তিনি পিতৃহারা হলেন। এরপর তাঁর পরিবার চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। নজরুলের মা জাহেদা খাতুন তাঁর সন্তানদের নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটান।

আট. নজরুলের বড় ভাই কাজী সাহেবজান অগত্যা অতি অল্প বয়সে অতি কম বেতনে রাণীগঞ্জের কয়লা খনিতে চাকরি নিলেন।

নয়. ১৯০৯-এ (বাংলা ১৩১৬) গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই শিক্ষকতার কাজ নেন নজরুল।

www.pathagar.com

দশ. পিতার মৃত্যুর পর দরবেশ পীর হাজী পাহলোয়ানের মাজারের খাদেমের দায়িত্ব এবং গ্রামের মসজিদে মোয়াজ্জীনের ও ইমামতির দায়িত্বও নিলেন এবং কখনও কখনও কোন কোন গ্রামে কোন কোন বাড়িতে মিলাদ পাঠ করতেও যান।

এগার. চরম আর্থিক অনটনের কারণে ১৯১০-এ (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) আসানসোলে রুটির দোকানে বয়গিরির চাকরি নেন। এভাবে বাইরে পা বাড়ালেন বালক নজরুল। তাঁর ছুটে চলা শুরু হল। স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত এক নিঃসঙ্গ, নিরাপত্তাহীন, অনিশ্চিত জীবন।

বার. এরপর পরানুগ্রহে পড়াশুনা করতে যান ময়মনসিংহে দরিরামপুর হাই স্কুলে, বর্ধমানে মাথরুণ নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউশনে, বর্ধমান শহরে অ্যালবার্ট ভিক্টর ইনস্টিটিউশন (নিউ স্কুল)-এ এবং সব শেষে বর্ধমানের রাণীগঞ্জে শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শেষোক্ত এই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি যখন করাচী যান, তখন তাঁর স্বগ্রাম চুরুলিয়া বন্যার পানিতে ভাসছে। আর এরই অব্যবহিত পর কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া মহামারির আকারে দেখা দেয়।

তের. ইতোমধ্যে মাথরুণ নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউশনে তাঁর পড়াশুনার বিরতি ঘটে, যখন ১৯১৩'র জুলাই মাসে তাঁর স্বগ্রাম বন্যা এবং তজ্জনিত ম্যালেরিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার কবলে পড়ে এবং এর জের ১৯১৩'র ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে।

চৌদ্দ, ১৯১৩'র জুলাইয়ে তাঁর স্বগ্রাম চুরুলিয়া বন্যাকবলিত হলে তিনি এ সময় বর্ধমানের প্রসাদপুরে গার্ড সাহেবের বাসায় বয়গিরির চাকরি নিয়েছিলেন।

পনের, ইতোমধ্যে গার্ড সাহেবের বাসায় বয়গিরির চাকরি নেয়ার আগ থেকে লেটোর দলে সঙ্গীত রচনা ও পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছেন।

ষোল. চুরুলিয়ার পর কবি সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রসাদপুরে গার্ড সাহেবের বাসায় এবং শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পড়াশুনা করার সময়।

সতের. শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পড়ার সময় নজরুল ইংরেজি ছাড়াও সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা চর্চার সুযোগও মোটামুটি পেয়েছিলেন।

আঠার. শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ হয় এবং এ সময় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার কৌশলও রপ্ত করেন।

উনিশ. এই শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমের ঘটনাটাও ঘটে।

বিশ. এ সময় কবি প্রেমের গান, ইংরেজি গান, ফার্সি, বাংলা রুবাই গান, সংবেদনশীল মনের পরিচয় জ্ঞাপক কিছু কবিতা এবং ছোটগল্পও লেখেন।

একুশ. লেটোর দলের জন্য নজরুল যেসব গান, নাটিকা ইত্যাদি লেখেন, সেগুলো লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং হিন্দু পুরাণাদির সঙ্গে পরিচয় তাঁর শৈশব, বাল্য ও কৈশোর জীবনের সময়সীমার মধ্যেই ঘটেছিল। স্কুল জীবনে প্রিয় হিন্দু শিক্ষক পেয়েছেন, প্রিয় হিন্দু বন্ধু পেয়েছেন।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য যে, এ সব কিছুই তাঁর মানসিকতা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমরা নজরুলের পরবর্তী জীবনে এ সব কিছুরই প্রসার, ব্যাপ্তি এবং প্রতিফলন লক্ষ্য করব। এমনকি দারিদ্র্যজনিত অজস্র অবমাননার মতো কোন কোন তিক্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াও।

নজরুল তাঁর শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের এক বড় অংশের দিনগুলো ইতোমধ্যেই যেভাবে কাটিয়ে এলেন তা তাঁর পরবর্তী জীবনের কাব্য সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সদর্থক অবদান রাখার সহায়ক হয়েছিল। কৈশোর জীবনের সময়সীমার মধ্যে তাঁর যে রুচি এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছিল সে সব কিছুই বাংলা কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতে ইতোপূর্বে অনুসৃত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শকে প্রবল আঘাত হেনে এই আঙিনায় নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা দেয়ার মতো মনোভঙ্গি এবং মানসিক দৃঢ়তাও তাঁকে দিয়েছিল।

কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীতের আঙিনায় তখন চলছিল উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শাসন। এখানে তখন ছিল কেবল তাদেরই আধিপত্য। সেখানে বিত্তহীনদের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, সর্বহারাদের কথা নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা দেয়াটা ছিল কেবল দুরূহ নয়, প্রায় অসম্ভব কাজ। নজরুল তাঁর আপন প্রতিভা, প্রাণৈশ্বর্য এবং ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর চারিত্রিক ঋজুতার বলে এই অভাবিত কাজটি করতে পেরেছিলেন।

কবির এবং সাহিত্য ও সঙ্গীত রচয়িতার জীবন ধারা আলাদা হলে তাদের সৃষ্টির মর্মবস্তুও যে ভিন্নরকম হবে, এ এক বৈজ্ঞানিক সত্য। কোথাও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন উপায় যে নেই, সেটাও ঠিকই। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে অবাক বিস্ময়ে ভাবার মতো আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় এবং সেটা এই যে, বিশেষত বাল্য-কৈশোরের প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে, তীব্র বৈরী পরিস্থিতিতে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত চর্চায় তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন কীভাবে? যে বাল্য এবং কৈশোরে জীবিকার সঙ্গে পড়াশুনার সঙ্গতি বিধান করতে গিয়ে পিতৃহীন নজরুলকে এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে ছুটে বেড়াতে হয়েছে, কখনও রুটির দোকানে এবং কখনও পরের বাড়িতে বয়গিরিও করতে হয়েছে, লেটোর দলে গান-নাটিকা রচনা ও পরিচালনা করতে হয়েছে, সে বয়সে বিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পিতা ও দাদাদের অঢেল স্নেহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানোর জন্য পাঁচজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, সে বয়সে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত ধর্ম সঙ্গীত শুনিয়ে তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অপরিমেয় উৎসাহ ও প্রেরণার নিদর্শন হিসেবে তখনি পাঁচ শ' টাকার চেক পেয়েছিলেন, অস্ফুট কবিকল্পনা সম্বলিত "কবি কাহিনী" তাঁর দাদাদের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা "ভারতী"তে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পরে সেটা অনেক গুণগ্রাহীর অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাকারে ছাপাতেও পেরেছিলেন, যেমন আরও অনেক গ্রন্থ আত্মীয়-পরিজনদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

বাল্য ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপন ছিল অপরিমিত পারিবারিক স্নেহ,

www.pathagar.com

ভালবাসা, বিত্ত সাচ্ছল্য এবং প্রভূত শিক্ষা সুবিধাদির মধ্যে। শরীর-স্বাস্থ্য গঠনের অঢেল আয়োজনও তাঁর জন্য ছিল।

অন্যদিকে, বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক প্রস্তুতি নেয়ার এবং মানসিকতা গঠনের মূল সময় যেটি, সেই বাল্য ও কৈশোরে নজরুল কার্যত পুরোপুরিই ছিলেন স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত, আর্থিক দিক দিয়ে পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন এবং শিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চা বিষয়েও অনিশ্চয়তা-কবলিত। নজরুল মানসের স্বরূপ সন্ধান যদি আমরা যথার্থই করতে চাই, যদি তাঁর জীবন ও সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে তিনি কীভাবে জীবন ধারণ করেছেন, কী রকম প্রতিকূল, বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে থেকে, এবং বিশেষত অভিভাবকহীন অবস্থায় আর্থিক এবং শিক্ষা সুবিধাদির বিষয়ে ও সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে কী তীব্র জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, সেই ছবিটাও নজরুল জীবনের স্বরূপটা জানতে হলে আমাদের ভালোমতো স্মরণ রাখতে হবে। কেননা, পরবর্তীকালে কেবল তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং রাজনীতিতে কেবল নয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর জীবনাচরণেও এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ যাঁকে অপরিসীম প্রতিভা এবং প্রাণশক্তি দেন, তাঁকে বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতাও দেন। কৈশোর জীবনের সময়সীমার মধ্যেই নজরুল স্থির করে নিয়েছিলেন, তাঁর অবদান রাখার আসল ক্ষেত্রটি কোথায়। তাই দেখি সাহিত্য, সঙ্গীত এবং রাজনীতি চর্চা তিনি সেনা নিবাসে কিংবা সেনা ছাউনিতে থেকেও করেছেন। খোঁজ-খবর নিয়েছেন গণমানুষের জন্য সুদূর রাশিয়াতেও সমাজ বদলের কোন্ কাজটি হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। সে বার্তা তিনি আবার তাঁর সাহিত্যেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনটিও তিনি স্মরণ রেখেছিলেন। তাই পাঞ্জাবী মওলবীর কাছে সেনাবাহিনীতে থাকতেও মূল ফার্সিতে হাফিজ পড়েছেন। করাচীর সেনানিবাসে ঠিকানা দিয়ে কলকাতার নানা সাময়িক পত্রের গ্রাহক হয়েছেন এবং এই সব সাময়িক পত্রে গল্প-কবিতাও পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট গুণীজনদের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফৎ যোগাযোগও গড়ে তুলেছেন।

বিধাতা যাঁকে প্রতিভা দেন, তাঁকে তা প্রকাশ করার পথ খুঁজে নেয়ার মানসিকতা ও প্রাণশক্তিও দেন।

সেনাবাহিনীতে থাকতেও ওস্তাদের খোঁজ নিয়ে তাঁর কাছে নজরুল পুরোদস্তুর সঙ্গীতে তালিম নিয়েছেন। সেনাবাহিনীতে থাকতে লেখা তাঁর "ব্যথার দান"-এ দেখছি ভৈরবী রাগিণীর কড়ি মধ্যমের কথা, দীপক রাগিণীতে জ্বালিয়ে দেয়ার কথা, স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের কথা, বিদেশী শ্রান্ত 'ওয়ালট্জ' রাগণীর আর্ত সুরের কথা, কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাঁদ প্রেমে আবিষ্ট প্রেয়সীর সমস্ত বেদনা মূর্তি ধরে কীভাবে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যায় তার কথা, তরুণী কণ্ঠের উর্দু গানের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসার কথা এবং মল্লারের তীব্র গোঙানি কীভাবে

www.pathagar.com

বিরহ ব্যথা জাগায় সে কথা, পূরবী কীভাবে বিরহ-কান্না কেঁদে যায় সে কথা, নিশি-ভোরের টোড়ি রাগিণীর কথা, ভৈরবী মীড় কীভাবে মোচড় খেয়ে ওঠে সে কথা, চাঁদনী রাতে চারিধারে যখন জ্যোৎস্না ঝরে, তখন একলা ঘরে প্রিয়তমার সমগ্র বক্তব্য ব্যেপে শাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না কীভাবে জেগে ওঠে তার কথা, পূরবীর মূর্ছনার কথা।

"রিক্তের বেদন"-এ দেখছি ওয়াজিরস্থানে খাঁ সাহেবের কাছে গান-বাজনা শেখার কথা আছে। তাঁর এই গ্রন্থে টোড়ি রাগিণীর কথা এবং পাকা তবলচির মতো সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাওয়ার কথা, বেদনাতুর পিলু-বারোয়াঁ রাগিণীর ক্লান্ত কান্নার কথা, আনন্দ-ভৈরবী আলাপ, তানপুরায় শ্রী রাগ ভাঁজা, সুর-বাহারের তারগুলোতে অত্যাচারীর মতো হাত চালানোর কথা আছে। ওস্তাদজী যে গম্ভীর কণ্ঠে বাগেশ্রী রাগিণীটা আলাপ করতে বলেছিলেন সেসব কথাও আছে।

তাঁর "ব্যথার দান", "বাঁধন হারা", "রিক্তের বেদন" সেনাবাহিনীতে থাকতেই, লেখা। এই কবি যে পরে ১৯৩১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের সুরভাণ্ডারীর দায়িত্বভার নেবেন তার সমস্ত পরিচয়ই উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থে রয়েছে। সে যা-ই হোক, এই তিনটি গ্রন্থেই সব কিছু ছাপিয়ে বেজেছে বিরহের হাহাকার। এই গ্রন্থ তিনটিতে তাঁর স্বপ্ন-নায়িকার কথা আছে। এই অতৃপ্ত প্রেমের পিপাসা পরবর্তীকালে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর রিহার্সাল রুমে তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকা 'সাত সাগরের জল'ও মেটাতে পারেনি। কবির ব্যাগ বওয়া অসূয়াপ্রবণ এক-আধজন এ বিষয়ে যে কেবল ভুল করেছিলেন সেটা বোঝা যায়। তারা যদি কবির সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিককার এই তিনটি গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন তাহলে নজরুল-জীবনের প্রেমানুভূতির স্বরূপটুকু অন্তত উপলব্ধি করতে পারতেন। বুঝতেন, ওটা তাঁর কাছে কোন দেহবাদী ব্যাপার-স্যাপার নয়।

"ব্যথার দান"-এ কবি প্রেমের 'অন্তর্দৃষ্টি' এবং 'অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির' কথা লিখেছেন। শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল জীবনে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে শরিক হওয়ার যত সংকল্পই নিয়ে থাকুন না কেন তাঁর সেনাবাহিনীতে যাওয়ার অন্যতম এবং আশু উদ্দেশ্য ছিল মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিরহ যন্ত্রণা ভোলার তাগিদ। মেসোপটেমিয়ার কথাটা অবশ্য আছে তাঁর 'বাঁধন হারা'য়। আর মাঝখানের গ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'-এ আছে তাঁর স্বপ্ন-নায়িকার কথা। এই গ্রন্থত্রয়ে স্নেহ-ভালোবাসা বঞ্চিত, নিঃসঙ্গ নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায়।

"বাঁধন হারা"য় নজরুল তাঁর রক্তের পরিচয়টাও দিয়েছেন এবং তা এভাবে ঃ

'এটা ভুলিসনে যেন রেবা যে, এ ছেলে বাঙলাতে জন্ম নিলেও বেদুঈনের দুরন্ত মুক্তি পাগলামি, আরবিদের মস্ত গোর্দা, আর তুর্কিদের রক্ত-তৃষ্ণা ভীম স্রোতবেগের মতো ছুটছে এর ধমনীতে ধমনীতে। অতএব, এসব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আদত সত্য কোনখানে সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে।"

নজরুলের পূর্ব পুরুষ যে বাগদাদ থেকে বিহারে এবং বিহার হয়ে এক সময় বাংলা মুলকে এসেছিলেন সেই ইঙ্গিতটাই আছে এখানে।

www.pathagar.com

।। পাঁচ ।।

কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউট হল-এ ১৯৪১-এর ৫ ও ৬ এপ্রিল দু'দিনব্যাপী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উৎসবের উদ্বোধনী দিনে সভাপতির অভিভাষণে নজরুল ইসলাম বলেছিলেন ঃ

"আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম; সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিযানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।"

নজরুল জীবনে এমনই সর্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ যে প্রেম, সেটার স্বরূপ কী তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে গিয়ে কবি-সুহৃদ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর "জ্যৈষ্ঠর ঝড়" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

" জ্যৈষ্ঠ মাসের সমগ্র রূপটি নজরুলের মধ্যে সংহত। জ্যৈষ্ঠের রূপ শুধু রৌদ্র দীপ্তিতেই নেই; তার আরেক রূপ, প্রগাঢ় রসপূর্ণতায়। জ্যৈষ্ঠের ফল রসে-বর্ণে ভরে ওঠে। যা রৌদ্র তা-ই রসঋদ্ধ। নজরুল তাই রুদ্র হলেও রসবন্ত। সে একটা দীপ্তদৃপ্ত আনন্দের অনিরুদ্ধ ফোয়ারা।

কিন্তু শত ঝড় উঠলেও আকাশ কিছুতেই মুছে যায় না। আকাশের সেই শান্ত স্থিতি শাশ্বতই থেকে যায়। তেমনি নজরুলের সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে একটি গভীর শান্তি আছে, বিষাদ আছে যার জন্ম প্রেমে। সেটিই নজরুলের সমস্ত দহন দীপ্তির উৎসমুখ। যে প্রদীপের শিখায় দাবানল জ্বলছে, সে প্রদীপটি আসলে গৃহকোণের স্নিগ্ধ প্রদীপ, হয়তো বা দেবমঞ্চের বাতি। তার শিখায় বিদ্রোহ, কিন্তু তার তেলে প্রেম, করুণা, ভক্তি। বিদ্রোহী নজরুলকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রেমিক নজরুল, মানব-প্রেমিক নজরুল, আর এই মানব-প্রেম তাঁকে নিয়ে গেছে ঈশ্বর-প্রেমে। সমস্ত সন্ধান নিয়ে গেছে সমর্পণে। সমস্ত ক্রন্দন নিয়ে গেছে অতল-অগাধ অকূল স্তব্ধতায়।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে নজরুল জীবনের প্রেমের স্বরূপের এই বিশ্লেষণ কেবল অপরূপ নয়, অত্যন্ত সঠিক।

নজরুল যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন, একটা পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন, তার ভিত্তিভূমিটাও এই প্রেম।

প্রকৃত মানবিক গুণসম্পন্ন, সংবেদনশীল মনের মানুষ ছিলেন বলেই নজরুল-জীবনে প্রেম ছিল অপরিসীম গভীর এবং এর কোনো কূলও ছিল না, কোনো কিনারাও ছিল না। এই অনুভূতি থেকেই তিনি এক সময় বারাঙ্গনাদের প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।

প্রেম হল অন্তরের প্রকাশ। নিজের অন্তরের গভীরতর সত্যকে যে নজরুল তলিয়ে বুঝেছিলেন সে সাক্ষ্য সেনাবাহিনীতে থাকতে লেখা "ব্যাথার দান"-এ "রিক্তের বেদন"-এ, 'বাঁধন হারা"য় আছে। তাঁর জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার, সার্থকতার

www.pathagar.com

সব কিছুই তিনি খুঁজেছেন এই প্রেম দেয়া এবং পাওয়ার মধ্যে, এই ভালবাসার এবং ভালবাসা পাওয়ার মধ্যে। তাঁর মধ্যে এই প্রেম ছিল বলেই তিনি কখনো খণ্ডিত মানুষ ছিলেন না, ছিলেন পরিপূর্ণ এক প্রাণবন্ত পুরুষ। নজরুল যে নিজেকে অপার মানবিকতায় এবং সাম্যচিন্তায়, অকুণ্ঠ বিপ্লবে এবং নিঃসঙ্কোচ বিদ্রোহে এবং আপোষহীন আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন, সে সব কিছুর মূলেও ছিল প্রেম। এই প্রেম তাঁকে হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের সেতুবন্ধ রচনায় প্রয়াসী করেছে, তাঁকে দিয়ে কীর্তন-শ্যামা সঙ্গীত ভজনও লিখিয়েছে, আবার এই প্রেমই তাঁকে আল্লাহর প্রেমে সমর্পিত প্রাণ করেছে, নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আকুল করেছে, অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামের আহ্বান জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে, সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত অসুন্দর ও অসত্যের অবসান ঘটাতে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রেমই তাঁকে সব কিছুতেই অসঙ্কীর্ণ, আন্তরিক, সৎ ও বিশ্বাসী এক আপোষহীন পৌরুষদীপ্ত আনন্দময় পুরুষ করেছিল।

অন্তরে, চেতনায় প্রেম ছিল বলেই প্রায় সর্বগ্রাসী বিত্তের দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বে চিত্তের দারিদ্র্য ছিল না। এই ব্যক্তিত্বেরই অভিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে।

নজরুল সান্নিধ্যধন্যজনরা বলেন, এমনও দেখা গেছে, কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ে, স্ত্রীর চিকিৎসা, ছেলে বা মেয়ের লেখাপড়া— এ রকম মিথ্য কথা বলে আর্থিক সাহায্য নিয়েছে, অন্য কেউ সেটা দেখিয়ে দিলে বা উল্লেখ করলে নজরুল তখন বলেছেন ঃ "তার কথাটা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু অভাবটা তো মিথ্যা নয়।"

বাল্য ও কৈশোরে দারিদ্র্যজনিত কারণে নজরুল অনেক নিগ্রহ ভোগ করেছেন। তাই বিত্তহীন মানুষদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের জন্য নানান দিক দিয়েই অনেক কিছু করতে চাইতেন। তাঁর বিদ্রোহ, বিপ্লব চেষ্টা, শ্রেণী-সংগ্রামের আহ্বান, এ সবই তো এজন্যই।

নজরুল-চিত্তের গভীর, অপরিসীম ঔদার্য, তাঁর মানবিকতা, তাঁর সাম্যবাদ, তাঁর ঈশ্বর-প্রেম, এ সব কিছুর উৎস যে প্রেম, তাঁর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "জ্যৈষ্ঠের ঝড়"-এ লিখেছেন ঃ

"এমন কত লোক বন্ধু সেজে এসে ঠকিয়েছে কিন্তু নজরুল কোনোদিন ঠকেনি। কপট কুটিলের দল তাঁকে তাঁর পার্থিব প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে কিন্তু হৃদয়ের উদারতা কাড়বে কে? কাড়বে তাঁর সৃষ্টির প্রসন্নতা, তাঁর গানের কল্লোল, তাঁর সুদূর গহনে বিস্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা? তাঁর অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক— কে নেবে ছিনিয়ে?...

শকুনী-গৃধিনীর দল তাঁর অনেক উপসত্ত্বেও থাবা বসিয়েছে কিন্তু তাঁর হৃদয়ের পরমধনে একটি নখের আঁচড়ও কাটতে পারেনি কেউ।

বিত্তে দারিদ্র্য ঘটেছে অনেক, কিন্তু চিত্তে কদাপি নয়। মানুষ্যত্বেও নয়। ভালোবাসায় নয়। নজরুলের সাম্যবাদ যেমন মানুষে তেমনি ঈশ্বরে।"

www.pathagar.com

।। ছয় ।।

এখন আসছি সেই প্রেম প্রসঙ্গে, যে প্রেম প্রসঙ্গে "নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়" লেখা হয়, যে প্রেম প্রসঙ্গে নজরুল নিজেই লেখেন যে তাঁর 'কথা লুকিয়ে থাকে' তাঁর 'গানের আড়ালে'।

এ প্রেম একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন অনুভূতির বিষয়।

সেনাবাহিনীতে থাকতে লেখা তাঁর তিনটি গ্রন্থ "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", "বাঁধন হারা"য় এই প্রেমেরই হাহাকার দেখি। সেখানে দেখি প্রিয়তমা নারী, প্রেয়সী তাঁর প্রিয়তমের কাছে স্বপ্ন-নায়িকা। মানসী তো বটেই। এই স্বপ্ন-নায়িকা সব সময় মনকে আবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে রাখেন। সমস্ত চেতনা দখল করে থাকেন কেবল তিনিই। বোঝা যায়, কোথাও তাঁর পূজার ফুল কোন এক সময় ভালবাসা হয়ে গেছে। তাই এই নারী-প্রেমিকের কাছে আরাধ্য নারী। নিবেদিত প্রাণ ভক্তের মতো নতজানু হয়ে তিনি তাঁর পূজাও করেন। এই নারীই তাঁর পৃথিবী।

'ব্যথার দান' গ্রন্থের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার মনে হয়েছে, যেন প্রথম শ্রেণীর কোন মনোবিজ্ঞানের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি। কেবল 'ব্যাথার দান' নয়, সে সময় লেখা "রিক্তের বেদন", "বাঁধন হারা"ও সেই একই প্রেমানুভূতির সূত্রে গাঁথা! সেই একই সর্বগ্রাসী প্রেমের হাহাকার! বোঝা যায়, খোদ নজরুল জীবনে কোথাও খুব বড় রকমের একটা কিছু ঘটে গেছে।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ "ব্যথার দান"-এ মানসীর মাথার কাঁটার কথা আছে। সেটা তিনি সেনাবাহিনী থেকে ফিরে কলকাতার কর্মজীবনে আসার সময় আরও অনেক কিছুর মধ্যে যত্ন করে সঙ্গে এনেছিলেন।

নারীর মাথার কাঁটা চোখে দেখলে খুব ছোট দেখায়, কিন্তু সেটা যখন কোনো প্রেয়সীর, কোনো স্বপ্ন-নারীর মাথার কাঁটা হয় তখন তার প্রেমিক, প্রিয়তম সেটা দেখেন হৃদয় দিয়ে। তাই বড় দেখায়।

প্রেমিককে, প্রেমিকাকে দেখার ব্যাপারটা চোখ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে হয়।

নারীর প্রতি নজরুলের প্রেমানুভূতিটা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পবিত্র। তাঁর ব্যক্তিত্বেই এই জিনিসটা ছিল বলেই তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতেও সেভাবেই এসেছে। খুবই মর্মান্তিক এবং মর্মস্পর্শীভাবেই এসেছে।

নজরুল তাঁর প্রিয়তমা নারীর কাছে যথার্থ প্রেম ভিখারীর মতো মানসিক আশ্রয়ও খুঁজেছেন। তাঁর নিজস্ব সংবেদনশীল এবং পরিণত মনটি ছাড়াও এর পেছনে আরও অনেক কিছুর মধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত জীবনের হাহাকারটাও ছিল।

এর পেছনে আরও একটা জিনিস খুব প্রবলভাবে আছে। সেটা হল তাঁর ওই বাল্য এবং কৈশোরেরই আর্থিক দিক দিয়ে নিরাপত্তাহীন জীবন। পড়াশোনা, সঙ্গীত চর্চার এবং আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সব বিষয়েই তাঁর অনিশ্চিত বাল্য ও কৈশোর জীবন।

www.pathagar.com

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ তারিখে হক ব্রাদার্স, মিলন মহল, লালবাজার ভায়া কালীবাড়ি, মেজিয়া, বাঁকুড়া—এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত "নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে শেখ আজিবুল হক লিখেছেন যে, "ব্যথার দান"-এর উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত কবির ওই মানসী ছিলেন স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়। নজরুল যখন রাণীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়েন তখন কিশোরী স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়কে রাণীগঞ্জের জগন্নাথ গার্ডেনে প্রথম দেখেছিলেন।

স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন রাণীগঞ্জ থানার সে সময়কার পুলিশ অফিসার অক্ষয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে।

কিন্তু প্রণয়কে পরিণয়ে রূপ দেয়ার ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছাড়াও একটা বড় অন্তরায় ছিল নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নজরুলের শ্রেণীগত অবস্থান।

আর সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফেরার পর যে সময়টায় সর্বহারা নজরুল রুজি-রোজগারহীন অবস্থায় পরাশ্রয়ী হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেসে থাকতেন, সে সময় কুমিল্লার দৌলতপুরে বয়ঃসন্ধির সময়কার কিশোরী নার্গিসকে ভালবেসেছিলেন। নার্গিসের তো তখন ঘন ঘন মত পরিবর্তনের বয়স। আর তার অভিভাবকদের চোখের সামনে ছিল তখন আর্থিক দিক দিয়ে নজরুলের শ্রেণীগত অবস্থানের হিসাব।

"নজরুলকে যেমন দেখেছি" শিরোনামে গ্রন্থে শামসুন নাহারের লেখায়ও দেখছি, সে হিসাব অনেকটা বাড়ির দাস-দাসীরাও বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তবে তিনি লিখেছেন, প্রেয়সীর 'অবজ্ঞা তাঁকে হেনেছিল সবচেয়ে বড় আঘাত', সে অবজ্ঞা তো করা যায় কেবল চালচুলোহীন, সর্বহারা নজরুলকেই। আর নজরুলের মতো সংবেদনশীল মনের প্রেমিক ফিরতে পারেন কেবল তাঁর প্রেয়সীর কাছ থেকে আঘাত পেলে তবেই।

সে হিসাব অঙ্কের এম.এ. ফজিলাতুন্নেসাও করেছিলেন। তিনি অবশ্য পরে বুঝেছিলেন, মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশের হায়ার ম্যাথটা সব সময় বিধাতার হাতেই থাকে।

নার্গিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ নজরুলকে কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আঙিনায় বিদ্রোহী করেছিল, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আঙিনায় তাঁকে করেছিল অকুতোভয়, স্পষ্টবাক, সক্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং কেবল লেখনীতে নয়, সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবী। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, এসব মেহনতি এবং সর্বহারা মানুষদের সংগঠিত করার জন্য আটটি বছর তিনি তামাম বাংলাদেশের জেলায় জেলায় গ্রামগঞ্জে চষে বেড়িয়েছেন। অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র সারথ্য করেছেন, এবং এখানে স্বাধীনতার জন্য আলাদা আলাদা করে লিখেছেন, সর্বহারাদের জন্য লিখেছেন, সাম্যবাদী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, 'গণবাণী'র সেবা করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে তাঁর প্রেমের বিরহ তাঁকে বহুলাংশেই নিঃসঙ্গ এবং আত্মমগ্ন করে দিয়েছিল। কর্মজগতে তিনি এ সময় কেবল আর্থিক প্রয়োজনে নয়, অনেকখানি আত্মরক্ষার তাগিদেও ডুব দিয়েছেন সঙ্গীতে এবং আশ্রয় খুঁজেছেন ঈশ্বর-প্রেমেও।

ইতোমধ্যে এরই প্রভাব পড়েছে তাঁর উপন্যাস 'কুহেলিকা'য়, নাটক 'আলেয়া'য়, নারী সেখানে আর কেবল স্বপ্ন-নায়িকা নয়, রহস্যময়ী এবং কুহেলিকা। 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"আলেয়ার ইঙ্গিত কী? নারীর হৃদয় এক আলেয়া, এবং ভালোবাসা কুহেলিকাময়। এ যে কখন কাকে পথ ভোলায়, কখন কাকে চায়, তা চিররহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন। নজরুল যেন নিজের জানা কোনো জীবনের কাহিনীকেই রূপ দিতে চাইছে ঃ যাকে সে চিরকাল অবহেলা করে এসেছে তাকেই সে ফিরে পেতে চায় তাঁর চলে যাওয়ার পথে। পুরুষও তেমনি হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তাঁর মানসীকে খুঁজে ফেরে। তাই তাঁর কাছে আজকের সুন্দর কাল হয়ে ওঠে বাসি। হৃদয়ের তীর্থপথে তাঁর যাত্রার আর শেষ নেই।"

মানসীকে, তাঁর স্বপ্ন-নায়িকাকে খোঁজা নজরুলের যে কোনোদিন শেষ হয়নি, সে সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি করে দিতে পারে তাঁর সঙ্গীত। খুবই স্পর্শকাতর, রোম্যান্টিক মনের মানুষ ছিলেন তিনি। তাই এই না পাওয়ার বিরহটা সারা জীবনই কাঁদিয়েছিল তাঁকে। বিশেষত তাঁর গান যখন শুনি, তখন ভাবি একাকীত্বের কী অন্তহীন বেদনা মানুষটা সারা জীবন সয়ে গেছেন।

দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, পরাধীনতা— এ রকম সব কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি লড়েছেন, লড়তে পেরেছেন।

কিন্তু এই জায়গাটিতে তিনি ছিলেন অসহায়। নিরুপায় এবং বড্ড অসহায়।

লেখকের, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাহিত্যে, শিল্পে এভাবেই কাজ করে।

১৯৪১-এর ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভায় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে নজরুল স্পষ্টতই বলেছেন ঃ

"সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কী করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর।"

।। সাত ।।

১৯২০-এর গোড়ার দিকে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে কলকাতার কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর নজরুল ইসলাম নিজের যে পরিচয়টা খুব বড় করে অনুভব করতেন এবং জনসমক্ষে দিতেও চাইতেন, সে পরিচয়টা হ'ল তাঁর কবি-সৈনিকের পরিচয়। 'নবযুগ' দৈনিকে যোগ দিয়ে তিনি সমাজে নবযুগ আনার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছেন। সেটা ১৯২০-এর মাঝামাঝি প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ে দৈনিক 'নবযুগ'-এ যেমন, ঠিক তেমনি ১৯৪১-এর শেষ ভাগে প্রকাশিত তৃতীয় পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এও।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফেরার পর তাঁর প্রথম দিককার লেখায় শ্রেণী সংগ্রামের কথা, সর্বহারাদের কথা তেমন আসেনি বলে নারায়ণ চৌধুরী যে উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলিম দুনিয়ার ওপর, বিশেষত তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরেজদের অবিচার, অমানবিকতা এবং নৃশংসতা এবং সেটা প্রকাশ করার জন্য নজরুল গদ্য সাহিত্যের চেয়ে কবিতারই আশ্রয় নিয়েছেন বেশি।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার যে, নজরুলের স্বদেশ প্রেম ছিল মুক্ত ও উদার এবং ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কৃত্রিমতা বর্জিত।

নজরুল মানস মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে কখনই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি, যেমন পারেনি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে। এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম্প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে শামিল করতে চেয়েছেন তিনি। উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে এটাকে তিনি অপরিহার্যও মনে করেছেন। এ কারণেই ১৯১৬'-র ডিসেম্বরের লক্ষ্ণৌ প্যাট তাঁকে যেমন উৎসাহিত করেছিল, তেমনি ১১ মার্চ ১৯২৮-এ কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে ক্ষুব্ধ লীগ প্রতিনিধিদের ওয়াক আউটের ঘটনা তাঁকে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে হতাশ করেছিল।

বিশেষত যেভাবে নজরুলের বাল্য ও কৈশোর জীবন কেটেছে এবং সে সময় সীমার মধ্যে তাঁর মানসিক গঠনটা যে রকম হওয়ার কথা, সে সব কিছু স্মরণে রেখে আমাদেরকে নজরুল জীবনের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ সন্ধানের কাজটা করতে হবে।

মানুষ স্বাধীনতার কথা কখন চিন্তা করে?

যখন ভাবে অপরের, অপর কোন শক্তির অধীন হয়ে সে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

নজরুল শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে, তাঁর সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পূর্ব পুরুষরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে সচ্ছলভাবে বাঁচার অধিকার যে হারিয়ে ছিলেন, কেবল তা-ই নয়, সুস্থভাবে জীবন ধারণের অধিকারটুকুও হারিয়েছিলেন।

অতএব, সাত সমুদ্র তের নদী পার থেকে আসা যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে তিনি তাঁর জন্ম মুহূর্ত থেকে দেখে আসছিলেন, যে উন্নাসিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ ভারতভূমিকে বা এই উপমহাদেশকে কখনই Homeland বা স্বদেশভূমি বলে গণ্য করেননি। তারা কেবল আসতেন এই উপমহাদেশের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে। তাদের স্বদেশভূমি গ্রেট ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাদেরকে তল্পিতল্পাসহ উৎখাত করে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

অনিবার্য স্পৃহা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল এবং তাঁর সাহিত্যে এটার অত্যন্ত সঠিক এবং শিল্পসম্মত প্রতিফলনও ঘটেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল থেকেই এই উপমহাদেশের মানুষ, বিশেষত এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মানুষ, বিশেষত অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে মুসলমানরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিত শোষণ-বঞ্চনার যাঁতাকালে পড়ে দিনকে দিন ক্রমে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে থাকেন, আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার হারাতে থাকেন, শিক্ষার অধিকার হারাতে থাকেন।

এই পরিস্থিতিতে অজস্র সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারকে সহায়-সম্বল খোয়াতে হয়েছে।

অতি অল্প বয়সে নজরুলের জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাণীগঞ্জের কয়লা খনিতে অল্প বেতনে শ্রমিকের কাজ করতে যেতে হয়েছে। সেই অতি অল্প বয়স থেকেই নজরুলকে তাঁর আপন শিক্ষা জীবনকে নিশ্চিত করতে জীবিকার সংস্থান করতে হয়েছে। এজন্য এক জায়গায় না হলে আর এক জায়গায় ছুটে যেতে হয়েছে।

এহেন পরিস্থিতির জন্য দায়ী যে সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে দখলদার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শত্রুতামূলক শাসন ও শোষণ, সেটা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই সন্ত্রাসী তথা বিপ্লবী যুগান্তর দলের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবন ধারা শ্রেণী-চেতনা তৈরি করে এবং সেই শ্রেণী-চেতনা থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়। ফলে, নজরুলের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষাও কেবল বহিরঙ্গের বা রাজনৈতিক ছিল না, তা পুরোপুরি অর্থনৈতিকও ছিল। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি সাক্ষ্য দেয়, গণমানুষের যথার্থ অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি নিশ্চয়ই অর্থবহ মনে করতেন না। তাঁর কাছে বরং অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের অবসানই স্বাধীনতা বলে মনে হত।

তাঁর প্রথম দিককার রচনা, 'যুগবাণী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নবযুগ' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"রুশিয়া বলিল, মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে?"

তৃণমূল স্তরের মানুষের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির কথা তিনি লিখেছেন।

'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে আহবান জানিয়েছেন, তার অন্তত বিশ বছর আগে থেকে।

এ বিষয়ে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের মতো মানুষও নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন,

www.pathagar.com

উক্ত 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে আহবান জানানোর দশ-এগার বছর আগে। ১৮ জুন ১৯২৯ তারিখ মঙ্গলবার শ্রী গোপাল লাল সান্যাল সম্পাদিত দৈনিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ/সাহিত্যিকগণের পরিচয়' শিরোনামে তাঁর সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত নিবন্ধে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্য অপেক্ষা নজরুল সাহিত্য জাতীয় জীবনের পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয়। সেই অনুপাতে তেমনি, রবীন্দ্রনাথের জন্য ব্যয় করেছেন সংবাদপত্রের কলমের হিসাবে সাড়ে তের পঙ্‌ক্তি আর একটি পৃথক উপশিরোনামে 'নজরুল ইসলাম'-এর ওপর তিনি লিখেছেন ৪৮ পঙ্‌ক্তি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখার পর 'নজরুল ইসলাম' সম্পর্কে আলাদা উপশিরোনামে তিনি লিখেছেন ঃ

"তারপর সর্বকনিষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁহার কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম এতো কম নয়। এ যে খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে নামেন নাই। কর্দমময় পিচ্ছিল পথের ওপর পা পড়িলে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার কবিতায় প্রাণের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নতুন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ বেশি নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান। ওয়েল হুইটমেনের কবিতা আপনারা পড়িয়াছেন কিনা জানি না। তাহার মধ্যে একটা মানবপ্রীতি, মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালোবাসা, মানুষের ছায়াকে, মানুষের গন্ধকে ভালোবাসার ভাব আছে— তিনি বলিয়াছেন— আমি যদি দেখি কোন মানুষের পিঠ ভাঙিয়া গিয়াছে— আমার নিজের পিঠে হাত দিই; মনে করি আমার নিজের পিঠ ভাঙিয়া গিয়াছে। এই যে মানুষের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দেয়া ডুবাইয়া মানুষের একাত্মসাধন,— এ অতি অল্প লোকেই করিয়াছে—কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে সেইরূপ মনুষ্যত্মক বুদ্ধি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম নুতন যুগের কবি। দোহাই, আপনারা তাঁহাকে নষ্ট করিবেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন ওঠেন, তখন অক্ষয়কুমার সরকার বলিয়াছিলেন, 'ভাই, হাততালি দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে যেমন নষ্ট করিয়াছ, দোহাই তোমাদের, সেইভাবে এই নবোদিত তরুণ কবিকে নষ্ট করিও না।"

আমিও বলি হাততালি দিয়া নজরুলকে নষ্ট করিবেন না— তাঁহাকে অগ্রসর হতে দিন। যে সাধনায় তিনি অগ্রসর হইয়াছেন সেই সাধনায় তাঁহাকে সিদ্ধিলাভ করিতে দিন। সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁকে নমস্কার করুন।'

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের এই কথাগুলো সেই সময়ে লেখা, যখন নজরুল আট বছর যাবৎ তামাম বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার, মহকুমার গ্রামগঞ্জ চষে নানা পেশার মেহনতী ও সর্বহারা মানুষদেরকে বিপ্লবী চিন্তা-চেতনায়, অর্থনৈতিক আন্দোলনে

www.pathagar.com

সংগঠিত করছিলেন। এ সময় সবখান থেকে তিনি অজস্র অভিনন্দন ও সংবর্ধনাও পাচ্ছিলেন। সেটা ছিল বিদ্রোহী কবি থেকে জাতীয় কবির আসনে সমাসীন হওয়ার সময় তাঁর। সেই সময়, যখন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সম্বর্ধনা সভায় নজরুল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করতে এগিয়ে আসছিলেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

নজরুল স্বাধীনতার কথা বলেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের ভিত্তিতে।

নজরুলের স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের চিন্তা। উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই সংহতি তিনি অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতেন। আর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার অধিকার চিন্তার সঙ্গে তাঁর স্বাধীনতা ছিল সমার্থক। সমগ্র নজরুল সাহিত্যই এর সাক্ষ্য দেবে। যে স্বাধীনতা তিনি প্রত্যাশা করেছেন এবং অর্জন করতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি আশা করেছেন, 'কলেরা মহামারি' দেখা দেয়ার মতো চিকিৎসাভাবের কোন ঘটনা ঘটবে না, সুস্থভাবে বাঁচার এবং সুস্থভাবে চিন্তা করার মতো এবং শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার মতো আর্থিক নিরাপত্তা প্রতিটি মানুষেরই থাকবে। খেয়ে-পরে বাঁচার এই অধিকার, সুস্থ জীবনবোধের এই অধিকারকেই তিনি স্বাধীনতা বলে চিহ্নিত করেছেন। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে এই বিষয়টিকেই শনাক্ত করে তিনি লিখেছেন ঃ

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ,
চায় দুটো ভাত, একটু নুন,
বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা,
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।"

www.pathagar.com

সাম্য ও সহাবস্থানের কবি

।। এক ।।

জীবন ধারণের ব্যাপারটা নজরুলের কাছে কেমন ছিল? সেটা কি লক্ষ্যহীন ছিলো? সেটা কি ছিলো কেবল বাঁচার জন্য বাঁচা? কিংবা কেবল নিজের জন্য বাঁচা?

কৃষ্ণনগর থেকে ১২ নভেম্বর ১৯২৭ তারিখে ময়মনসিংহের করটিয়ার কলেজ মুসলিম হোস্টেলের ঠিকানায় মাহ্‌ফুজুর রহমান খানকে এক চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন ঃ

"মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিঁজরায় পু'রে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা! তবু এই মানুষ—এই পশুর জন্য আমি গান গাই—তারই জন্য আছি আজো বেঁচে।"

নজরুলের বাঁচার লক্ষ্য যে মানুষ, যতদিন বেঁচেছেন তিনি যে মানুষের জন্য বেঁচেছেন, সেটা এখানে জানা গেলো।

এবার দেখা যাক, তাঁর স্বধর্মী বাঙলাভাষী সমাজের কোন্ চেহারাটা তিনি টের পেয়েছেন।

ইতোপূর্বে কৃষ্ণনগর থেকে ১ মার্চ ১৯২৬ তারিখে ঢাকার আন্‌ওয়ার হোসেনকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

'আমাদের বাঙালী মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে, করে যাও—তার জবাবদিহি করতে হয় না এ সমাজে—কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ৎ তলব হয়। অথচ কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।'

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর চিঠির জবাবে পৌষ ১৩৩৪ (ডিসেম্বর ১৯২৭–জানুয়ারি ১৯২৮)-এর "সওগাত"–এ নজরুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"বাঙলার মুসলমান ধনে কাঙাল কিনা জানি না, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হ'তে।"

বাঙলাভাষী স্বধর্মীদের সমাজ নিয়ে ভেবেছেন নজরুল। দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন সমাজটাকে। সমাজের অনুদারতাটাকেও।

৯ ডিসেম্বর ১৯২৫ (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩২) তারিখে আন্‌ওয়ার হোসেনকে তার চিঠির জবাবে লিখেছেন ঃ

"মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাঙলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছিনে। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল ক'রছে— আমার কবিতার সাথে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান— কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।

আমি আপাতত শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি—আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকেও মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেখানে কবি জন্মাল না। এটা সত্য।"

।। দুই ।।

পৌষ ১৩৩৪ (ডিসেম্বর ১৯২৭—জানুয়ারি ১৯২৮)-এর "সওগাত"-এ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মতো বড় তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহা-পুরুষদের সাথে কাফেরের পঙ্‌ক্তিতে উঠে গেলাম!"

এর অব্যবহিত পর আছে প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর কথা। তিনি লিখেছেন ঃ

"হিন্দুর লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে,যে নিবিড় প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর-ভাষায় গালাগালি করছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-মহাসভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদেরকে আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে দোষ দিইনি এবং দেবোও না। তাছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাত্‌লামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,— আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল— এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়।

এ পর্যন্ত যেসব উদ্ধৃতি আমি পেশ করলাম এই সব কিছুতে নজরুলের স্বধর্মীদের সম্পর্কে এবং প্রতিবেশী ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে একটা বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করি। মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একজন মানুষ তাঁর স্বধর্মীদের কাছে লেখা

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত চিঠিতে এই অনন্য সাধারণ নিরপেক্ষতা, ঔচিত্যবোধ, সুবিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর এই বিস্ময়কর নিরপেক্ষতার উৎসটা কোথায়?— এর উৎসটা হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি।

।। তিন ।।

অসুস্থ ব্রাহ্মণকে রক্ত দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা

১৮ মার্চ ১৯২৮ তারিখে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন্‌কে একটি চিঠিতে নজরুল ইসলাম লিখছেন ঃ

"দৈনিক 'বসুমতী' দিনকতক আগে একটা বিজ্ঞাপনে বেরিয়েছিল যে, কোনো এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—কোন সুস্থকায় যুবকের কিছু রক্ত পেলে তিনি বাঁচতে পারেন। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। আমি রাজি হয়েছি রক্ত দিতে। আজ ডাক্তার পরীক্ষা করবে আমায়। আমার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে ওর দেহে দেবে। ভয়ের কিছু নেই এতে, তবে দু'চার দিন শুয়ে থাকতে হবে মাত্র।... এখুনি বেরুব ডাক্তারের কাছে।"

এর তেরো দিন পর ৩১ মার্চ ১৯২৮ তারিখে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে এক চিঠিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম জানালেন ঃ

"....রক্ত দান করিনি।...ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক 'মুসলমানের' রক্ত নিতে রাজি হলেন না। হায়রে মানুষ, হায় তা'র ধর্ম! কিন্তু কোনো হিন্দু যুবক আজও রক্ত দিলো না। লোকটা মরছে— তবুও নেবে না 'নেড়ে'র রক্ত।"

'জাত-জালিয়াৎ' কবিতায় মনুসংহিতার সমাজের কথা

অসুস্থ ব্রাহ্মণকে রক্ত দেওয়ার এই প্রয়াস চালানোর বছর পাঁচেক আগে ২০ জুলাই ১৯২৩ (৪ শ্রাবণ ১৩৩০) তারিখ শুক্রবার সাপ্তাহিক 'বিজলী'-র ৩ বর্ষ ঃ ৩৬ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিলো কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'জাত-জালিয়াৎ' কবিতাটি। এটা পরে গ্রামোফোন রেকর্ডে গানও হয়েছে। কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয় কবি তখন বহরমপুর জেলে। 'জাত-জালিয়াৎ' শিরোনামে এই কবিতা-গানটি শ্রাবণ ১৩৩০-এর মাসিক 'উপাসনা'-য় সাপ্তাহিক 'বিজলী' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রাবণ ১৩৩০-এর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যায় এই কবিতাটি 'জাত-জালিয়াৎ' শিরোনামেই প্রকাশিত হয়েছে। পুনর্মুদ্রিত কথাটি সেখানে লেখা নেই।

সাতচল্লিশোত্তর স্বাধীন ভারতে বাড়িতে আমার আব্বার মুখে এই কবিতাটির আবৃত্তি অজস্রবার শুনেছি।

আব্বার মুখে শুনে শুনে এই কবিতাটি শৈশবেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

এই কবিতাটির এক জায়গায় আছে ঃ

www.pathagar.com

"দিন-কানা সব দেখতে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন করে পিষছে তোদের পিশাচ জাতির জাঁতা-কলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যাজি নিলি রাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া।"
এর পরবর্তী স্তবকে আছে মনুর কথা এবং মনুসংহিতার কথা ঃ
"মনু ঋষি অণু সমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির
বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ, ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিনলি না তা চিনির বলদ, সার হল তাই শাস্ত্র বওয়া।"

।। চার ।।

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, এই ঠিকানাস্থিত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে আগস্ট ১৯৯২-এ প্রকাশিত "বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়" গ্রন্থে ১২৬ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"হিন্দু সমাজের ভিতরকার রূপ বীভৎস। মনুসংহিতার সমাজ জন্ম বিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের অধিকার এই সমাজের কাছে বিভীষিকা। মানুষকে যে মানুষ বলেই সম্মান করা প্রয়োজন, এ চিন্তা ইউরোপের দান। আইনের চোখে সব মানুষই সমান ও চিন্তাও ইউরোপ থেকেই ছড়িয়েছে।

মনুসংহিতার সমাজে ব্রাহ্মণ অবধ্য, একই অপরাধে উচ্চ জাতির শাস্তি কম, নীচ জাতির বেশি। জাতির পরিচয়ে ব্যক্তির পরিচয়, জাতির অধিকারে ব্যক্তির অধিকার, জাতির কর্তব্যই মানুষের কর্তব্য। জাতিভেদ প্রথা বাদ দিলে হিন্দু সমাজের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নেই।... বিগত দু'হাজার বছরের হিন্দু সমাজ মনুসংহিতার আইনে চলছে।"

উক্ত গ্রন্থে এর পরের পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ১২৭ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"জাতিভেদ প্রথা, উচ্চ জাতির প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে জড়িয়ে হিন্দু ধর্মের যে সামাজিক রূপ, হিন্দু রাজারা তাকেই রক্ষা করতেন। বলা বাহুল্য, এই কাঠামোটুকুর মধ্যে রাজা স্বৈরাচারী ছিলেন।"

মনুসংহিতা

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে "মায়াবিনী ঈশ্বরীর দেশ ভারতই 'দ্যা কন্টিনেন্ট সার্সি'র অন্তর্বস্তু/অনাবাসী ভারত পথিক নীরদ চন্দ্র" শীর্ষক নিবন্ধে অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন ঃ

"ঐতিহাসিককালে ব্রাহ্মণদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা মনুসংহিতায় বিস্ফোরিত হয়। বর্ণ সম্পর্ককে রূঢ় কঠিন বেষ্টনী দিয়ে আবদ্ধ করা হয় এবং স্বধর্মে

www.pathagar.com

নিধন শ্রেয় (স্বধর্ম বলতে বর্ণ নির্দিষ্ট, সামাজিক দায়বদ্ধতায় নিযুক্ত থাকা বোঝায়), এই তত্ত্ব প্রচার করে বর্ণ বৃত্তের বাইরে আসার পথ অবরুদ্ধ করা হয়।"

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে পৌষ ১৩৯৫-এ পুনর্মুদ্রিত "রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০ এবং ৪১ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

২৪ চৈত্র ১৩০৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার তরুণ রাজকুমারকে লিখেছেন, "কৌপীনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে অসভ্যতা নাই।...বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

শূদ্রের প্রতি ঘৃণা এবং ব্রাহ্মণ আদর্শ

পুনঃ প্রতিষ্ঠা কামনা

রবীন্দ্রজীবনীর উক্ত খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে রবীন্দ্রনাথ "শান্তি নিকেতন" হইতে আর একখানি পত্রেও ত্রিপুরার মহারাজ কুমারকে লিখিতেছেন (৭ বৈশাখ ১৩০৯), ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে— দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়া শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।...আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো।...ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়?"

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান নয়,

সমাজ প্রধান

রবীন্দ্রজীবনীর উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান নয়, এখানে সমাজ মানুষের জীবনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মই হিন্দু সমাজের ঐক্যভিত্তি।"...

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজিও ভারতে ব্রাহ্মণ প্রধান বর্ণাশ্রম আছে।"

হিন্দু জাতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি

রবীন্দ্র জীবনীর উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের দেশবিষয়ক মতামতের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু ন্যাশনালিজম ও হিন্দুসমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তাহার কাছে হিন্দুত্ব শব্দের দ্বারা হিন্দু ন্যাশনালিটি ও হিন্দু কালচার উভয়ই সূচিত হইত।"

উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিজে কিন্তু হিন্দু ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব ভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

www.pathagar.com

সেই বিশ্ব ভারতীর অন্যতম উপাচার্য, খিলাফত আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে উদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে যিনি প্রভাবিত করেছিলেন এবং (১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখ রবিবার) শান্তি নিকেতনে হিন্দী ভবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিএফ এন্ড্রুজের মতো তিনিও ছিলেন খ্রিস্টান।

বর্ণভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের পট্টবস্ত্র

ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্বের আয়ুধ এই কঠোর বর্ণব্যবস্থা যে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মান্য করা হতো তা ১ বৈশাখ ১৩৯৭-য়ে কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথকে ৬ আগস্ট ১৯৩৩ তারিখে লেখা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ছাত্র ও সহচর কার্তিকচন্দ্র লালের চিঠিতে এইভাবে আছে ঃ

"উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনি এখন বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর আশ্রমটি গঠিত করেন। ছাত্রদের বর্ণ হিসাবে প্রাতঃসন্ধ্যার নিমিত্ত সাদা, বেগুনী, লাল ও হরিদ্রা রং-এর পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় ও আপনিই তাদের 'গুরুদের' পদে অধিষ্ঠিত হন। আপনাদের দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যাক্রমের প্রথম উৎপত্তি হয়।"

'হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ'

নভেম্বর ১৯৯৩-এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা— ৯ এই ঠিকানা থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ/আনন্দ বাজার পত্রিকা' শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২৫৯ এবং ২৬০ পৃষ্ঠায় 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি ইতোপূর্বে ১৯২৩-এ সাপ্তাহিক 'বিজলী'-তে প্রকাশিত হয়েছে। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের এক উক্তি প্রসঙ্গে সাংবাদিক মৃণাল কান্তি বসুর কাছে দেয়া রবীন্দ্রনাথের একটা সাক্ষাৎকার আছে। সেখানে 'হিন্দু মহাসভা' শিরোনামে এক জায়গায় আছে ঃ

"হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বললেন— কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে সংঘবদ্ধ হতেই হবে।"

সাপ্তাহিক 'বিজলী'-তে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ১৯ আগস্ট ১৯২৩ (২ ভাদ্র ১৩৩০) তারিখ রবিবার সকালে এবং ৩১ আগস্ট ১৯২৩ (১৪ ভাদ্র ১৩৩০) তারিখ শুক্রবার বিকেলে 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' সম্পর্কে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মৃণাল কান্তি বসুর কাছে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

১৪ ভাদ্র ১৩৩০ (৩১ আগস্ট ১৯২৩) তারিখ শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়িতে শ্রী মৃণাল কান্তি বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বজাতি হিন্দুদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বললেন ঃ

"পাঞ্জাবে ও যুক্ত প্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতু

www.pathagar.com

টাতু খায়। কিন্তু হিন্দু পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানদের এই Organising Spirit কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্মই তাকে Organise করেছে। মুসলমানের ধর্ম সাম্যবাদমূলক। মুসলমান মুসলমানে যে সহানুভূতি, তার Sanction বা বুনিয়াদ মুসলমান ধর্মে। হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ বর্তমানে যাকে হিন্দু-ধর্ম বলে বুঝি তা Organisation-এর পরিপন্থী। সাম্যবাদের ওপরও প্রতিষ্ঠিত নয়।"

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ (২৮ ভাদ্র ১৩৩০) তারিখ শুক্রবার সাপ্তাহিক 'বিজলী'র ৩ বর্ষ ঃ ৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুস্পষ্ট বক্তব্য ঃ 'মুসলমানের দেশাত্মবোধ নেই....'

এসব রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) প্রতিষ্ঠার দু'বছর আগের কথা।

কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সাবেক ছাত্র, অনুশীলন সমিতির এক সময়কার কর্মী ডাক্তার কেশব রাও হেডগেওয়ার নাগপুর শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ (১১ আশ্বিন ১৩৩২) তারিখ বিজয়ার দিন।

সংরক্ষণ

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে ১ মে ১৯৯৯ তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় শাসন সংস্কার ও হিন্দু-মুসলিম বিষয়ে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 'স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ কি?' শিরোনামে একটি নিবন্ধে নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন যে, হিন্দু-মুসলিম সমকক্ষতা কোনো ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা। আর এই সামাজিক শক্তি অর্জনের একটি পথ হল সংরক্ষণ। কিন্তু আইনসভার আসন সংরক্ষণ এবং চাকরি-বাকরি সংরক্ষণের বিষয়ে মুসলমানদের প্রতিটি দাবীর বিরোধিতা কারা করছেন এবং কীভাবে করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন ঃ

"সংরক্ষণ একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, যেটা কার্যকর করা সম্ভব।...যদি ধরেই নেওয়া যায় সংরক্ষণ কোনও সফল পদ্ধতি নয়, তাহলে আইনসভায়, রাজনৈতিক দলে নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে এত উৎসাহ কেন?

পক্ষান্তরে, সংরক্ষণের ব্যাপারে হিন্দুরা পদে পদে আপত্তি না তুললে, ১৯০৯ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত, মুসলমানরা হয়ত হিন্দুদের বিশ্বাস করতে পারত। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবল বিরুদ্ধতা করেছিল বাঙালি হিন্দুরা এবং রবীন্দ্রনাথ সভাতে, বিবৃতিতে, বক্তৃতায় তাদের সমর্থন করেছিলেন। মুসলমান এবং শূদ্রদের সংখ্যাধিক্যে বর্ণ হিন্দুদের প্রভাব লোপ পাবে, এটাই তো আশঙ্কার কারণ?"

এক জাতিতত্ত্বের ধারণা এবং শুদ্ধি আন্দোলন

মাঘ ১৩৯৯-এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পাল 'রবি জীবনী'র ষষ্ঠ খণ্ডে ২০৭ এবং ২০৮ পৃষ্ঠায় ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ তারিখ শুক্রবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরের উল্লেখ করা হয়েছে

www.pathagar.com

এইভাবে ঃ

"বাংলার মুসলমানদের বৃহদংশই ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। বর্ণ হিন্দুদের গোঁড়ামির আতিশয্যে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অমর্যাদাকর জীবনযাপনে বাধ্য ও শোষিত হচ্ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবিলা করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়লো এই সমস্যার দিকে। ৩ ফেব্রুয়ারি [শুক্র ২০ মাঘ] বেঙ্গলীতে এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়..."

মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ তারিখ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায় কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে ওভারটুন হল-এ রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই কমিটির অন্যতম সদস্য।

এই কমিটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল এর পর লিখেছেন ঃ

"এই কমিটির কৃতিত্ব খুবই সীমাবদ্ধ কিন্তু ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে যে সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল সে বিষয়ে প্রাথমিক সচেতনতার নিদর্শন হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।"

মনুসংহিতার সমাজের এক জাতিতত্ত্বের ধারণা এবং শুদ্ধি আন্দোলনের তাগিদে "দুরাশা" গল্পের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"কেশর লাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরা লোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমানে রাজপদ লইয়া দূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।"

মনুসংহিতার সমাজ, এক জাতিতত্ত্ব, শুদ্ধি আন্দোলন, (মহাভারতের শকুনির) দূতক্রীড়া (যে দূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল এবং যাতে কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যকার সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি), এরকম অনেক কথাই কেবল প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের মানুষরা এবং মুসলমানরা নন, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের মানুষরাও নিশ্চয়ই পড়ছেন!

।। পাঁচ ।।

আমরা যে উপমহাদেশে বাস করি সেই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী?

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হল সাম্প্রদায়িক সমস্যা। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে আর একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হরেক রকমের শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হওয়ার সমস্যা। এবং এই সমস্যা থেকে সৃষ্ট আরো অনেক সমস্যা। উপমহাদেশের আরো একটা বড় সমস্যা আছে সেটা হল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার আসমান-জমিন শ্রেণী বৈষম্য। এই অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য দুর্নীতি, সন্ত্রাস, খুন-খারাবি থেকে শুরু করে অনেক বিপর্যয়কর সমস্যা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এছাড়া প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য আছে। এই শ্রেণী বৈষম্য আবার অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের পক্ষেও অনিবার্যভাবে সমর্থন যোগায়। মনুসংহিতার সমাজের এই কঠোর কঠিন বর্ণ ব্যবস্থা স্পষ্টতই গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী এবং উচ্চবর্ণের সুবিধাভোগী মানুষের স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। উচ্চবর্ণের এই মানুষগুলোর সমাজপতিরা একাধারে তাদের বর্ণস্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য গো-হত্যা নিবারণ, মসজিদ-মন্দির বিরোধ ইত্যাকার নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানান বিষয়ে অধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষদের তাদের প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্পর্কে উত্তেজিত ও উন্মত্ত করে স্বধর্মী সমাজের একটা ভাঁজে বা স্তরে আবদ্ধ রেখে স্থায়ীভাবে তাদের উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী শ্রেণী স্বার্থের একটা সমর্থক জনগোষ্ঠী হিসাবে ধ'রে রাখে।

উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং এর ফলে পৈশাচিক তাণ্ডবে মর্মান্তিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোও ঘটে, যেমনটা ঘটেছে এখন এই ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ গুজরাটে। ঊনিশ শ' সাতচল্লিশে উপমহাদেশ বিভক্তির ঘটনা ঘটেছে এই একই কারণে, উচ্চবর্ণের ওইসব মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ স্থায়ীভাবে ধ'রে রাখার স্বার্থে। পরবর্তীকালে অনেক বিপর্যয়কর ঘটনার কারণও এটাই। এই সমস্যাটির সমাধান না করলে এই সমস্যাটাই ক্রমে আমাদের উপমহাদেশের সহাবস্থানকামী নিরীহ গণমানুষের অস্তিত্বকে গ্রাস করবে। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনার বসনিয়া সমস্যা, কসোভো সমস্যা, চেচনিয়া সমস্যা, আফগানিস্তান সমস্যা, ফিলিস্তিন সমস্যা, গুজরাট সমস্যা, এ রকম অনেক সমস্যারই এই একই রকম কারণ। গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর, গুটিকয়েক অতিরিক্ত সুবিধাভোগী লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থের শ্রীবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ। মুষ্টিমেয় কিছু লোক অগাধ ধনসম্পত্তি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক হবে, সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেবল তাদের হাতেই থাকবে এবং অন্যরা হয়ে যাবে কিংবা বলা যায়, আর একটা সভ্যতার, আর একটা জাতির গণমানুষকে কার্যত বাধ্যতামূলকভাবে হতে হবে মিস্কিন, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ এবং অবশ্যই করুণার পাত্র।

এই লক্ষ্যেই কত বিষয়ে কত পরিকল্পনা! গণমাধ্যমে কত প্রচার, অপপ্রচার! গণমানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত করা!

বিশেষত নিরপেক্ষ, উদার ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে নজরুল এ ধরণের সমস্যাগুলোর উৎসমুখ দুটো শনাক্ত করেছিলেন। এ কারণেই একদিকে তিনি যেমন তাঁর জীবন ও সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থান কামনা করেছেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য এবং সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের অবসান কামনা করছেন। ভাষা ও আঞ্চলিকতাকেন্দ্রিক অনুদারতার ঊর্ধ্বে সাম্য ও সহাবস্থানমূলক এক

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক চেতনায় তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে নজরুল ধর্মনিরপেক্ষতার মতো অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর আদর্শের কথা বলেননি এবং নাস্তিক্যের মতো গণমানুষের কাছে আপত্তিকর, অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব কোন বিষয়ের কথাও বলেননি। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কথা। কেননা, সহাবস্থানের নীতিতে সবার ধর্মীয় সংস্কৃতির এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের সুযোগ থাকে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কার্যকর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে। এই জায়গাটিতে অন্তত আমাদের বাংলাভাষীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় তাঁর অবদান বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয়। তাঁর এই নিরপেক্ষতা, তাঁর এই দূরদৃষ্টি, তাঁর এই সুস্থ জীবনবোধ গণমানুষের কাছে চিরদিন স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। এই স্থানটিতে তাঁর নেই কোন পূর্বসুরি এবং তাঁর কোন উত্তরসুরিও নেই। সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সহাবস্থানের ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেউ পরিবেশন করতে পারেননি। নজরুলের অবদানের অবিস্মরণীয় অনেক দিক আছে, তবে সাম্য ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি বাংলাভাষী গণমানুষের জাতীয় কবি।

।। ছয় ।।

১২ জুন ১৯৯৯ তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় 'সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারে অন্যতম পথিকৃত কবি' শিরোনামে তাঁর নিবন্ধে লাডলী মোহন রায় চৌধুরী লিখেছেন যে, সেনাবাহিনী থেকে কলকাতার পত্রিকায় পাঠানো 'হেনা' ও 'ব্যাথার দান'— এই দুটো গল্পে নজরুলের কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় আস্থার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান।

মুজফ্‌ফর আহমদ যে তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা'য় লিখেছেন, "নজরুলের আগে বাংলাদেশে সম্ভবত ভারতবর্ষেও কোন কবি বা সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের পরের সোভিয়েত ভূমিকার কথা তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেননি", এই বক্তব্যটার ওপর আমাদের পাওয়া দরকার কোন মন্তব্য নয়, নথি-তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত।

আমাদের সাম্যবাদী সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা কেবল পথিকৃতের নয়, এ বিষয়েও তাঁর দান অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ, ব্যাপক, অপরিসীম এবং বিস্ময়কর। এ বিষয়ে যদি কখনও বিস্তারিত আলোচনা হয় তখন এ বিষয়ে তাঁর মহৎ অবদানের ছবিটা স্পষ্ট হবে এবং গণমানুষের অধিকার অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগবে।

নানান আঙিনার মেহনতী মানুষদের জন্য কেবল সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি নয়, তাদের সংগঠিত করার জন্যও দীর্ঘ আট বছর তিনি গ্রামে-গঞ্জে, শহরে নানা জায়গায় ব্যাপক সফর করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর জীবনধারা তাঁকে যে শ্রেণী চেতনা দিয়েছে এই ব্যাপক সাংগঠনিক ও সৃজনশীল কাজের পেছনে সে তাগিদটাও নিশ্চয়ই ছিল। ফলে তাঁর সাহিত্যে ও সঙ্গীতে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারটাও এসেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

মূলত সাম্য ও সহাবস্থানের কবি বলেই তিনি আমাদের গণমানুষের জাতীয় কবি। পরবর্তীকালে সাম্যের বিষয়ে কিছু কিছু কাজ কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু সহাবস্থানের বিষয়ে কাজ তাঁর আগে বা পরে এই বাংলা মুলুকে কোথাও কিছুই হয়নি। আমি মূলত এখানে সহাবস্থানের ওপর জোর দিয়েছি সে কারণেই। বিশেষত এই উপমহাদেশে গুজরাটে এখন এই ২০০২-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এপ্রিলে মুসলিম গণহত্যা, মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলছে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপরও মুসলিম নারীদের ওপর গণধর্ষণ চলেছে, গত তিন মাস যাবৎ জীবন্ত মুসলমানদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তাদের বাড়ি-ঘর লুটপাট, ভাঙচুর করা হচ্ছে, মসজিদ-দরগাহ্ বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে।

কেশব রাও হেডগেওয়ার কোন্ মানসিকতা এবং কোন্ অভিপ্রায় নিয়ে ১৯২৫ সালে বিজয়ার দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকর, 'উই আর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' গ্রন্থে মুসলমানদের অধিকার বঞ্চিত করার এবং উৎখাত করার যে অযৌক্তিক, অমানবিক এবং সন্ত্রাসী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওরা যেসব তাণ্ডব, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সেসব বিবরণ যদি দেখি তাহলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, ১৯৪৫-এর ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে এবং ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যার মতো অমুসলিম প্রধান প্রদেশগুলো মুসলিম আসনে সংখ্যালঘু মুসলমানরা কেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির চার মাস পর ১৯৪৭-এর ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর করাচীতে কায়েদ-ই-মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের আহবানে এবং কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের শেষ অধিবেশনে উপস্থিত তিন শ' প্রতিনিধির মধ্যে এক শ' ষাট জন প্রতিনিধি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ (ভারত থেকে এসে) এভাবে ভাগ করে নিয়ে আবার ভারতেই বসবাসের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা আসলে স্পষ্টতই এই যে, মনুসংহিতার সমাজের আরেক রকমের শোষণ, বঞ্চনা এবং নির্যাতনের মুখেও ভারতের মুসলমানরা যেমন ভারতেই বাস করতে চেয়েছেন, তেমনি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের পরামর্শ মোতাবেক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার যখন মনুসংহিতার সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্টিমরোলারের নীচে চাপা পড়ার হাত থেকে কিছু মুসলমানকে নিস্তার পেতে দিল তখন ভারতীয় মুসলমানরা কিছু মুসলমানের এই মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারটিতে আপত্তি জানানোরও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পায়নি। এখন যেমন কাশ্মীর স্বাধীন হওয়ার কিংবা

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়ার মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের কোন স্বার্থ না থাকলেও ভারতীয় মুসলমানদের তরফে এই ব্যাপারটিতে কেবল নীরব থাকাই সম্ভব। ভারতীয় মুসলমানদের জায়গায় ভারতীয় হিন্দুরা নিজেদের রেখে চিন্তা করলে ভারতীয় মুসলমানদের ভূমিকার যৌক্তিকতাটা সহজে উপলব্ধি করতে পারতেন।

ভারতের কোনো মুসলমান কখনও কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগ দেননি। তারা কেউ ওসামা বিন লাদেনের মোজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেননি। তারা পূর্বাপর সব সময় সব বিষয়েই একটা পরিমিতিবোধ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

অজস্র নথিতথ্য দিয়ে দেখানো যায়, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থান চাইলে উপমহাদেশে কখনো ভাগ হতো না।

আমি রবীন্দ্রনাথের কথা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে কিছু কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়েছি।

তিনি কার্যত তাঁর সময়ে একজন সমাজপতি ছিলেন। শান্তি-নিকেতনে তাঁর কাছে আসতেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, হিন্দু মহাসভার নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

তিনি সাম্য ও সহাবস্থান চাইলে উপমহাদেশের পরিস্থিতি হয়তো অন্যকরম হতে পারত।

মূলত অর্থনৈতিক স্তরের কারণে নজরুল তাঁর নিজের সমাজেও কোন সমাজপতি ছিলেন না। তিনি কাজ করেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গণমানুষের মধ্যে। "খালেদ আজি ধরিয়াছে অসি'/অর্জুন ছোঁড়ে বাণ", এ কথা বলে তিনি হিন্দু ও মুসলমান গণমানুষকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সহাবস্থানের মানসিকতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এক জাতিতত্ত্ব এবং শুদ্ধি আন্দোলনের ধারণা নিয়ে আছেন মনুসংহিতার সমাজের যে সমাজপতিরা তারা সেটা গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বাহুল্য বলেই বিবেচনা করেছেন।

তবু নজরুলের সাম্য ও সহাবস্থানের আহ্বানগুলো থাকছে বর্তমান এবং আগামীদিনের মানুষদের জন্যই। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের দূতক্রীড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু গৌরব-পাণ্ডবের সমস্যার সমাধান শকুনির দূতক্রীড়ায় হয়নি। সে সমাধান হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্মশানের শান্তিতে।

কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য হতে পারে না।

নজরুলের সৃষ্টিতে সাম্য ও সহাবস্থানের কথা অনেক জায়গাতেই আছে। এই উভয়ই ছিল তাঁর জীবন ও সৃষ্টির লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৫ এপ্রিল ১৯৪১ (২২ চৈত্র ১৩৪৭ ঃ ৭ রবিউল আউয়াল ১৩৬০) তারিখ শনিবার অন্নপূর্ণা পূজার দিন এবং এর পরদিন ৬ এপ্রিল ১৯৪১ তারিখ রবিবার কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবন ও সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পর্কে যা বলেন, সেখানে এই সাম্য ও সহাবস্থানের কথাটাই আছে ঃ

"আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব— অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে— এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম— অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম— আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।'

সাম্যবাদী আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে আট বছর যাবৎ ব্যাপক প্রয়াস চালানোর কথা উল্লেখ করে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর চিঠির উত্তরে পৌষ ১৩৩৪ (ডিসেম্বর ১৯২৭- জানুয়ারি ১৯২৮)-এর "সওগাত"-এর কবি লেখেন ঃ

"এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি— লিখেছি, বলেছি, চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি।"

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর চিঠির জবাবে লেখা এই চিঠিতেই হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথাটাও আছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভেতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।"

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে মহালয়া, ১৪০৫-এ প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত "শত কথায় নজরুল" গ্রন্থে "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" শিরোনামে স্মৃতিকথায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন ঃ

"ইসলামী শাস্ত্র ও হিন্দু শাস্ত্র তিনি যে কত পড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। একদিন মনে আছে বেতার অফিসে আমরা দু'জনে বসে আছি— বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কেউ বেরুতে পারছি না; তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। ঠিক দুটি ঘন্টা নজরুল আমাদের শাস্ত্র ও অধ্যাত্মমার্গের এত কথা বলতে শুরু করলেন যে, বিস্ময়ের অবধি রইল না। বোধহয় এই কারণে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক ভাব কখনও প্রশ্রয় পায়নি।...সত্য আবিষ্কার ও সত্যকে জীবনে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর ব্রত— সে সত্য ইসলামের হোক, ক্রিশ্চানের হোক কিংবা হিন্দুর হোক তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সব জিনিস বুঝবো এই ছিল তাঁর মনোভাব।"

সব কিছু জানবার এবং বুঝবার আগ্রহ ছিল বলেই তিনি কেবল বাঙ্‌লা এবং ইংরেজি নয়, একদিকে সংস্কৃত ও হিন্দী এবং অন্যদিকে আরবি, ফার্সি, উর্দু, মোট এই সাতটা ভাষার ওপর দখল অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বাঙ্‌লা এবং ইংরেজি আর সংস্কৃত ও হিন্দী। তিনি জানতেন এই চারটি ভাষা। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাকে।

সে যা-ই হোক, নজরুলের ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার মধ্যেও কাজ করেছে সহাবস্থানের চিন্তা। তাই একদিকে কীর্তন, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত এবং অন্যদিকে হামদ, না'ত লেখা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পুরাণ—এসব কিছুই সহাবস্থানের নীতিকে কেবল নজরুলের পক্ষেই ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে কিংবা বিশ্ব সাহিত্যে অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি।

ঔদার্যে, মহত্ত্বে এবং ব্যক্তিত্বের বিশালত্বে নজরুল ছিলেন এমনই এক পরিপূর্ণ মানুষ, এমনই এক অনন্য সাধারণ মানুষ। আর্থ সামাজিক সহাবস্থান কামনা, আর্থ সামাজিক সাম্য ও সুবিচার কামনা তাঁর মতো মানুষের পক্ষেই ছিল স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

হেলাফেলার শিকার এখন নজরুল সঙ্গীত

।। এক ।।

২০ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের একঘেয়েমির দোষ রবীন্দ্রনাথের নয়', এই শিরোনামে সোমনাথ রায়ের একটা চিঠি ছাপা হয়েছিল। হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে শিবনাথ খাঁ এই চিঠি প্রসঙ্গে ১২ জুন ১৯৯৯ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন ঃ

"সোমনাথ রায়ের একথা মনে হয়েছে যে, সুধীর চক্রবর্তী তাঁর লেখাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতকেই প্রধান বলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রহসন সবকিছুই তাঁর সঙ্গীতের চেয়ে নিকৃষ্ট। এটি বিতর্কের বিষয়— তবুও রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি লোক গ্রহণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।...

... আবু সয়ীদ আয়ুবের মত মান্যতাসম্পন্ন শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যখন তাঁর বইতে লিখেছেন, "বহুবিচিত্র সৃষ্টি ক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি সবচেয়ে মূল্যবান এবং কালজয়ী জ্ঞান করি।" তখন এই রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূল্য অনেক বেড়ে যায়।...

১৯৪৬ সালে প্রমথ নাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইতে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বলিতেন শেষ পর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিকিবে।"...

অনুরূপ উক্তি নজরুল ইসলামেও দেখি।

১৯৩৮ সালে জনসাহিত্য সংসদের ভাষণে নজরুল ইসলাম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই; তবে এইটুকু মনে আছে, সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

আমি নজরুলের সঙ্গীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও যে উল্লেখ করলাম সেটা এই কারণে যে, নজরুলের এই উক্তির ফলে তাঁর অন্যান্য অবদানকে কেউ কেউ অযথা খাটো করে দেখার চেষ্টা করেন। অবশ্য সঙ্গীতেও তাঁর অপরিসীম ও অনন্য সাধারণ অবদানকে কেউ কেউ তেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চান না।

আমি স্পষ্টতই উপলব্ধি করি, বিশেষত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের কথা থাকায়, অকৃত্রিমভাবে গণমানুষের কথা থাকায়, সমসাময়িক উপমহাদেশ ও আন্তর্জাতিক আঙিনার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগঠন, অর্থনীতি এবং রাজনীতির অজস্র প্রাণবন্ত ছবি থাকায় তাঁর কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, চিঠিপত্র ইত্যাদিও চিরদিন স্মরণীয় ও চর্চার বিষয় হয়ে থাকবে। এটা নিশ্চিত।

www.pathagar.com

তবে এটাও ঠিক যে, সঙ্গীতের সাধনা তিনি যেভাবে করেছেন অন্তত উপমহাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় আর কেউ তেমনটা করেননি।

।। দুই ।।

সাঙ্গীতিক পরিচয়ে নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অনেক সুর ও তালের স্রষ্টা, ছান্দসিক, গীতিনাট্য রচয়িতা, সঙ্গীত পরিচালক, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, এরকম সঙ্গীতের সমস্ত বিভাগের ও অঙ্গের সব কিছুই।

গীতিকার ও সুরকার নজরুল আর কবি নজরুল, এই দুই সত্তা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবির এই দুটো সত্তা, একত্রিত করে দেখলে তবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৃত্তটা পূর্ণাঙ্গরূপে পুরোপুরি দেখা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টর শহীদুল্লাহ' স্মারক বক্তৃতামালায় সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যাখ্যাকার নারায়ণ চৌধুরী বলেছিলেন যে, 'নজরুলও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন।'

চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী থেকে ১ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত "নজরুল গীতি আলোচনা" গ্রন্থে 'কাজী নজরুল ও তাঁর রাগ-রাগিণী' শীর্ষক নিবন্ধে সুকুমার মিত্র লিখেছেন যে, "কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সঙ্গীত জগতের একজন পূর্ণ সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি শুধু যে দুর্লভ স্বীকৃতি লাভ করেছে তাই নয়, আজ তার নতুন করে মূল্যায়নের সময় এসেছে।"

উপরোক্ত গ্রন্থে 'নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন, "সঙ্গীতের মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন; সেক্ষেত্রে নজরুলের যে অনন্য অবদান রয়েছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি।"

ওই একই গ্রন্থে 'সহজাত সঙ্গীত প্রতিভাধর' শীর্ষক নিবন্ধে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "পুরানো অপ্রচলিত রাগকে তিনি পুনরায় উদ্ধার করে 'হারামণি' নামে প্রচার করেন। তাঁর গানের মূল্যায়ন কিছু কিছু গুণী শিল্পী করেছেন অতীতে। এত কিছু কবি আমাদের দেয়া সত্ত্বেও তাঁর গানের ও কবিত্বের পূর্ণ মূল্যায়ন আজও হয়নি। তাই তাঁর মূক অবস্থা প্রাপ্তির পরে তাঁর ভাল চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়নি। তাঁর ছিল না কোন পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী, তাই তাঁর জন্য কেউ মাথা ঘামায়নি।"

ওই গ্রন্থে 'সহজাত সঙ্গীত প্রতিভাধর' শীর্ষক নিবন্ধে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ "নজরুলকে বুঝতে হলে, তাঁর মূল্যায়ন করতে হলে চাই সঙ্গীতজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক।" তিনি চেয়েছেন "সুরের সাথে কথা কেমন 'দোসর' হয়েছে তা বুঝবার ক্ষমতা যাদের আছে নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনা করার অধিকারী কেবল তারাই।"

নজরুল সান্নিধ্যধন্য শিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র তাঁর কাজীদার গান সম্পর্কে লিখেছেন যে, "সেগুলির প্রচারের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুরের যথার্থতা রক্ষা করতে হবে। তা না হলে কাজীদার গান বলে তো বুঝতে পারা যাবে না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হবে তাঁর গানকে তাঁর সুরে গেয়ে প্রচার করলে। তা না হলে তাঁর

www.pathagar.com

অসম্মান করা হবে বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা আমি বলতে চাই, তাঁর গানকে নজরুল গীতি না বলে নজরুল সঙ্গীত বলতে আপত্তি কোথায়?"

আলোচক যিনিই হন না কেন, আলোচ্য বিষয়ের প্রতি তাঁর একটা কমিটমেন্ট বা দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। আলোচকের অন্যতম দায়িত্ব হ'লো আলোচ্য বিষয়টিকে একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা; বিষয়টির ভাল দিকগুলো, তারিফযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরা এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাজগুলোর কথাও এড়িয়ে না গিয়ে উল্লেখ করা। ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এখানে সেই দায়িত্বটুকুও যথার্থ পালন করেছেন।

তদুপরি দেখছি একজন উপযুক্ত আলোচকের দায়িত্বভার নেয়ার পর তিনি কারো মুখ চেয়ে লেখেননি। ফলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানকে গ্রন্থটির খোদ সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত যেখানে গ্রন্থের শিরোনামেই 'নজরুল গীতি' বলেছেন, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র সেখানে সরাসরিই প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "নজরুল সঙ্গীত বলতে আপত্তি কোথায়?"

এই নজরুল সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর কাজীদার গানের সুরের শুদ্ধতা বজায় রাখার তাগিদও অনুভব করেছেন।

এই উভয় লক্ষ্যেই তিনি বলেছেন, "তাঁর অল্প কয়েক বছরের সঙ্গীত চর্চায় যে বিশাল ভাণ্ডার তিনি রেখে গেছেন তার চর্চা করা প্রয়োজন। পুরানো record বাজানোর ব্যবস্থা করা দরকার রেডিও, টিভির মাধ্যমে। আলোচনা করারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ চাই।"

নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুরের শুদ্ধতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সেন্সর বোর্ড গঠনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথাও লিখেছেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। তাঁর উক্তি ঃ

"Censor Board গঠনে আগ্রহী হতে হবে সকল নজরুল ভক্ত ও গবেষকবৃন্দকে। প্রচারের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুরের যথার্থতা রক্ষা করতে হবে। তা না হ'লে কাজীদার গান বলে তো বুঝতে পারা যাবে না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন হবে তাঁর গানকে তাঁর সুরে গেয়ে প্রচার করলে। তা না হলে তাঁর অসম্মান করা হবে ব'লে মনে করি।"

'কবি নির্দেশিত গায়কী অনুসরণ করে সঙ্গীত পরিবেশন' করলে যে তাঁর সঙ্গীতের অর্থাৎ নজরুল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্যক উপলব্ধি করা যাবে সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে—

"তাঁর কথা ও সুরের মোহজাল শ্রোতার মনকে মুহূর্তের মধ্যে' 'Veni, Vidi, Vici' (অর্থাৎ এলাম, দেখলাম, জয় করলাম, এইভাবে দখল) করে ফেলতো। অবশ্য আজো তা করছে। কবি নির্দেশিত গায়কী অনুসরণ করে সঙ্গীত পরিবেশন তাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেয়। তিনি বহু গানের সুর শিল্পীর দক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রেখে করতেন।"

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত এবং তাঁদের 'অতি কাছের লোক' "কাজীদা" (কাজী নজরুল ইসলাম), এই স্বনামধন্য পাঁচজন যে একাধারে কবি, গীতি রচয়িতা, সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন এবং এঁরা যে কথা ও সুরের যুগল মিলন ঘটিয়েছেন এবং এঁদের হাতে বিমূর্তরূপ যে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং এঁদের প্রত্যেকেই যে তাঁদের গানে স্বমহিমাকে অর্থাৎ নিজ নিজ মহিমাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, সে উল্লেখ শ্রদ্ধার সাথে করার পরও ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা এভাবে লিখেছেন যে—

"এই কবি পঞ্চকের মধ্যে কাজীদা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর সোনার কাঠি কেবল যে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়েছে তা নয়, ঘুম টুটিয়েছে। তাঁর গানে আছে চমক, যা সকলের মনকে চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের মতো আকৃষ্ট করে। এই সুর ধারা এত আবেগ সঞ্চার করে যে মনে হয় 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। তাঁর গান শোনার পর সুরের রেশ কানের মধ্যে থেকে যায়।... কাজীদা তো সুরের যাদু জানতেন। নিত্য-নতুন সুর ও কথার যাদু তৈরী করতেন।"

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সুরের ওপর একটু বেশি স্ট্রেস্ দিয়ে নজরুল সঙ্গীতের যে ব্যাপারটিকে 'কথা ও সুরের যাদু' বলে অভিহিত করেছেন, 'বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম' শীর্ষক নিবন্ধে কবির গানের অন্তর্গত এই ব্যাপারটিকে কোনো একটি ক্ষেত্রে বাণীর ওপর বেশি জোর দিয়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্র উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটা 'একজটিক মায়াজাল' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"কাজী সাহেব বাংলা গানে কেন যেন একটা 'একজটিক' মায়াজাল বিস্তার করলেন। তিনি বহু সুলিখিত উর্দু, ফার্সি শব্দ এবং কায়দা-কানুন এমন নিপুণভাবে প্রয়োগ করলেন যে, তাতে একটা রোমান্টিক অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হ'লো।...

উৎকৃষ্ট ফার্সি শব্দ বাংলায় প্রয়োগ করেছেন, যাতে সেগুলো খুবই সুখশ্রাব্য হয়।... ভাল উর্দু গজলের প্রয়োগও তাঁর গানে কম নয়। সুরেলা কাব্য গঠনের রীতি ও উর্দু ঢঙ তিনিই প্রথম বাংলার সঙ্গীতে প্রবর্তন করেন।"

বাণী ও সুর, এই উভয় ক্ষেত্রে নজরুলের অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় অবদানকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করে কবির সহযোগী সঙ্গীত শিল্পী এবং প্রথম নজরুল সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাসন্তী বিদ্যা বিথীর প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন সেন পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'সঙ্গীত-স্রষ্টা নজরুল' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"এক কথায় নজরুল ঐ যুগে তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতে বাংলা গীত ধারার দু'কূল প্লাবিত করেন। এ কাজ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র বিপুল সৃষ্টিরাশির ফলে নয়। অফুরান বৈচিত্র্য ও স্বকীয় উৎকর্ষতাই ছিল মূল গুণ।

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুল প্রসাদ-রজনীকান্ত রচিত সঙ্গীত সমৃদ্ধ বাংলা গানের জগতে সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টির স্বাদ এনেছিলেন নজরুল। বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক চেতনা ছিল তাঁর সৃষ্টির মূল উৎস। এই চেতনায় সঞ্জীবিত হয়েছিল সকল ধারার গান, লোক সঙ্গীত থেকে শুরু করে কাব্যগীতি, ভক্তিগীতি, গজল, ঠুমরী পর্যন্ত। এই

www.pathagar.com

সচেতনতায় সম্ভব হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য বিদেশী সুরের আহরণ। বাংলার বুলবুল মেতেছিল আরবী গোলাপের আঘ্রাণে। সঙ্গীতের বাণীতে উন্মেষিত হ'লো নতুন ছন্দ, নতুন শব্দ বিন্যাস, নতুন বাক্‌চিত্র, নতুন গন্ধ ও মেজাজ। বিস্তৃত হ'লো বাংলা গানের জগৎ নজরুল সৃষ্টিতে। কিন্তু সঙ্গীতের কোন প্রচলিত ধারাকেই তিনি উপেক্ষা করেননি। বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তনের প্রতিটি ধারাকেই তিনি সযত্নে বর্ধিত করেছেন।...

স্বদেশী গানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো গজল আর ঠুংরির জোয়ার। এর পেছনে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা। এলো শুধু সুর নয়, প্রচুর নতুন শব্দও বাংলা ভাষায় আমদানী হল।...

লখনউ-প্রবাসী সঙ্গীতকার অতুল প্রসাদ সেন ঠুমরী, গজলের চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন সীমিত পরিসরে, বাংলা গানে তা প্রস্ফুটিত হয়ে পূর্ণতা পেল নজরুলের সৃষ্টিতে।

দিলীপকুমার রায়ের লেখায় জেনেছি কাজী সাহেবের 'আমারে চোখ ইশারায়' গানে উৎসাহিত হয়ে তিনি অনুরোধ করায় অগ্রজ কবি অতুল প্রসাদ রচনা করেন 'জল বলে চল্' গানটি। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা গানে সার্থক ঠুমরী, গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি রচনা নজরুলের অবিনশ্বর সৃষ্টি।

তিনি এই একই শ্রেণীর গানে ভৈরবী, পিলু, খাম্বাজ, কাফি, দুর্গা, মান্দ, আশাবরী, যোগিয়া, মুলতানী, সিন্ধু, কালাংড়া প্রভৃতি রাগ-রাগিণী ও দাদরা, কাহারবা, যৎ, লাউনী, একতাল, কাওয়ালী, আন্দাকাওয়ালী, তেওড়া প্রভৃতি বিভিন্ন তাল ব্যবহার করেছেন। দ্রুপদাঙ্গ গান রচনায় নজরুলের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে আমরা 'জয় নারায়ণ অনন্তরূপধারী', 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', 'কে শিব সুন্দর', 'হে প্রবল দর্পহারী', প্রভৃতি সার্থক রচনা পেয়েছি। তালিকার প্রথম ও শেষ গান দুটি রেকর্ডে গেয়েছিলেন ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া ললিত মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুলের জীবনে সবচেয়ে লক্ষণীয় হ'লো রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা। রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ ও ব্যবহারে নজরুল তাঁর অনুপম সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তাদের প্রয়োগ রীতিতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি কোথাও না লঙ্ঘন করে তিনি মহত্ত্বর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পূরবী, বেহাগ বা জয়-জয়ন্তী, যে কোন রাগের ক্ষেত্রেই তার চলন, পরত, সুরবিস্তার প্রভৃতি পালন করেছেন। শিল্পী মনের নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি প্রচলিত রাগ-রাগিণীর রূপান্তর না ঘটিয়ে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। নজরুলকৃত নবরাগমালিকা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত এবং তিনি সেগুলোর যাবতীয় পরিচয় প্রদান করে গেছেন। দু'তিনটি প্রচলিত রাগকে যে মুন্সিয়ানায় মিশ্রিত করে তিনি নতুন সুরের মেজাজ সৃষ্টি করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান'— বেহাগ ও বসন্তের মিশ্রণে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কয়েক হাজার নজরুল সঙ্গীতে শতাধিক রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। প্রচলিত, লুপ্ত প্রায় এবং স্বীকৃত রাগ-রাগিণীর অঞ্জলিতে তিনি সাজিয়েছেন দেবী সুরেশ্বরীর বরণডালা। এ এক বিস্ময়কর নজির। রাগভিত্তিক বেশ কিছু নজরুল সঙ্গীত বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।"

উক্ত গ্রন্থে "বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম" শীর্ষক নিবন্ধে রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন ঃ

"নজরুলের অভ্যুত্থান ছিল কবিরূপে এবং সাহিত্যিক সমাজেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। গান তাঁর স্বভাবের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল এবং যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই গান গাইতেন অসঙ্কোচে। তাঁর গাইবার ভঙ্গী ছিল বলিষ্ঠ, কিন্তু তাতে মণপ্রাণ এমনভাবে ঢেলে দিতেন যে, একটা চমৎকার আকূতি ফুটে উঠতো তাঁর সমস্ত গানের অন্তরস্থল থেকে। এটাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সুন্দরতম নিদর্শন।... গানের এই পুরুষোচিত ভঙ্গীটি আজ দুর্লভ।...

বিদ্রোহী কবি কিন্তু সঙ্গীতবিদ্রোহী ছিলেন না। ট্রেডিশনের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। সঙ্গীত রচনার রীতি-নীতির দিক থেকে তিনি কন্‌জার্ভেটিভ, কিন্তু নতুন নতুন আইডিয়া তাঁর মাথায় খেলত নিরন্তর। তথাপি যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে আমাদের চিরন্তন সঙ্গীত ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। শ্রোতারা তাঁর গানে নতুনকে পেয়েছেন চিরায়ত সঙ্গীতের মাধ্যমে, তাই তিনি জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হতে পেরেছেন। শেষ জীবনে বহু বিচিত্র রাগে তিনি সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছিলেন।..."

সঙ্গীতে নজরুল যে তাঁর প্রতিশ্রুতিকেই সফল করেছেন, কেবল তাই-ই নয়, অজস্র সম্ভাবনারও ইঙ্গিত রেখে গেছেন, সে উল্লেখ করে রাজ্যেশ্বর মিত্রের যথার্থ মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য ঃ

"আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি নজরুল সঙ্গীত জগতে কত অসামান্যভাবে আমাদের কত প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যা মেটেনি, তিনি ছিলেন তার পরিপূরক। আবার তিনি স্বয়ং কত প্রতিশ্রুতিকে সফল করেছেন এবং কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত রেখে গেছেন, যা ভবিষ্যতের প্রতিভা এসে পূরণ করতে সমর্থ হবে। তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি সঙ্গীতে ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেননি এবং নতুনকেও আহবান করেছেন— কিন্তু ভারসাম্যকে একটুকু বিচ্যুত হতে দেননি।"

পূর্বোক্ত গ্রন্থে "নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে" শীর্ষক নিবন্ধে নরায়ণ চৌধুরী অত্যন্ত সঙ্গত কারণে কিঞ্চিৎ আক্ষেপের সাথে লিখেছেন,

"ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে যে, নজরুল ইসলামের গানের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং যারা এসব সাংস্কৃতিক জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা বাধ্য হয়েছেন এই জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবী— যা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে— তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।... আজকে জনরুচির জনদাবীর চাপে পড়ে এরা বাধ্য হয়েছেন নজরুলকে তাঁর স্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিতে।...অভিজাত মহল— সাংস্কৃতিক যে সমস্ত

www.pathagar.com

কৌলীন্যবাদী মহল রবীন্দ্র সঙ্গীতে অত্যন্ত রবরবা—সে সব মহল নজরুলকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিল—নজরুল সম্পর্কে, তাঁর কাব্য সম্পর্কে, এমনকি সঙ্গীত সম্পর্কেও। কিন্তু যেহেতু নজরুল কাব্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন সুরের প্রবর্তক, বাংলা কবিতায় তিনি সাম্যবাদের প্রথম উদগাতা—সাম্যবাদী আদর্শ বা চিন্তা-চেতনার উদগাতা, আর এই কালটি যেহেতু সাম্যবাদের কাল, সমাজতন্ত্রের কাল—সমাজতন্ত্রই হচ্ছে এ যুগের সবচাইতে প্রবহমান আদর্শ এবং শ্রদ্ধেয় আদর্শ—এই কারণে নজরুলকে এড়িয়ে যাওয়ার তো উপায় নেই।"

নিজে একজন মার্ক্সবাদী হয়েও নারায়ণ চৌধুরী এখানে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের বিলম্বিত ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে এই নিবন্ধেও তিনি ১৯৭৭-এর জুনে এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত 'কাজী নজরুলের গান' গ্রন্থে এবং ৭৪, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১১০০, এই ঠিকানাস্থিত মুক্তধারা থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০-এ প্রকাশিত 'নজরুল চর্চা' গ্রন্থে যেমন, ঠিক তেমনি এখানেও সুরের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের মূল ধারার নিরিখে নজরুল সঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"তাঁর সুরের বিচার করতে এসেছি।... সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরই হচ্ছে মূল বিচার্য, কথা নয়।... কথার স্থান গৌণ। ... হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে—রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। বাণীর তেমন গুরুত্ব নেই এবং কোনো কোনো খেয়াল গান আছে— যাতে বাণী মাত্র একটি কি দুটি কথায় সীমিত। কোনো কোনো খেয়াল গানে বাণী অস্থায়ীতেই সীমিত।... টপ্পা গানে অস্থায়ী থেকে অন্তরা। কেননা, তারা জানেন, তারা ধ'রেই নিয়েছেন যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুর পরিবেশন করাটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য।....

ভারতীয় সঙ্গীতের যেটা আদর্শ, সেটাতে সুরই হচ্ছে মুখ্য, সুরই হচ্ছে শ্রেয়, সুরই হচ্ছে প্রধান বিচার্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, বাংলা গানের ক্ষেত্রে এই আদর্শ সবচাইতে সার্থকভাবে কেউ যদি অনুসরণ করে থাকেন তবে তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম।... সুরকে বিকশিত হয়ে বিকাশ লাভের জন্য তার একটা অবলম্বন দরকার—সে অবলম্বনের নাম হচ্ছে সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক বাণী, কথা...।

সুরকেই আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে।.....

ভারতীয় সঙ্গীতে যেটা মূল লক্ষ্য.... কথা সেখানে মুখ্য নয়...

শিল্পী তাঁর নিজ খেয়াল-খুশী অনুসারেই তাঁর প্রাণের চাহিদা অনুযায়ী, প্রাণের পরিকল্পনা বা কল্পনা অনুযায়ী, নিজের অভিপ্রায় মতো, অভিরুচি অনুযায়ী, সুরকে খেলাবেন অবশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে— সেই গণ্ডীর বাইরে গেলে সেটা আদর্শ ভ্রষ্ট হয়— সে স্বাধীনতা নেই। কিন্তু এটুকু সীমাবদ্ধ মেনে নেয়ার পর অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে।

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গীত রচনায়— ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের এই যে মৌলিক আদর্শ, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।... এই সুর বিকাশের স্বাধীনতা। ইংরেজীতে বললে বলতে হয় freedom of improvisation। এটা নজরুলের গানে একেবারে ভরপুর হয়ে আছে; এটা হচ্ছে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় সঙ্গীতে— সেখানে Composer-ই হচ্ছেন প্রধান। সেখানে শিল্পী বা Executor হচ্ছেন কাব্য গানের অধ্যাপক। শিল্পীর ভূমিকা গৌণ।... পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে শিল্পীর ভূমিকাই প্রধান।...

রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরকারই হচ্ছেন মুখ্য, গীতিকারই হচ্ছে মুখ্য, শিল্পী সেখানে গৌণ, সেখানে শিল্পীর হাত-পা বাঁধা।... সেজন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত জগতে খুব বড় ধরনের শিল্পী কেউ নেই।...

..কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে যে প্রতিভার তারতম্য— শক্তির যে পার্থক্য সেটা নির্মিত হয় তাদের কণ্ঠ সঙ্গীতের গুণাগুণের ধারায়। কে ভাল কণ্ঠের অধিকারী– কে সুমিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী, কে সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী— সেখানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়— যারা প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীতকার— তাঁদের গুণাগুণ নির্ণয়ের মূল নিরিখ হচ্ছে তাঁদের কণ্ঠ সম্পদ।...এর বাইরে...স্বাধীনতার মানদণ্ডে তাঁরা কোথায় দাঁড়ান?"

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আমার গলায় কাজ আসতো না তো তাই রবীন্দ্র সঙ্গীত করতাম।'

নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য এই যে, নজরুল সঙ্গীত রাগ বিধৃত গান। রাগের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এর কাঠামো। এর ইমারতটা দাঁড়িয়ে আছে রাগের বনিয়াদের ওপর। সেই জন্য এই গানের সুরের আবর্তন অপ্রতিরোধ্য।

প্রকৃত সঙ্গীত, জনমনহারী সঙ্গীত হতে হলে গানকে অবশ্যই রাগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

নজরুল যে নানান খানে নানা ওস্তাদের কাছে খুব প্রণালীবদ্ধভাবে রাগ সঙ্গীতের চর্চা করেছেন সে বিবরণও তিনি দিয়েছেন। কবি যে প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যেতেন এবং সেখানে থেকে ওস্তাদ কাদের বখশের কাছে যে সমস্ত অপ্রচলিত, লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর তালিম নিয়ে আসতেন। এসব কথা উল্লেখ করে তাঁর উক্তি ঃ "প্রতিভা দিয়ে সবকিছু হয় না। প্রতিভার সঙ্গে অনুশীলন চাই। প্রণালীবদ্ধ যে চর্চা বা অনুশীলন সেটা না হলে বেশিদূর এগোনো যায় না।"

নজরুল সঙ্গীতের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন নারায়ণ চৌধুরী যে দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন কবির সুস্থাবস্থায়, কবি যখন প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন সে সময় শ্রাবণ ১৩৩৬-এ 'আজ কালকার গান' শীর্ষক নিবন্ধে সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যায় সঙ্গীত তাত্ত্বিকতার অপব্যাখ্যা করে নজরুলের সঙ্গীত অবদানকে নিছক খাটো করে দেখানোর জন্য

www.pathagar.com

অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যা লেখেন তার জবাবে উক্ত পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৬-এর সংখ্যায় কবির শিল্পীবন্ধু নলিনীকান্ত সরকার নজরুল সঙ্গীতের তারিফটা অন্যদিক দিয়ে করেছিলেন। কবির সুহৃদ নলিনীকান্ত সরকার মূলত রস বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল সঙ্গীত সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

"বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। বাঙালী শুধু সুর ও তালের বিশ্লেষণকে মুখ্য করে কোন সঙ্গীতকে আজ পর্যন্ত নেয়নি। সুর-লয়ের সঙ্গে বাঙালী চায় ইমোশনপূর্ণ কথা। আর চায় সেই কথার সঙ্গে সুর-লয়ের ভাব সম্মিলন। কবি নজরুল ইসলামের গানকে বাঙালী এই হিসাবেই কণ্ঠাভরণ করে নিচ্ছে।...

সঙ্গীত অর্জন ও বর্জনের জন্য বাঙালী নিছক রস বিচার করে থাকে, এইখানেই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। তাই বলে বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতকে বাঙালী তাচ্ছিল্য করে না, বরং সে সঙ্গীতের হিসেব নিকেশের চাতুর্য দেখে তারিফও করে, বাহবাও দেয়; কিন্তু সে বস্তুকে সে গ্রহণ করতে পারে না। তারিফ করে তার হিসেব-নিকেশী বুদ্ধি, আর গ্রহণ করে তার রস পিপাসু প্রাণ। এই প্রাণপুটেই নজরুল ইসলামের গানকে বুদ্ধিমান বাঙালী আগ্রহে গ্রহণ করেছে।

নজরুল ইসলামের গানের সম্বন্ধে ধূর্জটি বলেছেন— "এ বৎসর কলকাতায় এসে দেখ্‌ছি যে, কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে।"

ধূর্জটি বাবু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তিনি প্রবন্ধটি লিখতে যে সময় নষ্ট করেছেন, তার চাইতে অল্প সময় খরচ করে যদি ভেবে দেখতেন যে, 'কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে' কেন, তাহলে হয়ত তার আর প্রবন্ধটি লিখবারই প্রয়োজন হত না। বাঙালী 'শুনতে ভাল লাগার' দিক দিয়েই মুখ্যত গানের বিচার করে থাকে। শ্রেণীর উচ্চতা পরিমাপের ভার তারা পরিমাপক শ্রেণীর ব্যক্তির ওপরে ছেড়ে দিয়ে 'খুব বেশি মূল্য' দিয়েই কবি নজরুলের গান নিয়েছে। দেশ ভরা আগ্রহ না থাকলে এ গান 'দেশ ছেয়ে' ফেলতো না। এই আকুল আগ্রহই তাঁর গানের মূল্য।

আমার মনে হয়, ধূর্জটি প্রসাদ কবি নজরুলের গানের প্রতি অবিচার করেছেন। ধূর্জটি প্রসাদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলাপে, বহু সঙ্গীতের বৈঠকে তাঁর সঙ্গীত তাত্ত্বিকতার পরিচয় পেয়েছি। নজরুল ইসলামের গান সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগপূর্ণ অভিমত কোন দিন ধূর্জটি বাবুর কাছ থেকে শুনতে পাইনি। তাঁর এ মনোভাব হঠাৎ কেন বুঝতে পারলাম না।"

আমি এ যাবৎ যাদের নজরুল সঙ্গীত বিষয় আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক মূল্যায়নধর্মী বলে মনে করেছি, কেবল তাদেরই বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। তবে এঁদের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ চৌধুরী ব্যতীত আর কেউ নজরুল সঙ্গীত বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে এঁরা প্রত্যেকেই নজরুল সঙ্গীতের ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করার ব্যাপারে অবশ্যই যোগ্য ব্যক্তি।

জুন ১৯৭৭-এ এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, এই ঠিকানা থেকে "কাজী নজরুলের গান" শিরোনামে

www.pathagar.com

প্রকাশিত নারায়ণ চৌধুরীর নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনা বিষয়ক গ্রন্থটি আমার কাছে খুব প্রিয়, প্রয়োজনীয় এবং সঠিক মূল্যায়নধর্মী বলে মনে হয়েছে। নজরুলের গানকে তিনি সঙ্গীতের তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে খান খান করে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

"কাজী নজরুল ইসলাম গীতিকার ও সুরকার হিসাবে অসাধারণ প্রতিভাশালী স্রষ্টা ছিলেন—এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু যে কথাটা ব্যাপকভাবে পরিজ্ঞাত নয় তা হ'লো, সঙ্গীতের নিজস্ব ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র বাংলার আঞ্চলিক বা দেশজ বা লৌকিক সুরের ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করেননি, যাকে বলা যায় হিন্দুস্থানী বা উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের ধারা, তার পদ্ধতি প্রকরণের সঙ্গেও তিনি বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় ক্লাসিকাল বা মার্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল।

অপরের যেখানে একটা শিক্ষা আয়ত্ত করতে অনেককাল স্থায়ী বিধিবদ্ধ প্রস্তুতি ও চর্চার প্রয়োজন হয়, প্রতিভাশালীর পক্ষে স্বল্পকালের মধ্যেই তাকে আয়ত্তগম্য করে তোলা তেমন কঠিন হয় না। জ্ঞানীর যেমন তৃতীয় নয়ন, তেমনি প্রতিভাশালীর এই Sixth sense বা ষষ্ঠেন্দ্রিয়। এই বাড়তি ইন্দ্রিয়টির প্রভাবে প্রতিভাশালী কবি ও সুরস্রষ্টা নজরুল ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর ঐতিহ্যকে সহজেই অন্তরস্থ করে নিতে পেরেছিলেন।'

ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সংখ্যা সহস্রাধিক। সেই সঙ্গে স্বরের পারম্যুটেশন-কম্বিনেশন অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন বা চালাচালির দ্বারা আরও কয়েক সহস্র রাগ-রাগিণী অনায়াসে সৃষ্টি করা যায়। নজরুল নিজেও কয়েকটি নয়া রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিভার যাদুর দ্বারা ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের মর্মবস্তুটিকে সম্পূর্ণ অধিগত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "নজরুল সঙ্গীত আগাগোড়া সুরের যাদুতে অনুলিপ্ত। তার পাকে পাকে সুরের সম্মোহন— মেলডির মাদকতা।"

অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ধ্রুপদের আদর্শে গঠিত। ধ্রুপদাঙ্গের অনবদ্য অনেক গান নজরুলেরও আছে। তবে নজরুল সঙ্গীতের সিংহভাগটা ধ্রুপদাঙ্গের নয় কিংবা দ্রুপদের আদর্শেও গঠিত নয়। নজরুল সঙ্গীতের অধিকাংশই খেয়াল-টপ্পা-ঠুমরী প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় মুসলমানী সঙ্গীতের আদর্শে গঠিত।

।। তিন ।।

সঙ্গীতে নজরুলের যে বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয় অবদান, পৃথক পৃথকভাবে সেগুলির নানা দিক নিয়ে অনুপুঙ্খ ও বিশদ পর্যালোচনা আজও হয়নি। তবু এই পর্যালোচনা সংক্ষিপ্তাকারে হলেও যারা করেছেন, তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যাদের বক্তব্য বহুলাংশেই যথার্থ মূল্যায়নধর্মী।

সঙ্গীত শাস্ত্রে নজরুলের যে গভীর জ্ঞান ছিল, দখল ছিল, এর প্রস্তুতির দিকটাও কোন গ্রন্থে বা নিবন্ধে সময়ানুক্রমিক বিশদ আলোচিত হয়নি। হলে এ বিষয়েও একটি

www.pathagar.com

পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হতে পারত। এখন এই দিকটার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

দূর সম্পর্কের চাচা মুন্সী বজলে করিম বাংলা গান ও উর্দু গজল লিখতেন এবং গানে সুর দিতেন। ছোট বেলায় কবি তাঁর কাছ থেকে গান লেখা ও সুর দেয়ার কায়দাটা রপ্ত করেছিলেন।

গান রচনা ও সুর দেয়ার তালিম তিনি চুরুলিয়ার লেটো দলের সবচেয়ে নামী পরিচালক শেখ চাকর গোদার কাছেও পেয়েছিলেন। নজরুলের মধ্যে গান রচনার ক্ষমতা, সুরজ্ঞান লক্ষ্য করে এই ওস্তাদই সেদিন আদর করে বলেছিলেন ঃ 'আমার ব্যাঙাচি বড় হলে সাপ হবে।'

মাথরুণ নবীন চন্দ্র ইন্সটিটিউশন ছাড়ার পর কবি লেটো দলে নাচ-গান-অভিনয় শেখাতেন। গান আর পালা লিখে দিয়ে ছড়াকারদের তালিম দিতেন। আসানসোলের কয়লা খনি অঞ্চলে রেল লাইনের ধারে এক বাগানে গান-বাজনার আসরে নজরুলের গানে আকৃষ্ট হয়ে সেদিন মাল গাড়ির গার্ড সাহেব মিস্টার ঘোষ নজরুলকে গান শোনানোর চাকরির কথা বলে তাঁর প্রসাদপুরের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গার্ড সাহেবের স্ত্রী হিরণ প্রভা ঘোষের টেবল হারমোনিয়ামটি নজরুলের কাছে খুব আকর্ষণীয় বস্তু ছিল।

নজরুল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ছাত্র জীবনে শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক সতীশ চন্দ্র কাঞ্চিলালের কাছ থেকে। নজরুল ইসলামকে তিনি মাঝে মাঝে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম ও উপদেশ দিতেন। নজরুল তার কাছ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর, তাল, লয় ইত্যাদি নানান বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছিলেন।

এরপর সৈনিক জীবনে প্রবেশ করেও কবি এক খান সাহেব ওস্তাদের কাছে গান শিখেছেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালে লেখা তাঁর "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", "বাঁধন হারা" এই উপন্যাসগুলোতে নানা রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন তালের এবং বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। "রিক্তের বেদন"-এ দেখছি, কবি তাঁর স্বপ্ন নায়িকাকে বলছেন, 'গান-বাজনা শিখি'। 'খাঁ সাহেবের কাছে।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা "জ্যৈষ্ঠের ঝড়" গ্রন্থে দেখছি, সেনাবাহিনী থেকে ফিরে কবি একটা সময়ে কলকাতায় গজেন ঘোষের আড্ডায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে এসে খালি বৈঠকখানায় দূরে এক কোণে স্তূপীকৃত কাষ্ঠপিণ্ডের মতো পরিত্যক্ত অবস্থায় একটা বোবা, অচল, অর্গান পড়ে থাকতে দেখে গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনড় বীটগুলো এবং অটল পেডালটা এবং অন্যান্য সব কিছুই ঠিকঠাক করে সচল করে দিলেন। বোবা অর্গানটা কথা কয়ে উঠলো। এই সময়ের মধ্যেই সঙ্গীত যন্ত্রের ওপর তাঁর দখল লক্ষ্য করে সঙ্গীতে তাঁর ব্যাপক প্রস্তুতিরও অনুমান পাওয়া যায়।

হুগলীতে থাকাকালে এক ওস্তাদের কাছে কবি সেতার বাজনা শিখেছিলেন।

www.pathagar.com

বাঁশী বাজাতেও কবি পটু ছিলেন। আড় বাঁশী, পিকলু, মোহন বাঁশী, এই তিন রকমের বাঁশীই কবি বাজাতে পারতেন। তবলা, ঢোলক, মাদলও শিখেছিলেন।

বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কেবল বিভিন্ন বিয়ের আসরে নয়, কলকাতার কল্লোল অফিসেও তিনি ঘুঙুর এবং নৃত্যের পোশাক পরে এসে নিখুঁত নেচে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নাচের প্রশিক্ষণও তাঁর নেয়া আছে।

চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী থেকে ১ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত গ্রন্থ "নজরুল গীতি আলোচনা"য় রাজ্যেশ্বর মিত্র 'বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"নজরুল মুর্শিদাবাদের মঞ্জু সাহেবের এবং কলকাতার স্বনামধন্য ঠুংরীর রাজা জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছ থেকে সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন।"

কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত এই "নজরুল গীতি আলোচনা" গ্রন্থে 'নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"নজরুল খুব প্রণালীবদ্ধভাবে রাগ সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। একাধিক ওস্তাদের কাছে তিনি রাগ-চর্চা করেছেন—সেই প্রথম জীবনে ওস্তাদ কাদের বখ্‌শের শিষ্য মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব, পিয়ারু সাহেব—এঁরা সব গজল গাইয়ে ছিলেন। সেই মঞ্জু সাহেব, পিয়ারু সাহেব, এঁদের কাছে তিনি গজল, ঠুমরী, টপ্পা, কাজরী এই হাল্কা Light Classical Music-এর গান—এই গানগুলির ট্রেনিং, অনুশীলন বা চর্চা করেছেন ওঁদের কাছে। তারপর জমির উদ্দীন খাঁ তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ ঠুমরী গায়ক ছিলেন—আমরাই তাঁর গান শুনছি, এই জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে ঠুমরী গান শিক্ষা করেছিলেন। কেবল গজল নয়, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, গজল, দাদরা প্রভৃতি গানেরও সুপণ্ডিত ছিলেন ওস্তাদজী। জীবনের প্রান্তভাগে একটা সময়ে তিনি নিজে সেতারের চর্চা করেছেন। তারপর যখন চুঁচুড়াতে থাকতেন...। এই চুঁচুড়াতে থাকাকালে তিনি নিজে বাঁশী বাজাতেন—সেতার বাজাতেন। তারপর প্রসিদ্ধ ঠুমরী গানের কলাবৎ জমির উদ্দীন খাঁর কাছে তো ঠুমরী গান অনেক দিন, সবচেয়ে বেশি দিন শিখেছেন। গজলের নামকরা শিল্পী ওস্তাদ মস্তান গামার কাছেও গান শিখেছেন। তাঁর কাছে কেবল গজল নয়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তালিম নিয়েছেন কবি।

জীবনের শেষ পর্বে এসে তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কোবিদ ওস্তাদ কাদের বখ্‌শের কাছে তালিম নিতে যেতেন। ওস্তাদ কাদের বখ্‌শের সঞ্চয়ে বহু অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী ছিল। কবি নিয়ম করে প্রতি হপ্তায় কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ওস্তাদ কাদের বখ্‌শের কাছে গিয়ে সে সমস্ত অপ্রচলিত, লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর তালিম নিয়ে আসতেন। ওস্তাদ কাদের বখ্‌শ ছিলেন প্রচলিত ও অপ্রচলিত নানা রাগ-রাগিণীর ভাণ্ডারবিশেষ। এককোশ পরিবারের রাগ-রাগিণীই ছিল তাঁর কাছে ষাট রকমের এবং কানাড়ার ত্রিশ রকমের। নজরুলের 'হারামণি' পর্যায়ের রাগ-রাগিণীর অনেকখানিই ওস্তাদ কাদের বখ্‌শের কাছে পাওয়া।"

www.pathagar.com

হেরা প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪'র ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর "নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী বেদার উদ্দিন আহমদ লিখেছেন যে, ওস্তাদ দবির খাঁ ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছেও নজরুল ইসলাম গানের তালিম নেন। তানসেন ঘরানার ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে ঠুমরী ও গজলে পারদর্শী শিল্পী মঞ্জু সাহেব ও মুস্তান গামা প্রমুখ গায়কদের কাছে কবি যে রাগসঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন, সে কথা কলকাতা থেকে প্রকাশিত "কাজী নজরুলের গান" গ্রন্থে নারায়ণ চৌধুরীও লিখেছেন।

"নজরুল গীতি আলোচনা" গ্রন্থে 'নজরুল গীতির শুদ্ধতার প্রসঙ্গ' শীর্ষক নিবন্ধে নজরুলের শিষ্যপ্রতিম সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"কাজীদাকে বহু স্ট্রাগল করতে হয়েছে। কাজীদা ভাল ভাল লোকের কাছে গান শিখেছেন। জমির উদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে ঠুমরী আর মুর্শিদাবাদের মঞ্জু সাহেবের কাছেও শিখেছেন। এমনকি, বাদল খাঁ সাহেবের কাছেও শিখেছেন।

কাজীদা সঙ্গীত চর্চা অধিক রাতেই করতেন। তিনি রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে চিন্তা করে লিখতে আরম্ভ করতেন এবং তা অনুশীলন করেছেন একা নিভৃত কক্ষে। কাজীদার নিজস্ব ঢং-এ লেখা ও সুর মিলিয়ে কাজীদার লেখা, কাজীদার সুর, এইভাবে যদি আমরা ধরি তাহলে ঠিক নজরুল গীতি বলা যাবে।...বাংলা গান যখন স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল তখনই নজরুল তাঁর বৈচিত্র্যময় সুরগুলো রচনা করতে লাগলেন।"

১৪০৫-এ মহালয়ার দিন ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত "শত কথায় নজরুল" গ্রন্থের 'কাজীদা' শীর্ষক স্মৃতিকথায় ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ

"ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে রাই চাঁদ বড়ালের বাড়িতে 'লাল চাঁদ' উৎসব হত। এ উপলক্ষে সর্বভারতীয় সঙ্গীত গুণীদের সমাগম ঘটত বড়াল বাড়িতে। ফৈয়াজ খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, হরিশ চন্দ্র বালী, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, এনায়েৎ খাঁ, আগ্রার মুস্তারী বাঈ ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের গান শুনতে কাজীদা বড়াল বাড়ি যেতেন, গুণীদের সাথে আলাপ করতেন, আলাদা করে ও নিভৃতেও কিছু গান শুনে নিতেন। লাল চাঁদ উৎসবে গাইতে বা বাজাতে এসে কয়েকজন ওস্তাদ রাই বাবুর দাদা গঙ্গা বাবুর (কিষণ চাঁদ বড়াল) পৃষ্ঠপোষকতায় বড়াল বাড়ির পিছনের অংশে অনেক দিন পর্যন্ত থাকতেন। এভাবে বড়াল বাড়িতে দীর্ঘদিন বাস করেছেন ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন ও আসফাক হোসেন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, মজিদ খাঁ, কেরামত খাঁ এবং আরো কেউ কেউ। আসফাক হোসেন ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার ওস্তাদ। কি চমৎকার যে গাইতেন যারা শুনেছেন তারাই জানেন।...

বড়াল বাড়িতে বাস করার সময় আসফাক হোসেনের কাছে অন্তত দু'জন তালিম নিয়েছেন। তার মধ্যে একজন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অপরজন আমাদের কাজীদা।

www.pathagar.com

নতুন নতুন চীজ্ সংগ্রহ করার জন্য কাজীদা আসফাক হোসেনের কাছে সপ্তাহে দু'দিন দক্ষিণা দিয়ে গান শিখতেন। একদিন ওস্তাদ (আসফাক হোসেন) একটি চমকপ্রদ গান শোনাচ্ছিলেন। শুনেই কাজীদা ওই গানটি শিখতে চাইলেন। ওই গানের সুরে কাজীদা নতুন কিছু পেয়েছিলেন।

ওস্তাদ কিন্তু ওই গানটি শেখাতে রাজি হলেন না। বললেন, কাজী সাহাব, এ তো মেরে ঘরকা খাস চীজ্ হ্যায়, ইয়ে ম্যায় ন্যাহি দে শক্ত্যা।

কাজীদা অনুনয় করতে লাগলেন।

কিন্তু ওস্তাদ নারাজ।

শেষে তিনশ' টাকার বিনিময়ে ওস্তাদ গানটি দিতে রাজি হলেন।

অত টাকা কাজীদার পক্ষে দেয়া সম্ভব হলো না; ওস্তাদও আর ওই গানটি দ্বিতীয়বার শোনালেন না।

কাজীদা কিন্তু একবার শুনেই ওই গানের মধ্যে সুরের বিশিষ্ট চলনটুকু আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন, যা ওস্তাদ কল্পনাও করেননি।

কয়েকদিনের মধ্যেই কাজীদা ওই সুরে একটি গান বাঁধলেন।"

।। চার ।।

যিনি কেবল জনগণের কবি নন, জনগণের গীতিকার-সুরকার, গায়কও ছিলেন, সেই কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতারিখ হল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ মোতাবেক ২৪ মে ১৮৯৯ তারিখে। অতএব, এখন থেকে বছর তিনেক আগে গেলো তাঁর জন্মশতবার্ষিকী।

কবির এই জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের ব্যাপারটা সামনে রেখে আর এতটুকুও বিলম্ব না করে আমাদেরকে যখন সমস্ত বিষয়েই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেয়ার দরকার ছিল তখন নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনার মূল্যায়নও সব দিক দিয়েই একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই হওয়া উচিত ছিল।

নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন যদি আমরা করতে চাই তাহলে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে ঃ

এক, কবি তাঁর সাঙ্গীতিক অবদান রাখার বিষয়ে কোন কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ ধরনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন? প্রণালীবদ্ধভাবে সঙ্গীত চর্চা কবি কতখানি করেছিলেন? কোন কোন ওস্তাদের কাছে কোন কোন সময়ে গান শিখেছিলেন তার সময়ানুক্রমিক বিবরণ?

দুই. কোন্ কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে কবি বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীতের সবগুলো ধারাতেই কোন কোন ধরনের এবং কী কী অবদান রেখেছেন?

তিন. কবির সাঙ্গীতিক অবদানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, পরিপূর্ণ বিবরণটা কি? এবং দেখতে হবে যে এই ছবি, এই অনুপুঙ্ক্ষ পরিচয় আমাদের সামনে উঠে এসেছে কিনা সেটা কি বিশদভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে?

www.pathagar.com

চার. নজরুল জীবন ও সৃষ্টির সব কিছু একটা আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির ওপর রেখে নানা ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবির সাঙ্গীতিক অবদানের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি গানের বাণী, সুর, তাল ইত্যাদি পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্মরূপে খান খান করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা।

পাঁচ, নজরুলের গানগুলোর সময়ানুক্রমিক এবং পরিপূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা!

ছয়, গানগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে পৃথক করে পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে কিনা, যেমন–

(১) ধ্রুপদাঙ্গের গান,
(২) খেয়াল আঙ্গিক গান,
(৩) টপ্পা ও খেয়াল মিশ্রিত গান টপ খেয়াল,
(৪) ঠুমরী গান বা ঠুমরী ভাঙা বাংলা গান,
(৫) বাঈ ঠুমরী,
(৬) টপ্পা গান,
(৭) রাগভিত্তিক বিভিন্ন গানের অর্থাৎ কোন কোন রাগের ভিত্তিতে কী কী গান লিখেছেন, সেগুলোর পৃথক পৃথক তালিকা,
(৮) মিশ্র রাগের গান (অর্থাৎ দুটো বা তিনটে রাগের মিশ্রণে কী কী গান),
(৯) দক্ষিণী বা কর্ণাটী রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে কোন্ কোন্ গান,
(১০) লুপ্ত বা অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর পুনরুজ্জীবনমূলক 'হারামণি' পর্যায়ের গান,
(১১) অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী অবলম্বনে গান,
(১২) স্বসৃষ্ট বা 'নবরাগ' পর্যায়ের গান,
(১৩) (আরবি সুর, কিউবান নৃত্যের সুর ইত্যাদি) বিভিন্ন বিদেশী সুরের আদলে রচিত গানের পৃথক পৃথক তালিকা,
(১৪) লোকসঙ্গীতের সঙ্গে রাগ সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটিয়ে কোন্ কোন্ গান লিখেছেন সেগুলোর তালিকা,
(১৫) লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ঠুমরীর সংমিশ্রণ ঘটিত কোন্ কোন্ গান লিখেছেন, সেগুলোর তালিকা,
(১৬) কীর্তনের সুরের ওপর কোন কোন গান লিখেছেন সেগুলোর তালিকা,
(১৭) স্ব-সৃষ্ট বিভিন্ন তালের ওপর কোন্ কোন্ গান লিখেছেন সেগুলোর সময়ানুক্রমিক তালিকা,
(১৮) তথ্য সংশ্লিষ্ট কী কী গান লিখেছেন সেগুলোর বিষয়ভিত্তিক পৃথক পৃথক তালিকা,
(১৯) কাওয়ালী গানের সময়ানুক্রমিক তালিকা,
(২০) ইসলামী গান (আল্লাহর রাসূলের প্রশংসাসূচক) নাত;
(২১) ইসলামী গান (আল্লাহর প্রশংসাসূচক) হামদ,
(২২) (ইসলামী গান) মর্সিয়া,

www.pathagar.com

(২৩) ইসলামী পুনরুজ্জীবনমূলক গান,
(২৪) (ভক্তিমূলক গান) শ্যামা সঙ্গীত,
(২৫) (ভক্তিমূলক গান) কীর্তন,
(২৬) (ভক্তিমূলক গান) ভজন,
(২৭) (গজল অঙ্গের) প্রেমসঙ্গীত,
(২৮) সাধারণ মানব প্রেমের গান,
(২৯) প্রকৃতি বিষয়ক গান বা ঋতু সঙ্গীত,
(৩০) (লোকসঙ্গীত) ভাটিয়ালি গান,
(৩১) (লোকসঙ্গীত) ভাওয়াইয়া গান,
(৩২) (লোকসঙ্গীত) বাউল অঙ্গের গান,
(৩৩) (নানাবিধ লৌকিক সুর ভঙ্গির গানের অন্তর্গত) সারি গান,
(৩৪) (লোকসঙ্গীত) মুর্শেদী,
(৩৫) (লোকসঙ্গীত) সাম্পানের গান.
(৩৬) (লোকসঙ্গীত) সাঁওতালী গান ঝুমুর,
(৩৭) বারাণসী লোকগীতির সুরে গান,
(৩৮) (লোকসঙ্গীত) কাজরী,
(৩৯) (লোকসঙ্গীত) লাউনী,
(৪০) (লোকসঙ্গীত) হোরী,
(৪১) (লোকসঙ্গীত) ভোজপুরী সুরে গান,
(৪২) শিশু সঙ্গীত,
(৪৩) কোরাস গান,
(৪৪) গণসঙ্গীত,
(৪৫) নৃত্য সঙ্গীত,
(৪৬) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান,
(৪৭) নারী জাগরণের গান,
(৪৮) তরুণ বা ছাত্র দলের গান,
(৪৯) শ্রমিকের গান,
(৫০) কৃষকের গান,
(৫১) ধীবরের গান,
(৫২) দেশাত্মবোধক গান,
(৫৩) মঞ্চ নাটকের গান,
(৫৪) বেতার নাটক এবং বেতার নাটিকার গান,
(৫৫) বেতার গীতিনাট্যের গান,
(৫৬) বেতার গীতি আলেখ্যের গান,
(৫৭) অন্যান্য বিভিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের গান,

www.pathagar.com

(৫৮) রেকর্ড নাটিকার গান,
(৫৯) ছায়াছবির গান,
(৬০) লক্ষণগীতির সময়ানুক্রমিক তালিকা,
(৬১) হিন্দী গানের সময়ানুক্রমিক তালিকা,
(৬২) উর্দু গানের সময়ানুক্রমিক তালিকা,
(৬৩) হাসির গান,
(৬৪) মার্চ সঙ্গীত (বা কুচকাওয়াজের গান),
(৬৫) আনুষ্ঠানিক গান (বিবাহ গীতি, মাঙ্গলিকী),
(৬৬) ডুয়েট গান (দ্বৈত গান),
(৬৭) সমর সঙ্গীত,
(৬৮) ছায়াছবির গান (সামগ্রিকভাবে),
(৬৯) গ্রামাঞ্চলের রেকর্ডের গান (সামগ্রিকভাবে)।

কবি এই সবগুলো গানের কোনটা কখন কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে রচনা করেছিলেন, কবি তখন কোথায় থাকতেন, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, গানের সূত্র, সময়কাল, রাগ পরিচয়, তাল পরিচয়, গায়ক-গায়িকার নাম ইত্যাকার বিবরণসহ সবকিছু লিপিবদ্ধ থাকা দরকার।

এছাড়া অনুরূপ বিবরণসহ সময়ানুক্রমিক পৃথক পৃথক তালিকা প্রণয়ন করে দেখানো দরকার ঃ

(১) কবির (সুস্থাবস্থায়) বিভিন্ন সভা সমিতিতে পরিবেশিত তাঁর গান,

(২) (কবির সুস্থাবস্থায়) বিভিন্ন আড্ডায়, বৈঠকে বা মজলিশে পরিবেশিত তাঁর গান,

(৩) (কবির সুস্থাবস্থায়) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত তাঁর গান,

(৪) কোন কোন মঞ্চ নাটকে কবি কোন কোন গান লিখেছেন এবং নাটকের কোন কোন সিচুয়েশনে কোন কোন শিল্পী সেগুলো পরিবেশন করেছেন, ওই সব কিছুর পৃথক পৃথক তালিকা,

(৫) হিজ মাস্টার্স ভয়েস, টুইন, সেনোলা, মেগাফোন, ব্রড্‌কাস্টিং, দিলরুবা, হিন্দুস্থান, রিগ্যাল, কলম্বিয়া, পাইওনীয়ার, এইসব গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীগুলোতে ঃ

(ক) কবির যেসব গান রেকর্ড হয়েছে রেকর্ড নাম্বারসহ সেগুলোর পৃথক পৃথক সময়ানুক্রমিক তালিকা,

(খ) এই সব গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীগুলোর কোন্ কোন্‌টির সঙ্গে কোন্ কোন্ সময়ে কবি কোন্ কোন্ ধরনের চুক্তিতে কোন্ কোন্ দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন, এই সব কিছুর পৃথক পৃথক সময়ানুক্রমিক বিবরণ,

(গ) বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীতে বিভিন্ন সময়ে কবির সহকারী সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসাবে যাঁরা কার্যত দায়িত্ব পালন করেছেন, বিস্তারিত বিবরণসহ তাঁদের নামের সময়ানুক্রমিক পৃথক পৃথক তালিকা,

www.pathagar.com

(ঘ) কবির গানের গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো অনুসন্ধান ও উদ্ধারের উদ্যোগে কীভাবে কতখানি নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের কাজ কতখানি হয়েছে?

৬। (ক) শুরু থেকেই কবি বেতারে কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ গান গেয়েছেন, অন্যান্য শিল্পীদের জন্য কোন্ কোন্ গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, কোন্ কোন্ গানের বিষয়ে কোন্ কোন্ টীকা-ভাষ্য বা বিশ্লেষণ পরিবেশন করেছেন, সেসব কিছুর সময়ানুক্রমিক বিবরণ,

(খ) বেতারে কবি কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেছেন সেসব বিবরণ,

(গ) প্রতিটি গানের বিষয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ কবির 'হারামণি' পর্যায়ের গানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা,

(ঘ) প্রতিটি গানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ কবির 'নবরাগ' পর্যায়ের গানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

কবি কলকাতা এবং ঢাকা, এই উভয় বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান করেছেন। কবির সুস্থাবস্থায় উভয় বেতার কেন্দ্র থেকে কবির গানের বহু রেকর্ডও বাজিয়ে শোনানো হতো। *মনোরঞ্জন সেন লিখেছেন, "কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তাঁর সুস্থাবস্থায় শেষ পাঁচ বছর 'কাজী সাহেব' সঙ্গীতানুষ্ঠানে যে বিপুল বহুমুখিনতার আর স্বর্ণ প্রসবিনী সাফল্যের নজির রেখে গেছেন তার কোন তুলনা নেই। এই বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর কবি কল্পনা, পরিণত সঙ্গীত সাধনা এবং শিল্পীবৃন্দকে শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক রীতি।"* অতএব, বেতারে নজরুলের সাঙ্গীতিক অবদানের বিষয়েও একটি পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে, যেমন পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে তাঁর মঞ্চ সংশ্লিষ্ট গানের বিষয়ে, গ্রামোফোন রেকর্ড সংশ্লিষ্ট গানের বিষয়ে, ছায়াচিত্র সংশ্লিষ্ট গানের বিষয়েও এবং এরকমই আরও অন্যান্য বিষয়েও।

(৭) (ক) কবি বাংলা ছায়াচিত্রে এবং বাংলা ছায়াচিত্রের হিন্দী ভার্সানসহ বিভিন্ন ছায়াচিত্রের গান কোন্‌টি কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে লিখেছেন, গানের সূত্র, সময়কাল, রাগ পরিচয়, তাল পরিচয় ইত্যাকার বিবরণসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

(খ) গানগুলো কোন্ ছায়াচিত্রে, কোন্ সিচুয়েশনে পরিবেশিত হয়েছে এবং নেপথ্য গায়ক-গায়িকা কে কে, সঙ্গীত পরিচালক কে, প্রযোজক, নট-নটী ইত্যাকার সবকিছুর সময়ানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

(গ) নজরুল সংশ্লিষ্ট ছায়াচিত্রগুলো অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ এ যাবত নেয়া হয়েছে কি?

(৮) কবির সুস্থাবস্থায় কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ গানের বাণীর পরিবর্তন হয়েছে? সেসব কিছুর সময়ানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত তালিকা প্রণীত হয়েছে?

www.pathagar.com

(৯) কবির সুস্থাবস্থায় কোন পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ গানের সুরের পরিবর্তন হয়েছে সেসব কিছুর সময়ানুক্রমিক অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা প্রণীত হয়েছে?

(১০) স্বরলিপি বা সাঙ্কেতিক স্বরলিপি তৈরির ব্যাপারে নজরুলের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং কবির বিভিন্ন গান প্রসঙ্গে পরিবেশন করা দরকার।

১৯৯৫-এর পহেলা নভেম্বর চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী প্রকাশিত "নজরুল গীতি আলোচনা" গ্রন্থে, 'নিতাই ঘটক' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, নজরুল সান্নিধ্যধন্য এই শিল্পী ছিলেন 'নজরুল সঙ্গীতের ভাণ্ডারী ও বিশেষজ্ঞ।'

তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, "তিনি স্বরলিপি রচনায় সিদ্ধহস্ত।...হরফ প্রকাশনী তাঁর নজরুল গীতির স্বরলিপি প্রকাশ করেছে।... চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী সুরলিপি নামে তাঁর একটি স্বরলিপি বই প্রকাশ করেছে। নজরুল গীতির স্বরলিপি প্রসঙ্গে শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, "জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটকের স্বরলিপি আমি প্রামাণ্য মনে করি।"

উপরোক্ত বিবরণটি পেশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমীর নজরুল গবেষণা প্রকল্পের নির্দেশক কল্পতরু সেনগুপ্ত।

এই প্রসঙ্গে অন্যদের হাতে প্রণীত স্বরলিপির যে তুলনামূলক আলোচনা দরকার ছিল সেটা কিন্তু এখনো হয়নি। গায়ক-গায়িকা এবং শ্রোতাদের মনে এ বিষয়ে বিভ্রান্তিটা কিন্তু রয়েই গেছে। তদুপরি প্রশ্ন, নজরুলের সবগুলো গানের স্বরলিপি কি পাওয়া যাচ্ছে?

(১১) রবীন্দ্রনাথের 'গীতিবিতান'-এর মতো কোন একটি গ্রন্থে নজরুলের এ যাবৎ প্রকাশিত গানগুলোও কি পাওয়া যাচ্ছে?

(১২) কবির সুস্থাবস্থায় যারা তাঁর গানের শিল্পী ছিলেন এবং অন্য যারা তাঁর গানের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার কি ব্যাপকভাবে নেয়া হয়েছে? নজরুল সান্নিধ্যধন্য সবার সাক্ষাৎকার কি নেয়া হয়েছে?

(১৩) বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম থেকে অর্থাৎ কোন ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ থেকে কিংবা দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদি থেকে গ্রামোফোন রেকর্ড ও নজরুল সঙ্গীতসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র থেকে অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য নজরুল সঙ্গীতের বাণী, সুর অনুসন্ধান করে উদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ কোথায় কতখানি নেয়া হয়েছে?

(১৪) নজরুল সঙ্গীত সেন্সর বোর্ড গঠনের উদ্যোগ কতখানি নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা কতখানি হয়েছে?

(১৫) শুধু বাণী ও সুরে নজরুল সঙ্গীত প্রচারের অন্যান্য কোন্ উদ্যোগ কতখানি নেয়া হয়েছে এবং বিষয়টি কতখানি পর্যালোচনা করা হয়েছে? যেমন–

www.pathagar.com

(১) রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নজরুল সঙ্গীতের পুরানো গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানোর উদ্যোগ কতখানি নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা কতখানি হয়েছে?

(২) নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে এবং কবির সুস্থাবস্থায় চলচ্চিত্রে গাওয়া নজরুল সঙ্গীত থেকে অডিও ক্যাসেট করে তা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, নজরুল গবেষক, নজরুল সঙ্গীত শিক্ষার্থী এবং নজরুল সঙ্গীত ভক্তদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার উদ্যোগ কতখানি নেয়া হয়েছে?

(৩) নজরুল সঙ্গীত যেসব লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত, প্রচলিত-অপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর ওপর এবং আদি লৌকিক সুরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো সেই সব আদি রূপেই চর্চার কিংবা সেই সব আদি রূপেই পরিচিত করিয়ে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থাদি কতখানি নেয়া হয়েছে? এ বিষয়ে নিয়মিত কোন সম্মেলন বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা!

(৪) নজরুলের গানের যেসব পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যেতে পারে সেগুলো অনুসন্ধান ও উদ্ধার করে একত্রে প্রকাশের উদ্যোগ কতখানি নেয়া হয়েছে?

(৫) নজরুল সঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুশীলন শিবির এবং অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থাদি কী কী নেওয়া হয়েছে?

(১৬) গান শেখানোর ব্যাপারে কবি যে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, সে ব্যাপারে কি কোন ব্যাপক আলোচনা এবং চর্চা হচ্ছে? এ ব্যাপারে কারও কারও স্মৃতিকথায় কিছু কিছু তথ্য থাকলেও বিষয়টির ওপর কোন গ্রন্থ বা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে?

(১৭) নজরুল সঙ্গীতের তত্ত্বগত, তথ্যগত ও তুলনামূলক নানান দিক নিয়ে সূক্ষ্মভাবে কতখানি বিশদ এবং অনুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে?

।। পাঁচ ।।

এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম সেগুলোর প্রথম পর্যায়ে আছে নজরুল সঙ্গীতের অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের দিক এবং এর পরই আসছে শুদ্ধ বাণী, সুরে ও তালে নজরুল সঙ্গীত চর্চা এবং সেভাবেই পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দিক। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের কাজগুলো যথেষ্ট ব্যাপক ও সঠিকভাবে প্রয়োজন মোতাবেক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তেমন না হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলো অর্থাৎ নজরুল সঙ্গীতের ব্যাপকভিত্তিক সঠিক চর্চা, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের কাজগুলোও যতখানি দরকার ততখানি হয়নি বা হতে পারেনি। বিক্ষিপ্তভাবে অনেক বিষয়েই বেশকিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু যা হয়েছে তাতে আত্মতুষ্টির যে কোন অবকাশ আছে তেমনটা মনে করার কোন সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে দৈন্য এবং দুরবস্থা আমরা লক্ষ্য করি, এরই ছায়াপাত যেন ঘটছে নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও। যেমন, নজরুল সাহিত্য পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান এবং অনেক

www.pathagar.com

মহার্ঘ্য মন্তব্য, বক্তব্য আমরা পাই ঠিকই, কিন্তু "অগ্নিবীণা"-র মতো একটি কাব্যগ্রন্থের, 'বিদ্রোহী'র মতো একটা কবিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমরা এ যাবৎ প্রকাশিত তামাম নজরুল সমালোচনা সাহিত্যে কোথাও খুঁজে পাই না। আর এই দুরবস্থাটা বহাল থাকার কারণে শিক্ষক-অধ্যাপকরা যেমন নজরুল সাহিত্য পড়াতে আত্মবিশ্বাসের সাথে উৎসাহিত হতে পারেন না, তেমনি শিক্ষার্থীরাও এক্ষেত্রে স্বভাবতই অসহায় বোধ করেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় নজরুল উপেক্ষার, নজরুলকে খাটো করে দেখার ও দেখানোর অন্যতম কারণও এটাই। এই বাস্তবতাটা আমাদের আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের সমালোচনার ক্ষেত্রে বাংলাভাষী যে সমাজের মানুষ নিজেদের সাহিত্যিক, সঙ্গীতবিদদের জন্য নিজ সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধৈর্যের সাথে বিশদ ও ব্যাপক ভিত্তিক কাজ করেছেন, ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির হওয়ায় আশানুরূপ অত অনুপুঙ্খ, অত বিশাল, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ কাজ নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপারে তাদের হাত দিয়ে আসেনি। তবু যতটুকু এসেছে সেটুকুই বহুলাংশে বড় প্রিয় মনে হয়, বড় মহৎ মনে হয়, বড় আকর্ষণীয় এবং অত্যন্ত অবিস্মরণীয় মনে হয়।

নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনামূলক এবং মূল্যায়নধর্মী সবচেয়ে বড় কাজটা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী। নজরুল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বের বিচারে তাঁর কাজটা খুবই বড় মাপের। নজরুল সঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনায় যেখানটিতে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন আমাদের ছিল সেখানকার সিংহ দরজাটা তিনি আমাদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন।

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, এই ঠিকানা থেকে জুন ১৯৭৭-এ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'কাজী নজরুলের গান' আমার কাছে খুব প্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এটিই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে প্রশংসনীয় বড় মাপের কাজ।

মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০, এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল চর্চা' শিরোনামে তাঁর গ্রন্থে নারায়ণ চৌধুরী ভাগ ভাগ করে নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনা করেছেন।

কবির স্বগ্রাম চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী থেকে ১ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে কল্পতরু সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'নজরুল গীতি আলোচনা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ সংকলনটি বের হয়েছে সেটিতেও 'নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে' শিরোনামে নারায়ণ চৌধুরীর একটি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে নজরুল সঙ্গীতের একটি যথার্থ মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনা আছে।

ওই একই গ্রন্থে অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাবে নলিনীকান্ত সরকারের 'আজকালকার গান (২)', মনোরঞ্জন সেনের 'সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল', রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম', ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'কাজী

www.pathagar.com

নজরুল ও তাঁর রাগ-রাগিণী'— এই লেখাগুলোকে এক কথায় পর্যালোচনামূলক এবং সার্থক মূল্যায়নধর্মী বলা চলে। নজরুল-সুহৃদ সঙ্গীত শিল্পী নলিনীকান্ত সরকারের প্রতিবাদমূলক লেখাটি কবির সুস্থাবস্থায় সেই সময় প্রকাশিত হয়েছিল যখন কবি সঙ্গীত জগতে তাঁর বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাঁর প্রবল উপস্থিতি জানাতে জানাতে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছেন। সুকুমার মিত্র তাঁর লেখায় নজরুল ইসলামকে বাংলা সঙ্গীত জগতের একজন পূর্ণ সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আধারে অর্থাৎ খেয়াল গানের আদলে কবি সৃষ্ট রাগগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত নজরুল সঙ্গীতে ব্যবহৃত অন্যূন ১৪৩টি রাগের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কবির সঙ্গীত শিক্ষা শুধুমাত্র একটি ঘরানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রন্থের অন্যান্য পর্যালোচনামূলক নিবন্ধগুলো পড়লে মনে হয় যে, ওগুলো যথার্থই কোন সঙ্গীতজ্ঞ সাহিত্য সমালোচকরাই লিখেছেন।

হরফ প্রকাশনী, এ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, এই ঠিকানা থেকে ১৯৭৮-এর ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'নজরুল গীতি (অখণ্ড)'তে 'নজরুল সঙ্গীত ঃ পটভূমি ও পরিচয়'-এ আব্দুল আজীজ আল্-আমান পর্যালোচনামূলক যে কথাগুলো লিখেছেন তা যথেষ্ট মূল্যবান।

'কাজী নজরুলের গান' শিরোনামে তাঁর গ্রন্থের কলকাতা সংস্করণে নজরুল সঙ্গীতের পর্যালোচনা করে নারায়ণ চৌধুরী যা লিখেছেন, আব্দুল আজিজ আল্-আমানের লেখায় তা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

'নজরুল গীতি অখন্ড'য় আব্দুল আজীজ আল্-আমান তাঁর লেখায় কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, 'কবিবন্ধু' শিরোনামে প্রকাশিত কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক গবেষণামূলক কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর নিবন্ধ থেকে অনেকগুলো তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে।

নজরুল সঙ্গীতের যথার্থ গবেষণামূলক মূল্যবান কাজ হিসেবে এরপর আমি উল্লেখ করব ১২ ভাদ্র ১৩৯৯ তারিখে নজরুল ইন্সটিটিউটে কবির পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে দশকব্যাপী নজরুল জন্মশত বর্ষ বক্তৃতামালার অংশ হিসেবে 'নজরুলের প্রেম সঙ্গীত ঃ সমকালের গীতি কবিতার প্রেক্ষাপটে' শিরোনামে যে ত্রয়োদশ বক্তৃতাটি ড. স্বপ্না ব্যানার্জি দিয়েছিলেন সেটির কথা। নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, বাড়ি নম্বর ৩৩০ বি, সড়ক নম্বর ২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা, এই ঠিকানা থেকে বক্তৃতাটি ১৯৯২-এর অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ডে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত তাঁর সমস্ত গানের সুরকার আসলে যে কবি নিজেই, তাঁর গানের কোনো কোনো রেকর্ডে কোনো সুরকারের নাম আদৌ কেন নেই এবং তাঁর গানের কোনো কোনো গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সহকারী সঙ্গীত পরিচালকদের নাম কীভাবে বসেছে সেটা তিনি স্পষ্টতই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখা যথার্থ

www.pathagar.com

গবেষণামূলক ও মূল্যায়নধর্মী। ডক্টর স্বপ্না ব্যানার্জি লিখেছেন ঃ

"নজরুল যখন গ্রামোফোন কোম্পানীতে চাকরি করতেন তখন তাঁর গানে অন্য সুরকারদের নাম বহু রেকর্ডে উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ কি? নজরুল ছিলেন বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার। সুর তোলাতে গিয়ে দেখলেন, শিল্পী হয়ত সুরটির সূক্ষ্ম কারুকর্ম যথাযথ কণ্ঠে তুলতে পারছেন না। সে ক্ষেত্রে সহকারী সঙ্গীত পরিচালকদের বলতেন, শিল্পীর কণ্ঠ অনুযায়ী গানটি তুলে দিতে। পুরনো রেকর্ডের তালিকায় এমন অনেক রেকর্ড পাওয়া গেছে, প্রথম রেকর্ডের সুরকার নজরুল, দ্বিতীয়বার অন্য কেউ। আবার কোন কোন গানে সুরকার নজরুলের নাম আদৌ কোথাও নেই। অর্থাৎ সহকারী সুরকার, যাঁরা পরে শিল্পীকে গানটি রেকর্ড করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরই নাম রয়ে গেছে, নজরুলের নাম হারিয়ে গেছে।

.... রেকর্ড কোম্পানীও অর্থের বিনিময়ে নজরুলের গান কিনে নিতেন, ফলে সেই সব গান থেকে মুছে যেত স্বত্বাধিকারীর পরিচয়। এই তথ্যটি মাথায় রেখে প্রথম জিজ্ঞাসায় ফিরে যাই।

যে গানগুলো নজরুলের নয় বলে উল্লিখিত সেগুলির শব্দচিত্র, সুর, ছন্দ বিশদভাবে অনুধাবন করলে হৃদয় কিন্তু অন্য কথা বলবে। সাহিত্যের শেষ কথা যুক্তি নয়, তর্ক নয়; অনুভূতি। বুঝিয়ে দিলেই ছুটি নেই, বাজিয়ে দিতে হয়। 'জ্বালিয়ে দিয়ে ধরায় আগুন পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন', 'চৈতি রাতের উদাসী হাওয়ার' গানটির উল্লিখিত চিত্রকল্পটি কি নজরুলের গজল গানের চিত্রকল্পটিকে স্মরণ করায় না? 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না' গানটিও অপূর্ব। 'পিয়ালা কেন মিছে আনিলে ভরি/কী হবে এ বেদনাকে মাতাল করি/যে ফুলের আজি আর নাহি কাজ ফুটিবার/দাও ওগো দাও তারে পড়িতে ঝরি' কিংবা 'দেখা হলে এই অবেলায়, সখি তারে বলবো কি লো বল', এই অনন্য গীতি কবিতা দু'চারটি লিখে কোন শিল্পীর সৃজন ক্ষমতা নীরব থাকতে পারে? সৃষ্টির আবেগ তাকে নিয়ত পীড়ন করবে। গানগুলো ইন্দুবালা, আঙ্গুর বালা, কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে যাঁরা শুনেছেন তাদের চিত্তে নজরুল গীতির স্বপ্রতিষ্ঠিত রূপটি অবিসংবাদিতভাবে ফুটে উঠবেই।...

খেয়ালি সুরকার কাউকে গান শেখাতে বসে দেখলেন যথাযথ সূক্ষ্ম কারুকর্ম শিল্পীর কণ্ঠে আসছে না। সহকারী সুরকারদের কাউকে বললেন একটু সহজ করে তুলে দিতে। সহকারী সুরকার ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্ত রায়, চিত্ত রায় প্রমুখ অভিজ্ঞ সঙ্গীত পরিচালক। যখন রেকর্ড বেরোল দেখা গেল নজরুলের নামোল্লেখ নেই। হারিয়ে গেছে সুরকারের পরিচয়। ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে অত্যন্ত ভালমানুষ কবি হয়ত প্রতিবাদ করতেন না, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তবু প্রতিবাদ করেননি।...

সমকালীন সুরকাররা কেউই কিন্তু নজরুলের গজল আঙ্গিকের গানে সুর দেননি এবং এই আঙ্গিকে সুর সৃষ্টি করতে সাহসী হননি।...বাংলা কাব্য সঙ্গীতে গজল এই রীতিটি নজরুলই এনেছিলেন, তার ধারা অনুসৃত হয়নি অন্য কারও হাতে। কেননা, শুধু ভাষা বা চিত্রকল্প নয়, সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে নজরুলের সমকক্ষ এরা ছিলেন না।"

www.pathagar.com

ড. স্বপ্না ব্যানার্জির বক্তব্য যে সঠিক এ বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা হলে অনেক প্রমাণই পাওয়া যাবে। রেডিও এবং গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীতে কবির মোটা মোটা যেসব গানের খাতা থাকত সেগুলো থেকে তাঁর সুস্থাবস্থাতেই অনেকে গান তুলে নিয়ে নিজেদের নামে চালাতেন। সমসাময়িকদের স্মৃতিকথায় দেখছি এ বিষয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি বলতেন, সাগর থেকে ক'ঘটি জল নেবে!

কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর গানের খাতা চুরি গিয়েছিল।

কবির অসুস্থতার পর তাঁর বাসা থেকেও যে কেউ তাঁর মোটা মোটা গানের খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন সে কথা কবির পালিতাকন্যা শান্তিলতা দেবীর মুখেও শুনেছি।

সুরের ক্ষেত্রে তাঁর সহকারীরা কবির দেয়া সুরে কোনো শিল্পীকে গান শেখানোর পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামোফোন রেকর্ডে হয় কবির নাম দেননি কিংবা নিজেদের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। গবেষণা করলে এর প্রমাণ অনেক পাওয়া যাবে এবং অনেকভাবে পাওয়া যাবে। যেমন, নজরুল তাঁর গানে সুর দিয়েছেন অফ্‌বীটে। কারণ, অফ্‌বীটে সুর দিলে সেটা নাটকীয় হয়। প্রকাশভঙ্গিও সার্ফ হয়। শ্রোতার সঙ্গে গায়কের একটা ভাব বিনিময় হয়। এটা নজরুলের বৈশিষ্ট্য। কমল দাশগুপ্তদের নয়। এর অন্যতম প্রমাণ তাঁর সহকারী সুরকার কমল দাশগুপ্ত যেসব আধুনিক গানে সুর দিয়েছেন সেগুলো সবই দিয়েছেন বীটে। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 'শাওন রাতে'র সুর জগন্ময় মিত্রের নয়, নজরুলের নিজের।

শিল্পীদের নজরুল গান কীভাবে শেখাতেন সে বিষয়ে "নজরুল গীতি আলোচনা" গ্রন্থে "সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল" শীর্ষক নিবন্ধে মনোরঞ্জন সেন লিখেছেন যে, শিল্পীবৃন্দকে শিক্ষা দেওয়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল নজরুলের। গান শোখানোর ব্যাপারে নজরুলের ছিল অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি। "তিনি শিল্পীবৃন্দের গান শুনে তার গায়ন রীতি বা অধিকারটুকু বুঝে নিয়ে তার উপযোগী গান দিতেন। শিল্পীর সবটুকু উৎকর্ষ তিনি গানের মধ্যে আদায় করে নিতেন। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেব বর্মণ, মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীমতী ইন্দু বালা, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা স্ব-স্ব রীতিতে জ্যোতিষ্মান। নজরুল এদের প্রত্যেকের গানে অলঙ্করণ পদ্ধতির, তাদের শিল্পী মেজাজের স্বাধীনতাকে সুযোগ দিয়েছেন পরিপূর্ণ গায়কী আদায়ের জন্য। শচীন দেব বর্মণের 'পদ্মার ঢেউ রে', বা 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া', মৃণালকান্তি ঘোষের 'বল রে জবা বল', বা 'মহাকালের কোলে এসে' এবং শ্রমতী ইন্দু বালা দেবীর 'কেন আন ফুল ডোর' বা 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' গানের চালে দুস্তর ব্যবধান।"

আগে থেকে জানা না থাকলে অনুমান করা কঠিন যে, সবগুলোই নজরুলের সৃষ্টি। আবার তাঁর সঙ্গীত জীবনের শেষ পর্বের বিশিষ্ট শিল্পী শৈল দেবীর গাওয়া গানে আমরা পাই আর এক নজরুলকে।

উপরোক্ত গ্রন্থে 'বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম' শীর্ষক নিবন্ধে রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন ঃ

"আমার মনে হয় নজরুল সুযোগ্য গায়ক-গায়িকাদের তাঁদের নিজস্ব রীতিনীতিকে

www.pathagar.com

ব্যাহত হতে দিতেন না; অথচ তাঁর লিরিককে তাঁর নিজস্ব প্রবাহসহ অর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। প্রসঙ্গত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। নজরুলের অনেক গান তিনি গেয়েছেন কিন্তু গোসাইজীর স্বকীয়তা সেখানে সেসব গানে ভাস্বর হয়ে আছে। কেউ কেউ হয়তো ফৈয়াজ খাঁর গাইবার ধরনে অভ্যস্ত, সেখানে সেই গায়কী ফুটিয়ে তোলবার অবকাশও কাজী সাহেব রেখেছেন। কিন্তু কতগুলো গান আছে যাতে কাজী সাহেবের নিজস্ব স্টাইল পুরোপুরি বর্তমান।"

উক্ত গ্রন্থে "সহজাত সঙ্গীত প্রতিভাধর" শীর্ষক নিবন্ধে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র লিখেছেন যে, কবি 'বহু গানের সুর শিল্পীর দক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রেখে করতেন।'

কোনো রাগের উপর ভিত্তি করে লেখা কোনো গান কোনো শিল্পীকে গাইতে দেয়ার আগে কবি চাইতেন যে, শিল্পী যেন সেই রাগটি প্রথমে রপ্ত করে নেন।

এখন যদি কোন শিল্পী দক্ষিণী বা কর্ণাটী রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে লেখা গানগুলো গাইতে চান তাহলে কর্ণাটী সঙ্গীতের যে ৭২টি ঠাট আছে সেগুলো তাঁকে জানতে হবে। অনুরূপভাবে বাঈঠুমরীর আদলে বাঁধা নজরুলের কোনো গান যদি কেউ গাইতে চান তাহলে মূল বাঈঠুমরীটা কী সেটা তাঁকে প্রথমে জানতে হবে। ঠিক তেমনি, লোকসঙ্গীত, সাঁওতালি, কাজরীর বেলায়ও ওই একই কথা খাটে। এই গানগুলোর আদিরূপ এখনকার শিল্পীরা যদি না জানেন তাহলে এই সবকিছুর আদলে লেখা নজরুলের গানের আসল কাজটা তাদের কণ্ঠে আসবে না।

অরিজিনাল এইসব জিনিস আনার জন্য সঙ্গীত সম্মেলন করা, টেপ করা ইত্যাদিরও প্রয়োজন আছে। বাইরের দেশ থেকে নানাভাবে অশ্লীল অনেক কিছুই তো আসছে! নজরুল সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্যকে ধরে রাখার জন্য এসব আনা যাবে না কেন? এইসব সমস্যা এবং এগুলোর সমাধানের বিষয়ে তেমন কোন বিস্তারিত ও উল্লেখযোগ্য আলোচনাই হয়নি।

স্বরলিপি তো গানের কাঠামো

স্বরলিপি বা সাঙ্কেতিক স্বরলিপি তৈরির ব্যাপারে নজরুলের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল।

১৯৯৫-এর পহেলা নভেম্বর চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী প্রকাশিত "নজরুল গীতি আলোচনা' গ্রন্থে 'নিতাই ঘটক' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, নজরুল সান্নিধ্যধন্য ওই শিল্পী, মিউকিজ ডিরেক্টর ছিলেন 'নজরুল সঙ্গীতের ভাণ্ডারী ও বিশেষজ্ঞ।'

লেখা হয়েছে যে, 'তিনি স্বরলিপি রচনায় সিদ্ধহস্ত। হরফ প্রকাশনী তাঁর নজরুল গীতির স্বরলিপি প্রকাশ' করেছে।...

চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী সুরলিপি নামে তাঁর একটি স্বরলিপি বই প্রকাশ করেছে। নজরুল গীতির স্বরলিপি প্রসঙ্গে শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, 'জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটকের স্বরলিপি আমি প্রামাণ্য মনি করি।'

এই প্রসঙ্গে অন্যদের হাতে প্রণীত স্বরলিপির যে তুলনামূলক আলোচনার দরকার ছিল সেটা কিন্তু এখনো হয়নি।

www.pathagar.com

।। ছয় ।।

নজরুল সঙ্গীত প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখ করব অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য নজরুল সঙ্গীত অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কথা। এই লক্ষ্যে ১৯৭৬-এর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা নামে একটি সংগঠনও ১৯৬১ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রীকৃত হয়। এই সংস্থাটি "সাম্পান" নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করে এবং কলকাতার নানান প্রেক্ষাগৃহে এই লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদিও করে। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই সংস্থাটির তরফে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজ খুব এগুতে পারেনি। তবে সংস্থাটি এ বিষয়ে জনমনে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। সংস্থাটি নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিষয় দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি এবং অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জরুরি কাজের ব্যাপারে সরকার এবং নজরুলভক্ত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি অনুদানপুষ্ট চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী এ বিষয়ে কিছু গঠনমূলক কাজকর্ম করার কথা ভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি নজরুল সঙ্গীত গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়। এই গবেষণা প্রকল্পের নির্দেশক কল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, নজরুল রচিত ৩২৪০টি গান এ পর্যন্ত তাঁরা পেয়েছেন। তাঁর গানে যেসব রাগ-রাগিণী আছে সেগুলোর সংখ্যা অন্যূন ১৪৩টি। 'তাঁর গান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রেকর্ড ও ক্যাসেট করেছেন তিন শতাধিক শিল্পী (১৯৯৪ পর্যন্ত)। ৩২৪০টি নজরুল গীতির মধ্যে অন্যের দেয়া সুর ৩৮২টি গানে। তার মধ্যে কমল দাশগুপ্ত ১৫৪টি গানে সুর দিয়েছেন।'

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির প্রকল্প নির্দেশক কল্পতরু সেনগুপ্ত যদি ১৯৯২-এর অক্টোবরে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত ড. স্বপ্না ব্যানার্জির পুস্তিকাটি পড়তেন তাহলে লিখতেন যে, কবির সুস্থাবস্থায় অন্য কেউ তাঁর গানে সুর দিয়েছেন কিনা এই বিষয়টি একটি পৃথক গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু ড. স্বপ্না ব্যানার্জির নামোল্লেখ এই নজরুল গবেষণা প্রকল্প নির্দেশকের লেখায় কোথাও নেই।

পশ্চিমবঙ্গে স্বপ্না ব্যানার্জির মতো ব্রহ্মমোহন ঠাকুরও নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর বিকৃতির বিষয়ে এবং নজরুল সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও নজরুল সঙ্গীতের বাণী, সুর ইত্যাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন। তাঁর নামোল্লেখ এবং অন্যতম নজরুল সঙ্গীত গবেষক কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ তাঁর গ্রন্থে কোথাও পেলাম না।

হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭ থেকে ১৯৯২-এর ২৫ মে তারিখে "অপ্রকাশিত নজরুল" শিরোনামে ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় এক জায়গায় আছে ঃ

"একজন অসাধারণ নজরুলগীতির গবেষক ছিলেন প্রয়াত শ্রী দুর্গাদাস চক্রবর্তী।

www.pathagar.com

বহু অপ্রকাশিত গান তাঁর সংগ্রহে ছিল। প্রায় আট শ' আদি গ্রামোফোন রেকর্ড, পুরোন গীতি গ্রন্থগুলি, নানা প্রবন্ধ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া নজরুল যে সময়ে বেতারে সংযুক্ত ছিলেন সে সময়ের অনেক গান তিনি সরাসরি বেতার হতে লিখে নিয়েছিলেন।"

উপরোক্ত এই বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট যে, নজরুলের বেতারে পরিবেশিত গানগুলোরও অনেক কিছুই অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল এবং এখনও আছে। ফলে এই সুযোগেও নজরুলের গান অন্যের নামে প্রচারের সংস্থানটুকু থাকছে।

বাণী প্রকাশ, এ-১২৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে ১৯৯৪-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত "নজরুল সঙ্গীত কোষ" গ্রন্থটি ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আগমনী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ "নজরুল সঙ্গীত/বাণীর বিকৃতি ও অবিকৃত বাণীর উৎস। এই আগমনী প্রকাশনী থেকেই ১৯৯৩-এর আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে "নজরুল সঙ্গীত/সুরের বিকৃতি ও অবিকৃত সুরের উৎস" শিরোনামের গ্রন্থটি।

নজরুল সঙ্গীত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তথ্য হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, উপমহাদেশ বিভক্তির আগেই কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর "কবিতা" পত্রিকার নজরুল সংখ্যায় ছয় শতাধিক গানের এবং সাতচল্লিশোত্তর কালে মেদিনীপুরের গ্রন্থাগারিক আজহার উদ্দিন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" গ্রন্থে কয়েক শ' গানের এবং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "কাজী নজরুল" গ্রন্থে ৫৭০টি গানের এবং কল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর 'নজরুলগীতি অন্বেষা' গ্রন্থে ২৫২৩টি গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি প্রকাশ করেছেন।

"নজরুল গীতি অন্বেষা" প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে ঢাকা থেকে ডঃ রফিকুল ইসলাম সঙ্কলিত 'গীতি সংকলন'-এ ১.১৩৭টি নজরুল সঙ্গীতের পুরো বাণী প্রকাশিত হয়। এরপর কলকাতার হরফ প্রকাশ থেকে ২২০০ নজরুল সঙ্গীতের বাণী এবং ২৮৭২টি গানের প্রথম কলি প্রকাশ পেয়েছে।

ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত "নজরুল সঙ্গীত অভিধান"-এ আব্দুস সাত্তার ৩০৮৬টি গানের তালিকা দিয়েছেন।

নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত "নজরুল সঙ্গীতের তালিকা" শীর্ষক পুস্তিকায় করুণাময় গোস্বামী নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নাম্বার এবং শিল্পীর নামসহ ২৮৯৯টি নজরুল সঙ্গীতের বাণীর প্রথম পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি ১৯৯০-এর শেষাশেষি থেকে নজরুল সঙ্গীত গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে কবির ৩২৪০টি গানের প্রথম কলির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে।

নজরুল সঙ্গীতের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য বাণী ও সুর এবং নজরুল সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বিশাল ও ব্যাপক কাজ আরও অনেক আগে থেকে এবং আরও অনেক জরুরি ভিত্তিতে করা দরকার ছিল। কেননা, দিনকে দিন অনেক কিছু দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, নজরুল সঙ্গীতকেন্দ্রিক এসব কিছুই অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ কতখানি কী হচ্ছে, এর ওপরই নির্ভর করছে নানাদিক থেকে নজরুল সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও যথার্থ মূল্যায়নের ব্যাপারটি।

কিন্তু কোনো দুঃখের নয়, হতাশার বিষয়টা এই যে, যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে কাজটি সুপরিকল্পিতভাবে একটা প্রকল্পের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে যেভাবে করা দরকার ছিল, সেখানে তেমন কিছুই করা হচ্ছে না। নজরুলের জনপ্রিয় হাসির গানগুলো, যে গুলো কবি যখন সুস্থ ছিলেন সে সময়ে গেয়েছিলেন সারদা গুপ্ত, রঞ্জিত রায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্তের ভাই বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ গুণীজন। সেই গানগুলো আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট করে অন্তত সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইনস্টিটিউট, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমীর মতো নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো মারফত বিক্রির ও প্রচারের বন্দোবস্ত করলে এবং রেডিও-টেলিভিশন মারফত প্রচারের বন্দোবস্ত করলে অনেকে সেগুলো যে কেবল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করবেন কেবল তাই নয়, অনেকে সেগুলো শিখে নানা গণমাধ্যমে গাইতেও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

যে সমস্ত নজরুল সঙ্গীত আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে পাওয়া যায় সেগুলোর সবগুলোই এভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইনস্টিটিউট, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মারফত যেমন বিক্রির ও প্রচারের বন্দোবস্ত করা দরকার, তেমনি রেডিও-টেলিভিশন মারফত নিয়মিত প্রচার করা দরকার।

তদুপরি নজরুল একাডেমীসহ প্রতিটি সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নজরুল সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক বইপত্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত।

নজরুল সঙ্গীতের বাণীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে নজরুল জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক পড়াশোনাও যে করার দরকার এ কথাটা বিশেষত নজরুল সঙ্গীতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জানানো আবশ্যক।

কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এসব উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি।

২০ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে "রবীন্দ্রনাথের একঘেয়েমির দোষ রবীন্দ্রনাথের নয়" শিরোনামে পত্রে সোমানাথ রায় লিখেছেন ঃ

"১৮৮৬ ও ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর অনেকেরই রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।"

www.pathagar.com

কিন্তু সে সময়ে পরিবেশিত রবীন্দ্রনাথের গান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের যে মুগ্ধ করেছিল এমন কোন খবর যে পাওয়া যায় না, চিঠিতে সে কথাই ব'লতে চেয়েছেন সোমনাথ রায়।

১৮৬১ সালে জন্ম হলে ১৮৮৬ সালে এবং ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথের যা বয়স, ওই বয়সে নজরুল নানান গণমাধ্যমে গণমানুষকে তাঁর গানে মুগ্ধ করেছেন, কেবল জনসভায়, মঞ্চনাটকে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারে, চলচ্চিত্রে নয়, নানান ঘরোয়া বৈঠকেও সঙ্গীতের সমঝদার গুণীজনদেরকেও নজরুল ঘণ্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো অবিস্মরণীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান কখন এবং কাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায় সে বিষয়টি ১২ জুন ১৯৯৯ তারিখের কলকতার 'দেশ' পত্রিকায় হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে লেখা শিবনাথ খাঁর চিঠিতে এভাবে আছে ঃ

"১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই রবীন্দ্র সঙ্গীত জনতার দরবারে একটা আলাদা মাত্রা পায়।....বঙ্গভঙ্গের বিরেধিতায় জেগে ওঠা আন্দোলনের তরঙ্গে তাঁর গান আপামর বাঙালির কাছে পৌঁছেছিল...

তখনও বেশির ভাগ বাঙালি রবি ঠাকুরের নামের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না। সেটা ঘটেছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশি গানের ডালি নিয়ে পথে নামলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন তিনি; তাঁর গান এবং কণ্ঠও এই আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠল। ওই দিন কবি 'রাখি বন্ধন'-এর দিন হিসেবে পালনের অনুরোধ জানালেন এবং বিশাল মিছিলের সামনে 'বাংলার মাটি', 'বাংলার জল' গান ক'রতে ক'রতে গঙ্গাতীরে গেলেন। সেই সকালের স্মৃতি অবীন্দ্রনাথের লেখায়,

"রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে– মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধূমধাম— যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—"। সেদিন বিকালেই উত্তর কলকাতার রাস্তা পরিক্রমাকালে গাইলেন, "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান"। ওই সময়েরই আর একটি গান "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "এই 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সর্বত্র গাওয়া হতো।" তিনি আরও লিখেছেন, "এই গানটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তৎকালীন Star Theatre-এর রঙ্গমঞ্চেও এই গান গাওয়া হতো।" এই ঘটনার পূর্বে সাধারণ জনগণ অন্তত এভাবে রবিঠাকুরের গান শোনেননি এবং রবীন্দ্রনাথের গানও এত জনপ্রিয় হয়নি। সুতরাং, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের হাত ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত জনতার দরবারে মিশে গেছিল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য জানানো যাক।

www.pathagar.com

অন্যান্য সঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনার মাধ্যমে ডিস্ক রেকর্ড। হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রথম ১৯০৫-৬ সালে কবি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' এবং 'সোনার তরী' গান দু'খানি ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে রেকর্ড করান। পরে গ্রামোফোন কোম্পানী এই দুটি গানই ডিস্ক রেকর্ডে স্থানান্তরিত করেন ১৯০৮-৯ সালে। এর পর থেকে কবি এবং বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বরীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড হয়। তখন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বলাই চাঁদ শীল, মানদাসুন্দরী দাসী ও পূর্ণকুমারী। এই ডিস্ক রেকর্ড ও রবীন্দ্রনাথের গানকে জনতার হাতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।"

১৯০৫-৬ সালে রবীন্দ্রনাথের গান কোথায় কীভাবে কাদের কাছে পৌঁছালো সে বিবরণটা এখানে পাওয়া গেলো।

১৮৬১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম, তখন ১৯০৫-৬ সালে তাঁর বয়স কত?

আর ১৮৯৯ সালে নজরুলের জন্ম হলে ১৯৪২ সালে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল কত?

যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান বিশেষত তাঁর স্বধর্মী এক শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই বয়সে পৌঁছানোর আগেই নজরুল সব শ্রেণীর, সব মানুষের কাছে তাঁর গান পৌঁছে দিয়ে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। প্রতিভার এবং জনপ্রিয়তার একটা হিসাব এখানেও আছে।

কিন্তু সেই নজরুলের গান নিয়ে আমরা এখন কী করছি?

www.pathagar.com

অনন্য 'বিদ্রোহী'

।। এক ।।

১. নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটা আমার কাছে কেবল অবিস্মরণীয় নয়, স্পষ্টতই বিস্ময়কর মনে হয়।

বিস্ময়কর বললেও সবটুকুও বলা হয় না।

পিতা যেমন তাঁর শিশু সন্তানকে হাত ধ'রে লেখান, 'বিদ্রোহী' কবিতাটিও ঠিক তেমনি আল্লাহ্ নজরুলের হাত ধরে লিখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে এই কবিতার সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো কবিতা নেই। বিশ্ব সাহিত্যেও এই কবিতার সমপর্যায়ের কোনো কবিতা আছে বলে আমার জানা নেই।

অন্তত এই একটি কবিতা একাধারে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে এবং ভবিষ্যৎ গ'ড়ে দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে এই যে, এই কবিতা পড়ার পর থেকে মাথা নত করে আপোষ করে চলার মানসিকতা হারিয়ে ফেলার কারণে আমার অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের ভবিষ্যৎ একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

এই কবিতাটা আমার ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়েছে এই যে, এই কবিতাটা পড়ার পর থেকে ন্যায়বিচারের পক্ষে মাথা উঁচু ক'রে সত্যকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে একটা মানসিকতা আমার তৈরি হয়ে গেছে। আমি এখন কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের কথা ভাবি। প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করি। গঠনমূলক কাজ-কর্মেই কেবল উৎসাহী হই। প্রেমে, প্রীতিতে, ভালোবাসায় আমি কোমল,—সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং সমবেদনায় আমি আকুল,—কিন্তু সেই আমি আমার নীরবতায় এবং শান্ত অবস্থাতেও আস্থায়, বিশ্বস্ততায় এবং সততায় আমার নিজস্ব অস্তিত্বে অন্তর্জগতে সত্যিই ইস্পাত কঠিন।

আমার বিশ্বাসের কাঠিন্য আমার মান্য। কিন্তু এর পাশাপাশি আমি সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক সুবিচার যে গণমানুষের জন্য কাম্য, আমি কেবল সেটুকুই মনে করি না; আমি মনে করি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মতো কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যও এটা অপরিহার্য।

আমার চিন্তা-ভাবনার এই মূল বিষয়বস্তুর সবটুকুই 'বিদ্রোহী' কবিতায় আছে।

'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্র কাজটার মধ্যে কেবল একজন সৃজনশীল শিল্পী নেই, এর সব কিছুর মধ্যে একটা স্থায়ী একত্বের স্পৃহা আছে। কাজটাকে তিনি সেই স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, যে স্তরে পৌঁছলে বিষয় এবং বিষয়ীর দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। আমির একত্বের জোরেই বিভিন্ন প্রতীতি একীভূত হয়। বিদ্রোহী কবিতার এই স্বরূপপ্রাপ্ত আমি, এই আমির ব্যক্তিত্ব আমাদের সবার মধ্যে সঞ্চারিতও হয়। ফলে মনে হয়, একটা সাইকো-ফিজিক্যাল অর্গানিজম হিসাবে, একটা দেহ-মনের সংগঠন

www.pathagar.com

হিসাবে, আমাদের সবার মাথা অন্তত দেড় হাত উঁচু হয়ে গেছে। যে কাজটা ফরাসি সাহিত্যে ভিক্টর হুগো তাঁর উপন্যাস 'লা মিজারেবল' লিখে করেছেন, সেই একই কাজটি কাজী নজরুল ইসলাম আরো বলিষ্ঠভাবে বাঙলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেও করেছেন।

সার্ত্রের "দ্যা রেস্‌পেক্টেবল্ প্রস্টিটিউট"-এ শ্বেতাঙ্গিনী নায়িকা তাঁর নিজের ঘরে এক কৃষ্ণাঙ্গ মজলুমের হাতে একটি পিস্তল তুলে দিয়ে তাঁর জালিম শ্বেতাঙ্গ খদ্দের পুরুষটিকে হত্যা করার বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বর্ণবিদ্বেষী উক্ত জালিম শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি তাকে পেলে হত্যা করবে জেনেও নিজের আমিত্বে অবিশ্বাসী, আস্থাহীন, মজলুম কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষটি হত্যায় উদ্বুদ্ধ ও সঙ্কল্পবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ পুরুষটিকে হত্যা করার মানসিক শক্তি পায়নি।

জালিম প্রসঙ্গে সে বারংবার উচ্চারণ করেছে ঃ 'প্রভু', 'প্রভু'।

আমিত্বহীন একজন কৃষ্ণাঙ্গের ধারণায় হত্যা করার অধিকার একজন শ্বেতাঙ্গের থাকলেও একজন কৃষ্ণাঙ্গের তা থাকে না।

।। দুই ।।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে একটা শ্রেণী সমাজে "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্য দিয়ে এই আমিত্বের জোরটিকে নজরুল আমাদের উপলব্ধিতে এনে দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এই "বিদ্রোহী" কবিতা পড়ে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন।

চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন পূর্ব বঙ্গের সন্তান, ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সহ-সম্পাদক এবং পরে দৈনিক যুগান্তরের সহ-সম্পাদক হরিপদ রায় চৌধুরী ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক। বহুবার তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে পিস্তল হাতে নেমে পড়েছিলেন নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা পড়ে।

ওই স্কুলে আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন স্কুল লাইব্রেরিতে ২৫ জুন ১৯৬২ (১০ আষাঢ় ১৩৬৯) তারিখ সোমবার তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ ও পঞ্চম কলমে লন্ডনে বেঙ্গলী ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে কনওয়ে হল (Conway Hall)-এ নজরুল ইসলামের যে জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয় সেই খবরটা ছাপা হয়। নজরুল ইসলামের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের (Nazrul Islam's Birthday Celebration-এর) এই খবরে দেখেছি, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ বলেছেন ঃ "If Nazrul had written only his poem 'Bidrohi' (The Rebel), he would have been famous." ('নজরুল ইসলাম যদি কেবলমাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতাই লিখতেন তাহলেও তিনি বিখ্যাত হতে পারতেন।')

শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ নজরুলের সমসাময়িক ছিলেন।

www.pathagar.com

সমসাময়িকদের চোখে 'বিদ্রোহী'র মূল্যায়নের আরো দু'-একটা খবর দিচ্ছি। সে মূল্যায়ন সঠিক ছিল। এটা পড়লে এখনকার অনেক অযোগ্য সমালোচক নিশ্চয়ই লজ্জা পাবেন।

২০ মার্চ ১৯২৩ (৬ চৈত্র ১৩২৯) তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে 'সমালোচনা' স্তম্ভে লেখা হয়েছে ঃ

"অগ্নিবীণা"–কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত; আর্য পাবলিসিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 'বিদ্রোহী'-র কবি কাজী নজরুলের পরিচয় দিবার বোধ হয় আবশ্যক করে না। কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন, এক মহাপ্রাণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আধুনিক কালের এমন কবি বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আর সকলে অল্প বিস্তার করুন মেঠো সুর ভাঁজিয়া, কেহ কেহ-বা 'অকাল বৈরাগ্যের' গান গাহিয়া, আসর জমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। **কাজী নজরুলের বিশেষত্ব– তিনি বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে দীপক রাগিণীতে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু এক 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হইতে পারিতেন। যে দিন কবি সাহিত্য পরিষদে স্বয়ং এই কবিতার আবৃত্তি করিয়াছিলেন, সেদিন বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় হইতে তরুণ-শ্রোতারা পর্যন্ত সকলেই একটা নূতন ভাবের উন্মাদনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।** এই গ্রন্থে 'প্রলয়োল্লাস', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আগমনী' প্রভৃতি কবির আরো অনেক প্রসিদ্ধ কবিতা আছে। স্বদেশের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে গিয়া কবি আজ কারাগারে। কিন্তু আশা করি, তাহার বাণী বাঙালীর হৃদয় মথিত ও আলোড়িত করিবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকার সেদিনের মূল্যায়ন যথার্থ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল।

এর আগে ১৭ মার্চ ১৯২৩ (৩ চৈত্র ১৩২৯) তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলামে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় মন্তব্য ঃ

"বাঙ্গালায় বা ইংরেজীতে এমন অদ্ভুত কবিতা আর পড়ি নাই।..... এটা বাঙ্গালার সম্পদ, বাঙ্গালীর সম্পদ, বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিস।..."

আনন্দবাজার পত্রিকার এ মূল্যায়নও অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন।

এরও আগে বিজয় চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গবাণী'ঃ প্রথম বর্ষ ঃ প্রথমার্ধ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ১৯৩য়ে চৈত্র ১৩২৮ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২২)য়ের 'সাহিত্য বীথি'-তে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"আমাদের সাহিত্য যদি একা রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই সমৃদ্ধ হইত, তবে আনন্দের মধ্যে বিষাদ অনুভব করিতাম। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি সকল দেশেই অল্প জন্মে; আমরা যে অন্যান্য ভাল কবির রচনায় তৃপ্তি পাই, ইহা জাতীয় সাহিত্যের গৌরবের

www.pathagar.com

বিষয়। গত দু'-এক মাসের মধ্যে যে সকল প্রাণস্পর্শী সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে দু'টি কবিতার নাম বলিব। 'মোসলেম ভারত' পত্রে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা; কবিতাটি পড়িতে পড়িতে পাঠকের বুক ফুলিয়া ওঠে, মাথা উচুঁ হয়। শেষের দিকে কিয়দংশ পড়িলে সুইন বার্ণ রচিত Hertha মনে পড়ে, কিন্তু ঐ 'হার্থা' অপেক্ষা 'বিদ্রোহী' অনেক উচ্চে।"

'বিদ্রোহী'-র যথার্থ মূল্যায়ন এটি প্রকাশিত হওয়ায় অব্যবহিত পর পরই হয়েছিল।

।। তিন ।।

'বিদ্রোহী' কবিতার ঐশ্বর্য এর শুরুতেও প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যে আশরাফুল মখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষের সম্ভাবনা যে কত অপরিসীম, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমাত্রিক, মানুষ যে একটা সাইকো-ফিজিক্যাল অর্গানিজম অর্থাৎ দেহ ও মনের একটা সংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের যে একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, এবং শ্রেণী সমাজ উৎসাদন এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা যে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটা অপরিহার্য কর্তব্য, ওই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সব কিছুই 'বিদ্রোহী' কবিতায় আছে। এমনকি, নারী-পুরুষের অগাধ ও পরিব্যাপ্ত প্রেমের ব্যাপারটিও। তবে কবিতাটির শুরু হয়েছে মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার কথা দিয়ে এবং তা শেষ হয়েছে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে।

আর এই সব কিছু করতে গিয়ে তাঁর শব্দ চয়ন, শব্দ প্রয়োগ, শব্দ বিন্যাস, বিভিন্ন ধর্মীয় পৌরাণিক উপাদান ব্যবহার, এই সব কিছুই কবিতাটিকে কেবল অনন্য ও অবিস্মরণীয় নয়, বিস্ময়কর করে তুলেছে।

এই কবিতাটি লেখার পর থেকে নজরুল আজীবন বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

হিন্দু মুসলমান, এ রকম ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর সাহিত্য সঙ্গীত ও জীবনাচরণে একটা সুস্পষ্ট সহাবস্থানের নীতিতে মূর্ত হয়ে ওঠায় তিনি জাতীয় কবির অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর বিদ্রোহী কবি পরিচিতি আজো সমান আদৃত। এই উভয় পরিচিতিই কেবল তাঁকেই মানায়, কেবল তাঁর সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

কিন্তু আমাদের যে ধরনের শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্র এবং এর উপরিকাঠামো সরকারের কর্ণধার হন, সেখানে কার্যত মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অপাংক্তেয় বিবেচিত হয় বলে নজরুলের মতো জাতীয় কবির অবদানের আলোচনাটাও অদ্ভুৎ হয়ে আছে। আর এই কারণেই নজরুলের মতো জাতীয় কবির কোনো গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তো দূরের কথা, 'বিদ্রোহী'র মতো কোনো কবিতারও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজো হয়নি।

www.pathagar.com

।। চার ।।

নজরুল জীবন ও সাহিত্য আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির জন্যই প্রয়োজন।

নজরুল জীবন লক্ষ্যহীন কখনো ছিল না, লক্ষ্যভ্রষ্টও কখনো হয়নি। নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীত কেবল শিল্পের জন্য কোনো শিল্প নয়। জীবন ও সৃষ্টি, এই উভয় ক্ষেত্রেই নজরুল ছিলেন কমিটেড। সেই কমিটমেন্ট বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রে এবং শ্রেণী সমাজের উৎসাদন ও সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারে। সর্বোপরি মনুষ্যত্ব চর্চা এবং নিঃশর্ত ভালোবাসার বিষয়টা নজরুল জীবন ও সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত উপাদানই বিদ্রোহী কবিতার বিশ্লেষণ থেকেও উঠে আসবে। নারী-পুরুষের বায়ো-সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারটিও সেখানে কোনো কুসংস্কারের আবরণে চাপা পড়েনি।

নজরুল ছিলেন সংস্কারমুক্ত, সৎ ও বিশ্বাসী পুরুষ। তাঁর সেই পৌরুষের, ব্যক্তিত্বের পরিচয়টাই, সমগ্র বিদ্রোহী কবিতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ১৩৮৮-'র গ্রীষ্মে প্রকাশিত নজরুল একাডেমী পত্রিকার যুগউদ্‌যাপন বিশেষ সংখ্যায় 'বিদ্রোহী: বিতক' শিরোনামে একটা নিবন্ধে লিখেছিলাম ঃ

"বিদ্রোহী' কবিতার সুর নিশ্চয়ই দুর্জয় আত্মোপলব্ধির। তদুপরি বিতাটির শেষদিকে রয়েছে নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি অপরিসীম দরদ আর সহানুভূতি। আর সেটার প্রকাশ ঘটেছে বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে। সর্বোপরি এই কবিতাটিতেও ধরা পড়েছে নজরুল ইসলামের নিটোল চিন্তা-ধারাটি এবং আজীবন এই বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি বিচ্যুত হননি কোনো দিন। শরীর মনের একটা সংগঠন বা সাইকো-ফিজিকাল অর্গানিজম হিসাবে একটা ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ঋজু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ যা হতে পারেন, তিনি তা হয়েছেন এবং অবশ্যই একজন অকুতোভয় মানবতাবাদী যা ব'লতে পারেন, তিনি তা বলেছেন।'

নজরুলের কোনো গ্রন্থের মতো 'বিদ্রোহী' কবিতারও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হয়নি। এরই মধ্যে অবশ্য পাওয়া গেছে অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত লোকের কুসংস্কারচ্ছন্ন অপব্যাখ্যা।

'বিদ্রোহী' কবিতার শেষ স্তবকে আছে ঃ

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর–
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একটা চির-উন্নত-শির!"

এই অংশটুকু ব্যাখ্যা করতে হলেও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ইসলাম মানুষকে আশরাফুল মখলুকাত বলেছে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ধর্ম-শাস্ত্র মানুষকে অমৃতের পুত্র বলেছে, এই সব কিছুর তাৎপর্য উপলব্ধি

www.pathagar.com

করতে হবে। অ্যালিগরি বা রূপকটা বুঝতে হবে। এ জন্য এ সমস্ত বিষয়ে অধিকারী হতে হবে।

।। পাঁচ ।।

নজরুল বিষয়ক আমাদের এক স্বধর্মীর এক স্মৃতিকথায় দেখছি, উপরোক্ত অংশটার অপব্যাখ্যা করে কবির পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা পর্যন্ত করা হয়েছে!

মানুষের অজ্ঞতা অনেক সময় অবিচারের কারণ হয়।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় "মায়াবিনী ঈশ্বরীর দেশ ভারতই 'দ্য কন্টিনেন্ট অব্ সার্সির অনর্বস্তু'/অনাবাসী ভারত পথিক নীরদচন্দ্র" শীর্ষক নিবন্ধে অরবিন্দ পোদ্দার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"আমরা যে কঠোর কঠিন অবরুদ্ধ বর্ণ ব্যবস্থার কথা জানি তা স্মার্ত পণ্ডিতদেরই সৃষ্টি, তাঁদের সমাজ কর্তৃত্বের আয়ুধ।

আর এর আরম্ভও ব্রাহ্মণ প্রতিবিপ্লবের যুগ থেকে। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও স্মরণে রাখা উচিত। কৃষ্ণের বুকে ভৃগু পদচিহ্ন—এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ সংঘাতের সংকেত; সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রাধান্যের জন্য তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দেয় ও উপনিবেশ স্থাপন করেন।"

'ভগবান বুকে' 'বিদ্রোহী ভৃগু'-র পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার কাহিনীর মর্মবাণীটা আছে এখানে।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, আমাদের অশিক্ষার বা যথেষ্ট পড়াশুনা করার অভাবের দায়ভার আমরা আমাদের যথেষ্ট পড়াশুনা জানা, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রসহ নানান বিষয়ে অগাধ পণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সুস্থ জীবনবোধ ও পরিমিতি বোধসম্পন্ন প্রিয় কবির ওপর চাপিয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়া সমাজের অজ্ঞতার একটা দিকই কেবল তুলে ধরছি।

আসলে যে পাণ্ডিত্য থাকলে নজরুলের মতো কবির সাহিত্য সমালোচনার ব্যাপারে অধিকারী হওয়া যায়, সে রকম কোনো গভীর পড়াশুনা ছাড়াই, অর্থাৎ অনধিকারী হয়েও আমরা অনেকে কবির সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের ওপর অনেক সময় অবিচারই করি।

।। ছয় ।।

'বিদ্রোহী' কখন কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গে নজরুল-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'-য় লিখেছেন যে, 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাসায়। তখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ওই একই বাসায় এক সঙ্গে থাকতেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা বিবরণ ঃ

www.pathagar.com

"আমাদের ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়িটি ছিল চারখানা ঘরের একটি পুরো দোতলা বাড়ি। ... তখন নজরুল আর আমি নীচের তলায় পূর্ব দিকের অর্থাৎ বাড়ির নিচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন্ সময়ে তা আমি জানিনে। রাত দশটার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময়ে নজরুল বললে, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। 'বিদ্রোহী' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।"

মুজফ্ফর আহমদ কোনো কিছুতেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না। লিখেছেন ঃ

"নজরুল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল, অথচ আমার স্বভাবদোষে না পারলাম তাঁকে আমি বাহবা দিতে, না পারলাম এতটুকুও উচ্ছ্বসিত হতে। কী যে কথা আমি উচ্চারণ করেছিলাম তা এখন আমার মনেও পড়ছে না। আমার স্বভাবটা যদিও নজরুলের অজানা ছিল না, তবুও সে মনে মনে আহত যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, নজরুল ইসলাম শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা প'ড়ে শোনাতে পারত না। তাঁর ঘুম সাধারণত দেরীতে ভাঙে, আমার মতো তাড়াতাড়ি তাঁর ঘুম ভাঙত না। নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তাঁর মাথার সঙ্গে তাঁর হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবে সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।

"সামান্য কিছু বেলা হতে 'মোসলেম ভারত'-এর আফজালুল হক সাহেব আমাদের বাড়িতে এলেন। নজরুল তাঁকেও কবিতাটি পড়ে শোনাল। তিনি তা শুনে খুবই হইচই শুরু করে দিলেন, আর বললেন, 'এখনই কপি করে দিন কবিতাটি, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।' পরম ধৈর্যের সাথে কবিতাটি কপি করে নজরুল তা আফজাল সাহেবকে দিল। তিনি এই কপিটি নিয়ে চলে গেলেন। আফজালুল হক সাহেব চ'লে যাওয়ার পরে আমিও বাইরে চলে যাই। তার পরে বাড়িতে ফিরে আসি বারোটার কিছু আগে। আসা মাত্রই নজরুল আমায় জানাল যে, অবিনাশদা (বারীণ ঘোষের বোমার মামলায় সহবন্দী শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য) এসেছিলেন। তিনি কবিতাটি শুনে বললেন, 'তুমি পাগল হয়েছো, নজরুল, আফজালের কাগজ কখন বা'র হবে তার স্থিরতা নেই, কপি করে দাও 'বিজলী'তে ছেপে দিই আগে।' তাঁকেও নজরুল সেই পেন্সিলের লেখা হতেই কবিতাটি কপি করে দিয়েছিল।"

২য় বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা ঃ কার্তিক ঃ ১৩২৮-এর মাসিক 'মোসলেম ভারত'-এ 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন যে, তাঁর ধারণা, এই 'কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসের আগে বের হয়নি।'

www.pathagar.com

'বিদ্রোহী' কবিতা কার্যত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বা প্রথম গণমানুষের সামনে এসেছিল ২য় বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা ঃ ২২ শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩২৮—৬ জানুয়ারি, ১৯২২-এর সাপ্তাহিক 'বিজলী' মারফৎ।

পরে এই কবিতা 'প্রবাসী'সহ সেই সময়কার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

গ্রীষ্ম ১৩৮৮'র নজরুল একাডেমী পত্রিকার যুগ উদ্‌যাপন বিশেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছিলাম। সাপ্তাহিক 'বিজলী' তখন ছিল ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ। সাইজ ১২.৫″ × ১০″। প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হতো; একমাত্র বিশেষ সংখ্যা ছাড়া। ২য় বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা (৩০ শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩২৮ ঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২১) পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ। আলোচ্য ২য় বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যায় কোন সম্পাদকের নাম ছাপা হয়নি। এর পরে ২য় বর্ষ ঃ ৩০শ সংখ্যা, ২৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩২৯ ঃ ৯ জুন ১৯২২ থেকে সম্পাদক শ্রী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। অবশ্য পূর্বাপর প্রিন্টার্স লাইনে ছাপা হয়েছে মুদ্রাকর এবং প্রকাশক হিসাবে শ্রী নলিনীকান্ত সরকারের নাম।

'বিজলী' সাধারণত কম্পোজ হতো তিন কলামে। 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছে ১৩ পৃষ্ঠায় দু'টি কলামে এবং ১৪ পৃষ্ঠায় দুই কলামের মধ্যে এক কলামে। রচয়িতার নাম ছিল ঃ 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম'।

কবিতাটি তখন কোনো স্তবকে ভাগ করে ছাপা হয়নি। সম্ভবত স্থানাভাবের জন্যই এমনটি হয়ে থাকবে।

সেই স্থানাভাবের কথা, যে ১৩ পৃষ্ঠা থেকে 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়, তার আগের পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১২ পৃষ্ঠায় 'সমালোচনা' কলামে আছে ঃ

"মোসলেম ভারত'—কার্তিক ১৩২৮। সম্পাদক—মোজাম্মেল হক।

"মোসলেম ভারতে'র একটা বিশিষ্টতা এই যে, এতে বাজে মাল বড় একটা আমদানি হয় না। আমাদের বিশ্বাস— ভাল প্রবন্ধাদি সংগ্রহের জন্যই 'মোসলেম ভারত' ঠিক সময়ে প্রকাশিত হয় না। এবারের মোসলেম ভারতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'চুরাশি লাখ' সুন্দর নিবন্ধ। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'রাজনৈতিক অপরাধী' সুন্দর তেজঃপূর্ণ প্রবন্ধ। 'কামাল পাশা' হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা। কবিতাটি যুদ্ধের মার্চের ছন্দে গাঁথা।

এরূপ কবিতা বোধ হয় বাংলা কাব্য সাহিত্যে এই প্রথম। 'বিদ্রোহী' কাজী সাহেবের আর একটি কবিতা। কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা 'বিজলী'-র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিবার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারিলাম না।"

'বিদ্রোহী' যে প্রথম 'বিজলী' মারফৎ গণমানুষের কাছে পৌঁছেছিল এ বিষয়ে খোদ 'বিজলী' পত্রিকার এই উদ্ধৃত বিবরণ কি একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় না?

www.pathagar.com

'বিদ্রোহী' কবিতা যে সময়ে লেখা হয়েছিল সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণও স্পষ্টতই বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেছিল।

কবি যে সময়ে এটা লেখেন এর ঠিক অব্যবহিত আগে আহ্‌মদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রখ্যাত উর্দু কবি মাওলানা ফজলুল হাসান হসরৎ মোহানী পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হ'লে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রস্তাব করেন।

এই 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার অপরাধে কবির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার রাজদ্রোহের অভিযোগ দায়ের করার কথাও ভেবেছিল।

'বিদ্রোহী' কবিতার মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হচ্ছে। অনুবাদও হচ্ছে নানান ভাষায়।

১৯৯৮-'র ১২ নভেম্বর তারিখে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে নজরুলের অবদান সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন লোকবিজ্ঞানী ড. হেনরী ল্যাসি বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দু'টি লেখার একটি হলো আমাদেরই বিদ্রোহী কবি, আমাদেরই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী'।

এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তো নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবেও পরিচিত হন। তাঁর এই বিস্ময়কর কবিতাটি তাঁকে একটা অক্ষয় পরিচিতিও দিয়েছে। তিনি আমাদের কেবল যথার্থ জাতীয় কবি নন, একাধারে অন্যতম বিশ্বকবি এবং অনন্য 'বিদ্রোহী' কবি।

www.pathagar.com

সব মানুষের কবি

যাঁরা কবি হন, সাহিত্যিক হন, শিল্পী হন, তাঁদের সবার জীবনবোধ এক রকম হয় না। এঁদের সবার সৃষ্টির লক্ষ্য, এঁদের সবার সৃজনশীল কাজের লক্ষ্য এক রকম হয় না।

কেউ কেউ শিল্প সৃষ্টি করেন স্রেফ শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্যেই। নিজের আনন্দময় আবেগের অভিব্যক্তি এবং অন্যদেরও তাঁর এই উপলব্ধির শরিক করাটাই এই সৃজনশীল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। এটাকে যদি আদৌ লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয় তবে এটুকুই বলা চলে! কিন্তু যাদের লক্ষ্য কেবল শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি নয়, যারা শিল্প সৃষ্টি করেন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে, তাদের গোত্রটা অবশ্য আলাদা। তাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাদের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো পলায়নী মনোভাব থাকে না। জীবনের প্রয়োজনকে তাঁরা উপেক্ষা করেন না। মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কোনো প্রয়োজনকেই তাঁরা উপেক্ষা করেন না, এড়িয়ে যান না। তাঁরা সৃষ্টিশীল কাজকর্ম করেন, সর্বব্যাপী সমাজ মানুষের প্রয়োজনে, অনেকটা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। তাঁরা ইতিহাসকে দেখেন, সমাজ ব্যবস্থাকে দেখেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখেন, রাষ্ট্রযন্ত্র ও এর উপরিকাঠামো সরকারকে দেখেন গণমানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে হয়। তাঁরা খুবই সৎ এবং বিশ্বাসী হন। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষ হন তাঁরা। মানুষের জন্য তাঁরা সে রকম কিছুই চান— যা তারা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেন, নিজেরাও প্রত্যাশা করেন। ফলে এই ধরনের সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন মানুষরা স্বধর্ম বিসর্জন না দিয়েও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী হন। অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক সুবিচার তাঁদের কাঙ্ক্ষিত হয়। শোষণমূলক এবং বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা তাঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি, স্বস্তি, সততা এবং নৈতিকতার অন্তরায় বলে মনে করেন। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা থাকে। আত্মকেন্দ্রিক এবং ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা তাঁদের কাছে কোনোক্রমেই কাঙ্ক্ষিত মনে হয় না। তাঁদের জীবনধারা সে রকমই হয় যে রকমটা হলে মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন এবং তাঁরাও মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, মানুষকে স্থায়ী দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। ঠিক এ ধরনেরই সৃজনশীল প্রতিভার মানুষ ছিলেন নজরুল। একজন কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পী হয়েও আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ ধরনেরই একটা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি। তাঁর সে ভূমিকা কালোত্তীর্ণও হয়েছে। তাই তো তিনি আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তার রূপকার।

www.pathagar.com

আমাদের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে, এমনকি ব্যক্তি মানুষের চারিত্রেও যতগুলো সমস্যা আছে, সবগুলোই তিনি শনাক্ত করেছেন এবং এগুলোর সমাধানের পথও দেখিয়েছেন।

কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে নয়, লেখাপড়া জানা মানুষজনদের নানান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষার অপূর্ণতার বিষয়েও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পথ-নির্দেশনাও দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন আস্তিক, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, তাই ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

সামাজিক সুবিচারের বিষয়টি ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই জন্য শ্রেণী-সমাজকে তিনি পছন্দ করতে পারেননি। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তিনি অনেক সমস্যার আকর বলে মনে করেছেন। তাই ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে আস্তিক হয়েও, নাস্তিক না হয়েও তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। সবাই সমানাধিকার পাক, এ বিষয়ে তাঁর একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, আবেগ ছিল। এ বিষয়ে ব্যক্তি মানুষ হিসাবেও তিনি নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করতেন। আর এ বিষয়েও তাঁর মনে কোনো রকম কৃত্রিমতা ছিল না। সব রকমের অসততাকেই তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

এই উপমহাদেশের একটা বড় সমস্যা হলো, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে চলে আসা হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটো বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত স্বার্থ এবং আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নে অবিচার ও আধিপত্যবোধ কেন্দ্রিক হরেক রকমের সমস্যা। এটা এক দিক দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও বটে। কেননা, এতে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে অন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার-বঞ্চনার ব্যাপারটি থাকে। ধর্মের নামে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় যখন আর একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নানান বিষয়ে শোষণ ও বঞ্চনা করে তখনই সেটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব সম্বলিত আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথটাকেই— অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথটাকেই তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত পথ বলে মনে করেছেন। নিজের জীবন এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে নজরুল কার্যত সেই প্রমাণটাই রেখেছেন। স্বধর্মে আস্থাশীল হয়েও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্যও এক্ষেত্রে তিনি যে রকম বিশাল, ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে তো নেই-ই, বিশ্ব সাহিত্যেও নেই।

ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতা, ইত্যাকার কোনো কিছু নিয়েই বিভাজন প্রবৃত্তি নজরুলের ছিল না।

আঞ্চলিকতা ও ভাষার গণ্ডি পেরিয়েও নজরুল সাহিত্যে আছে এক উদার আন্তর্জাতিক চেতনা, এক আন্তর্জাতিক আবেদন। তাঁর সাহিত্যে আছে এক

www.pathagar.com

বিশ্বজনীন আবেদন। আর সেদিক দিয়ে তিনি বাংলার কবি, উপমহাদেশের কবি হয়েও অন্যতম বিশ্বকবি।

তাঁর সাহিত্যে কমিটমেন্টের স্পষ্ট পরিচয় আছে। আবার সেই একই সঙ্গে নান্দনিকতাও আছে। প্রেম-প্রকৃতির এবং সংবেদনশীল মনের রোমান্টিকতার কবিও তিনি। কেবল সর্বহারার কবি তিনি নন, কেবল সাম্যবাদী কবি তিনি নন।

তিনি বলতেন, তিনি সবার কবি। কেবল শোষকের কবি তিনি কখনোই নন, কেবল অত্যাচারীর কবি তিনি কখনোই নন। আর সবারই তিনি কবি, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতার সীমানা পেরিয়ে তিনি সব মানুষেরই কবি।

নজরুল চর্চা করতে হবে আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে।

আজ আমাদের কাছে নজরুলের কোন প্রয়োজন নেই। নজরুলের জীবনেতিহাসের, নজরুল সৃষ্টির, নজরুলের অবদানের অপরিহার্য প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। ঠিক এসব কারণেই বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য তালিকায় নজরুল বিষয়ক পঠন-পাঠনকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর জীবনবোধ, তাঁর দিক-নির্দেশনা, তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সুস্থ আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের জন্যই প্রয়োজন।

আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে তাঁর অবদানকে মর্যাদার সাথে তুলে ধরতে হবে।

মানুষের চরিত্র গঠনের কাজে, জাতি গঠনের কাজে নজরুল জীবন ও সাহিত্যকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে হবে।

আর্থ-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় লেখা এক বা একাধিক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজগুলো করতে হবে।

প্রতিটি নজরুল গ্রন্থের ওপর, নজরুলের প্রতি রচনার ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা লিখতে এবং প্রকাশ করতে হবে।

বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ভাষায় নজরুল সাহিত্য পুরোপুরি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে নিজেদেরকেও সচেতন এবং আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে হবে।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুল সঙ্গীত ক্যাসেটে ধারণ করে তা ন্যায্যমূল্যে শিল্পী এবং নজরুলভক্ত জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর বিকৃতি রোধ করতে হবে।

নজরুল জীবনভিত্তিক একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে।

নজরুল পরিচালিত এবং নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তত নজরুলের জন্মদিনকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

উপযুক্ত মর্যাদায় জাতীয় সংসদ, প্রেসক্লাব, ফিল্ম আর্কাইভস ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নজরুলের ছবি রাখতে হবে।

এ সব কিছুই করতে হবে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে।

www.pathagar.com

গণমাধ্যমে নজরুল

নজরুল গণকবি এবং গণমাধ্যমেরও কবি।

নজরুল সবার জন্য লিখেছেন, কিন্তু নজরুল মূলত গণমানুষের কবি। আর এই গণমানুষ বলতে সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে তিনি তাঁদের কথাই বুঝতেন, যাঁদের অবস্থান শাসক ও শোষক শ্রেণীর বাইরে। এ কারণেই নজরুল সাহিত্যের একটা বড় অংশই গণসাহিত্য। অন্যদিকে নজরুল সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অংশটার অর্থাৎ সিংহভাগটারই প্রকাশ ঘটেছে গণমাধ্যমের সাহায্যে বা গণমাধ্যম মারফৎ। এ কারণেই গণমাধ্যমে নজরুল এই বিষয়টা নথি-তথ্য, তারিখ ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে যদি একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও করতে হয় তাহলে এক নয়, একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হবে। এ কথাগুলো বললাম গণমাধ্যমে নজরুলের নিজস্ব ভূমিকা এবং গণমাধ্যমে নজরুল সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে।

গণমাধ্যমে নজরুল, এই কথাটার আর একটা দিক রয়েছে। সেটা আমাদের নজরুল চর্চা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ গণ-মাধ্যমের সাহায্যে তথা গণমাধ্যম মারফৎ নজরুল চর্চার প্রচার ও প্রসারের দিক। এ বিষয়েও এত কথা বলার আছে যে, এই দিকটিরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মাত্র একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে হওয়ার নয়।

উপরোক্ত দুটি দিকই এখানে আলোচ্য। তাই একটি প্রবন্ধের একই অঙ্গে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই উভয় দিক পরিপূর্ণভাবে ধারণ করা যে আদৌ সম্ভব নয়, সে কথাটা একেবারে শুরুতেই কবুল করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হলে কেবল পাঠক বা শ্রোতা-দর্শকদের প্রতি সম্মান জানানো নয়, মূল বিষয়টির প্রতিও সুবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি। তদুপরি আমার এই আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ মনে করলে অর্থাৎ আমি এই আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত দিক ছুঁতে পেরেছি মনে করলে খোদ নজরুল জীবন ও সৃষ্টি এবং নজরুল চর্চার বিষয়টিকে খাটো করে দেখা হবে।

এই সবিনয় নিবেদনটুকুর পর স্মরণ করছিঃ নজরুল তাঁর সুস্থাবস্থায় কর্মজীবনে গণমাধ্যম হিসাবে পেয়েছিলেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ, দৈনিক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা, গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার এবং সিনেমা। নজরুল তাঁর কর্মজীবনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই গণমাধ্যমগুলোর অনেক কিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। তাঁর জীবিকাও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এগুলোর অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলো। এসব কারণেই নজরুল সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অংশ অর্থাৎ সিংহভাগটাই প্রকাশ পেয়েছে উল্লিখিত এই গণমাধ্যমগুলো মারফৎ।

এরপরে আসে 'গণমাধ্যমে নজরুল' শিরোনামে আলোচ্য নিবন্ধের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা এবং নজরুল চর্চার সঠিক প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত বিষয়গুলো। এই পর্বে এসেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার কাছে

www.pathagar.com

পৌছানোর উপযোগী সবচেয়ে শক্তিশালী অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়া হিসাবে টেলিভিশন এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেট।

নজরুল তাঁর সুস্থাবস্থায় চলচ্চিত্র পেয়েছিলেন। প্রথমে নির্বাক এবং পরে সবাক। কিন্তু টেলিভিশন এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেট মারফৎ যত বিষয় এবং যত ধরনের বিষয় তুলে ধরা যায় এবং ড্রয়িং রুম কেন, বেড রুম পর্যন্ত যেভাবে পৌছে দেওয়া যায়, সে সুযোগ এবং সংস্থান সেদিন চলচ্চিত্রে ছিল না এবং আজো তেমন নেই। মনে রাখা দরকার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের মতো একটা অডিও-ভিডিও মাধ্যম শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার কাছে পৌছতে পারে, রেডিও'র মতো একটি নিছক অডিও মাধ্যমও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার কাছে পৌছতে পারে, কিন্তু দৈনিক কাগজ এবং সাময়িক পত্রাদি তা পারে না। অর্থাৎ নজরুল ব্যক্তিত্ব এবং নজরুল সৃষ্টির প্রকাশে সুযোগ তাঁর সুস্থাবস্থায় যা ছিলো তাঁর অসুস্থতার পর এবং পরবর্তীকালে তাঁর পরলোকগমনের পর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একাধারে নজরুল চর্চার সুযোগ যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি নজরুল চর্চাকে খাটো বা সীমিত করে দেখানোর সুযোগও কম বাড়েনি।

অবদান প্রসঙ্গে

নজরুল তাঁর সুস্থাবস্থায় শিক্ষিত জনগণের কাছে পৌছেছিলেন মূলত দৈনিক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি মারফৎ। নানান্ আড্ডা, বৈঠক, বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড, চলচ্চিত্র, নাটক, সভাসমিতি, অনুষ্ঠানাদি ছিল, শিক্ষিত জনগণের কাছে এর অতিরিক্ত পাওয়া। কিন্তু নজরুল এই দারিদ্র্যপীড়িত নিরক্ষর প্রধান উপমহাদেশের, বিশেষত বাংলার ঘরে ঘরে পৌছেছিলেন গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, চলচ্চিত্র এবং প্রধানত নানা সভা-সমিতি এবং অনুষ্ঠানাদি মারফৎ। গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নিয়ে এভাবে তৃণমূল স্তরের জনসাধারণের মাঝখানে একাকার হয়ে দাঁড়ানোয় অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ এবং অনুজ নজরুল, এই উভয়ের জীবদ্দশায় বাংলার জাতীয় কবির আনুষ্ঠানিক সম্মানটিও পেয়েছিলেন একমাত্র নজরুল, খোদ রবীন্দ্রনাথও নন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সম্মানের, মর্যাদার এই শীর্ষাসনে নজরুলের উত্থানও হয় একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের মাঝখান থেকেই।

এই লেটোর দলে নজরুল নাটিকার আকারে ছোট ছোট পালা রচনা করেছেন। এতে স্বয়ং অভিনয়ও করেছেন। এতে নাচ-গান থাকতো। এখানে তিনি গান রচনা করেছেন, গেয়েছেন। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছেন। ছড়া, গজল রচনা ও পরিবেশন করেছেন। লেটোর দলের সঙ্গে পালায় 'সঙে'র ব্যঙ্গ এবং হাস্যরসাত্মক ভূমিকা কেবল রচনা নয়, এই ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন তিনি। লেটোর দলের পালায় পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দলের ভূমিকা থাকতো নৃত্যে, গানে, ছড়ায়, গজলে চাপান এবং এর জবাবে পাল্টা চাপান দেওয়ার। কবিতা, গান, নাটিকা ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে রচনা ও পরিবেশনার যোগ্যতা কবি অর্জন করেছিলেন এখান

www.pathagar.com

থেকেই, নাটিকার আকারে রচিত লেটোর দলের যাত্রা-পালার বা পালা নাটিকার এই গণমঞ্চ থেকেই। রাজপুত্রের সঙ্ থেকে আকবর বাদশাহ পর্যন্ত পালা নাটিকাগুলোর নাম এবং রচনাংশ লক্ষ্য করলে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাসের—, অনেক কিছুর সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের চেতনায় তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন, সঙ্গীতে তালিম পেয়েছিলেন বাল্য থেকে কৈশোরের এ সময়েই। স্বদেশ, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাদানাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বোধের পরিচয় কবির এই সময়কার রচনায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই চেতনার প্রতিফলন তাঁর পরবর্তী জীবনের নানান রচনায় পাই।

ব্যাপক অর্থে লেটোর দলের যাত্রা-পালা বা পালা-নাটকের এই মাধ্যমটিতে তাঁর অংশগ্রহণকে গণমাধ্যমে অংশ গ্রহণ হিসাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পর্বে গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ তাঁর কেবল লেটোর দলেই নয়, স্কুল জীবনে অন্যত্রও তিনি ইতোমধ্যে নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের রণকৌশল রপ্ত করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়কে উৎখাত করার ইরাদায়। এই সেনাবাহিনীতে এসে তিনি বিশ্ব-সাহিত্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশেষভাবে সাম্যবাদী রাজনীতির একটা ধারণা পেলেন। সাম্যবাদী চেতনায় অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হলেন। এর সাক্ষ্য সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তাঁর বেশ কিছু রচনায়ও আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সেনাবাহিনীর বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে তিনি যখন যোগ দেন সে সময় ১৯১৬-য় হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের লক্ষ্যে এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা অনুসারে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় এমন দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।

এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য দ্রুত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিপর্যস্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ তীব্রতর হয়ে উঠছিল, তেমনি অন্যদিকে উল্লম্ফন প্রক্রিয়ায় দ্রুত লাভবান হচ্ছিলেন দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং নতুন নতুন কলকারখানার মালিকরা।

এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৫০ লক্ষ ভারতীয়। অংশগ্রহণকারী প্রতি দশ জন ভারতীয় সৈন্যের একজন হয় নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন। খোদ ব্রিটিশদের হিসাব মতেই নিহত হয়েছিলেন ১ লাখ ১ হাজার ৪শত ৩৯ ভারতীয় সৈন্য।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ১৯১৮'-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যয় করেছিলেন ১২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউন্ড। তদুপরি ভারতবাসীদের কাছ থেকে তারা সংগ্রহ করেছিলেন ২১ লক্ষ পাউন্ড এবং তাদের সহযোগী এ দেশীয় শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে দান হিসাবে পেয়েছিলেন ১০ কোটি পাউন্ড। জাতীয় কংগ্রেস সে সময় ব্রিটিশ তোষণ নীতি গ্রহণ করে চলছিল।

এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষে বিশেষত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, সার্বিয়া এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মুসলমানদের ওপর নানানভাবে কেবল স্বার্থান্ধতার নয়, অমানবিকতার এবং বিদ্বেষের পরিচয়ও দিল।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতে ১৯২০-এর প্রথম ভাগে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফিরলেন। ১৯২০-এর দ্বিতীয় ভাগের গোড়ার দিকে কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়ে আবুল কাশেম ফজলুল হকের মালিকানাধীনে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বার করলেন। ১৯২০-এর ১২ জুলাই প্রকাশিত এই দৈনিকের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাদের কথায় পলেসী হিসাবে তুরস্কের খিলাফতকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল। নজরুলের লেখায় শুরু থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনাধীনে ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এবং বিশ্ব মুসলিমের ওপর আরোপিত অন্যায়, অবিচার এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ দেখা গেল। *স্বভাবতই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার সে সময় তাঁকে এই কাগজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মালিক পক্ষের ওপর চাপ দেয়।* কাগজের জামানতও রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কেবল সাহসিকতার, মানবিকতার পরিচয় নয়, কোনো পূর্ব প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই নজরুল সাংবাদিকতায় যোগ দিয়ে অসাধারণ দক্ষতার এবং প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। বড় বড় খবরগুলো সংক্ষিপ্তাকারে এবং আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশনের ব্যাপারেই নয়, সংবাদ এবং নিবন্ধগুলোতে আকর্ষণীয় শিরোনাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও। নজরুলের যে কেবল অসাধারণ নয়, বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তার ছাপ বরাবরই তাঁর সাংবাদিকতার ওপরও পড়েছে। নজরুলের লেখার গুণে এই সান্ধ্য দৈনিকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়েছিল।

বর্ধমানের আবুল কাসিমের মালিকানাধীনে ১৯২১-এর গোড়ার দিকেই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা নিয়ে বার হলে নজরুল সেখানেও যোগ দিয়েছিলেন। কেননা, কবি স্বধর্মীদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কেও কখনো উদাসীন থাকতে চাননি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমাদের অনেকের কাছে এটাও একটা শিক্ষণীয় দিক বটে। এ বিষয় মনে রাখতে হবে নজরুল তাই করেছিলেন, যেটা একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষের পক্ষে করা সম্ভব। *আবুল কাসিমের দৈনিক 'নবযুগ' কেবল কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী লেখার জন্য যে তিন বার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে*

www.pathagar.com

ওয়ার্নিং পেয়েছিল সে কথা পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই সান্ধ্য দৈনিকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক সাবির মিয়া প্রথম পর্যায়ের সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ-এর অন্যতম সহযোগী সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছিলেন।

এই সময়কার গণমাধ্যমে নজরুলের ভূমিকাটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে ঃ ১৯১৬'র ডিসেম্বরে হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের লক্ষ্যে প্রণীত লক্ষ্মৌ প্যাক্ট; ১৯১৭'র ১ নভেম্বর পেট্রোগ্রাডে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল; ১৯১৮'র জানুয়ারিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের মিথ্যা ঘোষণা যে, এশিয়া মাইনর ও থ্রেসের সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ থেকে তুরস্ককে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধেই এই যুদ্ধ, ১৯১৯-এর ১৩ মার্চ খিলাফৎ প্রশ্নে ইংলন্ডে পাঠানোর জন্য সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিদল নির্বাচন, ১৯১৯-এর মার্চের লাহোর-অমৃতসর ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২১-এ দক্ষিণ ভারতে মালাবার হিলস্-এ মোপলা মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইত্যাদি।

"যুগবাণী"-তে 'নবযুগ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হলেও সবগুলি হয়নি। এই কাগজটির নজরুল সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে।

সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে কাজ করার পর হুগলীর ফুরফুরা শরীফের পীর মওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদার মৌলবী নজমুদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্রী কিরণ শঙ্কর রায়, সেরাজ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, কুতবুদ্দীন আহমদ, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযোগিতায় ১৯১৩ সনের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত 'দি ন্যাশনাল জার্নালস লিমিটেড'-এর অধীনে ইভাস্ট্রি হিসাবে প্রথমে বাঙলায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'নকীব' এবং পরে উর্দু ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় কাগজ প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা নজরুল ইসলাম করেছিলেন তা ২ ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে এঁদের দস্তখতযুক্ত প্রস্পেক্টাস দেখে জানা যায়। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম এঁরা সবাই ছিলেন প্রস্তাবিত কোম্পানীর ডিরেক্টর।

মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবাদপত্র 'নকীব' হবে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করবে না, এমনই একটা সংবাদপত্র হবে নকীব। ব্যবসায়িক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই কাগজ এবং ধারণা করা হয়েছে যে, খবরের কাগজ একটা লাভজনক শিল্প।

প্রস্তাবিত কাগজ 'নকীব'-এ বিশিষ্ট লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ডক্টর শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, আগা মঈদুল ইস্‌লাম, সৈয়দ জালাল উদ্দীন আল্-হোসাইনী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

গণমাধ্যমকে নজরুল কোন্ চেতনায়, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, কাগজের মত ঃ 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' ও 'অল্ ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর অনুরূপ। কিন্তু 'দি ন্যাশনাল জার্নালস্ লিমিটেড' নামক

www.pathagar.com

এই কোম্পানীর কাগজ 'নকীব' অবশ্য প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্ভীক সমালোচনা করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবন যথার্থ ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলাই 'নকীব'-এর মূল উদ্দেশ্য। তবে এই কাগজটি শেষ পর্যন্ত বার হতে পারেনি।

এটা সেই "সময়কার কথা যখন সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে নিখিল ভারত কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, এই উভয় রাজনৈতিক সংগঠনের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রকাশ্যে স্বাধীনতার ডাক দেন মওলানা ফজলুল হাসান হাসরৎ মোহানী।

কারাবন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মালিকানাধীনে ও সম্পাদনায় দৈনিক 'সেবক' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর **৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তারিখ সোমবার দৈনিক 'মোহাম্মদী' প্রকাশিত হয়**। নজরুল ইস্‌লাম এই দৈনিক মোহাম্মদীতে সহকারী সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতা করেন। **২৪ জুন ১৯২২ তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন** করলে কবি গভীর আবেগ ও অনুভূতি মিশিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের হিন্দু পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন, তাতে পৌত্তলিক সংস্কৃতি কেন্দ্রিক শব্দও ব্যবহার করেছিলেন। শব্দ প্রয়োগের এই স্বাধীনতা খর্ব করায় কবি এই কাগজে ইস্তফা দেন।

তবে অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে দৈনিক এবং তা না হলে অর্ধ-সাপ্তাহিক কিংবা সাপ্তাহিক কাগজ বার করার দিকে ইতোমধ্যেই নজরুলের একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মেছে দেখা গেল।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, এই উভয় রাজনৈতিক মঞ্চে প্রখ্যাত উর্দু-কবি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা ফজলুল হাসান হাসরৎ মোহানী যখন স্বাধীনতার ডাক দেন এবং মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, এর মাস আষ্টেক পর প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রধানত স্বাধীনতার দাবী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মালিকানায় এবং সম্পাদনায় এবং পরে সারথ্যে **অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'** প্রকাশিত হয় **১১ আগস্ট ১৯২২** তারিখে। তদুপরি কেবল বাণীতে নয়, সাংবাদিকতার ভাষায়ও তিনি এ সময় যোজনা করলেন নতুন মাত্রা। তাঁর নিজস্ব গদ্য শৈলীতে কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটালেন তিনি 'ধূমকেতু'তে আর কেবল চিন্তাধারার নয়, সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের ভাষারও প্রতিষ্ঠা ঘটালেন তিনি। এই কাগজ সম্পাদনাসূত্রেই রাজদ্রোহের, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডও হয়। জাতীয় দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলি এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই রাজবন্দী কবির বিষয়ে সে সময় যে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার পরিচয় দেন তা থেকে আজকের গণমাধ্যমগুলির আত্মসমীক্ষার ও উপলব্ধি করার অনেক কিছুই আছে। দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রথম পর্যায় থেকে মেহনতী জনগণের, বিশেষত শ্রমিকদের পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে এবং সমগ্র মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে নজরুলের সুস্পষ্ট ভূমিকা

www.pathagar.com

'ধূমকেতু'-তে অব্যাহত ও সমুন্নত দেখা গেলো। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের লক্ষ্যে ছবিসহ যেমন ক্ষুদিরাম, সূর্য সেনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ছবিসহ কার্ল মার্কস্-এর জীবনী ছেপে মেহনতী মানুষদের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গেও একাত্মবোধ করা হয়েছে। কিন্তু নজরুল জীবনের পূর্বাপর সব সময় যেমন, ঠিক তেমনি এখানেও সম্যের কথা, সর্বহারাদের কথা বলতে গিয়ে নাস্তিক্যবোধের অনুমোদনে সমর্থন যোগানো হয়নি। এর অন্যতম কারণ এই যে, অনেক আগে থেকেও ইস্লামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর একটা সম্যক ধারণা ছিল, ইসলামের অন্তর্নিহিত সাম্য ও সম্প্রীতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।

রাজদ্রোহ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে কবি গ্রেফতার হন ২৩ নভেম্বর ১৯২২ তারিখে। *১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে কারাগারে আসার আগেই কবি একাধারে নাট্য রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন এবং নাট্যাভিনয়েও অংশ নিয়েছিলেন। জেলে বসেই কবি মাদারীপুরের শ্রী পূর্ণদাস বাউলের অনুরোধে একটি নাটক লিখে দিয়েছিলেন। কথা ছিল ঃ কারাগারের বাইরে এসে শ্রী পূর্ণদাস চারণ দল গঠন করবেন। সেই চারণ দলে অভিনয়ের জন্য যে নাটকটি কবি লিখে শ্রী পূর্ণদাসের হাতে দিয়েছিলেন তার পাণ্ডুলিপি জেলের বাইরে এসে পৌছে যায়। কিন্তু পরে নাকি পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। গণমাধ্যমের জন্য নজরুলের উজ্জ্বল অবদান এইভাবে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়।*

জেলের বাইরে আসার পর থেকে তাঁর সুস্থাবস্থায় বিভিন্ন সময় কবি কেবল তাঁর নিজের নাটকেই নয়, অন্যের বহু নাটকেও বিভিন্নভাবে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। জেল থেকে বের হওয়ার বছর পাঁচেক পর থেকে বিভিন্ন সময় কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে সঙ্গীত রচয়িতা এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি যুক্তও ছিলেন। কেউ কেউ যে অনুমান করেছেন নজরুলের এবং নজরুলের-অবদান সমৃদ্ধ নাটকের সংখ্যা শতাধিক হবে, সে অনুমান সঠিক মনে করার অনেক কারণ আছে।

কবি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন ২৫ এপ্রিল ১৯২৫ তারিখে। এরই কয়েক মাস পর **১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে পূজা উপলক্ষে প্রসিদ্ধ শৌখিন গায়ক হরেন্দ্রনাথ দত্তের** গাওয়া নজরুল ইস্লামের গানের রেকর্ড প্রথমে বাজারে বা'র হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, ইতোমধ্যেই এ পর্যন্ত তিনটি গণমাধ্যম সংবাদ এবং সাময়িকপত্র, নাটক এবং গ্রামোফোন রেকর্ড, তাঁর অবদান জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার বাহন হল।

কবি কাজী নজরুল ইস্লামের **পরিচালনায়** 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের মুখপত্র' **সাপ্তাহিক 'লাঙল'** প্রকাশিত হ'ল **১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫** তারিখে। আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নজরুলের গণমুখী ভূমিকাটা প্রধান হয়ে উঠেছিল এই কাগজে। তদুপরি গণমুখী, সাম্যবাদী রাজনীতির অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে নজরুল

www.pathagar.com

এ সময় সারা বাঙলায় সভাসমিতি ও ব্যাপক সাংগঠনিক কাজকর্ম করেন। শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বঞ্চিত গ্রামীণ কৃষকদের সংগঠিত করেন। কাগজকে লিখিত এবং সভাসমিতিকে মৌখিক গণমাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে গণমুখী আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে উপমহাদেশের এতদঞ্চলে, বিশেষত তামাম বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক ব্যাপক এবং বিশাল অবদান রাখলেন কবি।

নজরুলের পরিচালনাধীন 'লাঙল'-এর গণমুখী চরিত্র বুঝতে হলে ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল শুক্রবার কলকাতায় রাজ-রাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে এর প্রচার সংখ্যা কমে গিয়েছিল সে কথাটা মনে রাখতে হবে। কারণ বলাবাহুল্য যে, 'লাঙল'-এর ভূমিকা স্পষ্টতই ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী।

নজরুল ইস্‌লাম-মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উদ্যোগে ১২ আগস্ট ১৯২৬ তারিখে **সাপ্তাহিক 'গণবাণী'** আত্ম-প্রকাশ করলে 'লাঙল' মূলত 'গণবাণী'-তে একীভূত হল। 'গণবাণী'-র লেখায়–'লাঙল'-এর চারিত্র্যই বজায় ছিল। এই পর্যায়েও কবি প্রত্যক্ষভাবে গণমুখী, সাম্যবাদী রাজনৈতিক মঞ্চে ছিলেন এবং মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতির পক্ষেও অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই লিখেছেন। গণমুখী রাজনীতির সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অন্তত ১৯২৯-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ছিল। মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদও তিনি এই সময়ের মধ্যে করেছেন।

ইতোমধ্যে ১৯২৮-এর ১১ মার্চ কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা ওয়াক আউট করেছেন। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চিড় ধরেছে, এমন একটা সময় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ থাকল না কবির।

এবার সঙ্গীত বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর অবদানের বিশাল ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ উল্লেখ করবো।

সঙ্গীত চর্চা কবি তাঁর ছোট বেলাতেই করেছিলেন। বিশেষত তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ চাচার কাছে। লেটোর দলের পালা নাটকের মঞ্চটিকে একটি গণমাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে সেখানে গানেও তিনি গণমানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন। সেনাবাহিনীতেও তিনি সঙ্গীত চর্চা করেছেন এবং সেখানকার সহকর্মীদের সামনে গেয়েছেন। সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফিরেও কবি বিভিন্ন মজলিশে, আড্ডায় এমন কি, শ্রমিকদের সভা-সমাবেশে গেয়েছেন। বিশেষত ১৯২০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর গান (সুরের উল্লেখসহ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। সেই থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মঞ্চে কবি নিজে গেয়েছেন এবং অন্যেরাও গেয়েছেন তাঁর গান। ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে সৌখিন গায়ক হরেন্দ্রনাথ দত্ত হিজ মাস্টার্স ভয়েসে কবির লেখা 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি রেকর্ড করেন।

www.pathagar.com

এরপর ১৯২৬-এর এপ্রিলে দেখছি ঃ হরেন্দ্রনাথ দত্ত হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে গাইলেন কাজী নজরুল ইসলামের আরো দু'খানি গণমুখী গান। 'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির বিধান সত্য হোক' এবং 'দোহাই তোদের এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল'।

গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম মারফৎ কবির অবদান ঘরে ঘরে নিরক্ষর মানুষের কাছেও পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পেল। তাঁর গান গ্রামোফোন রেকর্ড হওয়ার আগে নিরক্ষর মানুষদের কাছে তাঁর অবদান ও চিন্তাধারার কথা পৌঁছেছে যাত্রা ও নাট্যমঞ্চ এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সভা-সমিতি মারফৎ।

বেতার মাধ্যমের সুযোগ তখনও কলকাতায় আসেনি।

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয় ২৬ আগস্ট ১৯২৭ তারিখে। এর বছর খানেকের মধ্যেই এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটি মারফৎ তিনি নিরক্ষর জনসাধারণের কাছেও পৌঁছনোর সুযোগ পেলেন। ৫ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে কলকাতা বেতারে কবি প্রথম তাঁর গান গাইলেন।

আর এই রেডিওতে গান গাইবার ৯ দিন পর ১৪ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে গ্রামোফোনে কবির সুরে ও প্রশিক্ষণে রেকর্ডিং শুরু হয়।

এরই ৬দিন পর ২০ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে গ্রামোফোনে কবিকণ্ঠে ৪টি গান এবং 'নারী' কবিতার আবৃত্তি রেকর্ড হয়। এই সময় থেকে ক্রমে বিভিন্ন সময়ে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানরি সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হ'ল। গ্রামোফোন রেকর্ডে কবি স্বকণ্ঠে এই গান ও আবৃত্তি যেদিন করেন, এরই পর দিন ২১ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে রেডিওতে কবির গান ও আবৃত্তি ছিল।

এভাবেই কলকাতা থেকেও বেতার ও গ্রামোফোন রেকর্ড, এই উভয় গণমাধ্যম মারফৎ নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো কবির পক্ষে অনেক সহজ হ'ল। সঙ্গীতের জগতে তাঁর প্রবেশও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো এই সময়েই। কলকাতার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালকদের দায়িত্বও কবি এই সময় থেকেই পান। এরই কাছাকাছি সময়ে ১১ মে ১৯২৮ তারিখে সচিত্র সাপ্তাহিক "সওগাত"-এর আত্মপ্রকাশ ঘটলে কবি এখানে কিছু কিছু সাংবাদিকতাও করেন। তবে এই সময়টা ছিল সুরের জগতের সঙ্গে তাঁর জীবিকার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটার সময়। এই জীবিকার প্রয়োজনে এবং মিস ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর মানসিক জগতে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে সে কারণে এবং সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দরকষাকষির ফলে গণমুখী তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে পরিবেশ আর তেমন অনুকূলে না থাকায়, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে কবি এ সময় নিজেকে অনেকাংশে গুটিয়ে নিয়ে প্রধানত সাহিত্য-সঙ্গীতে এবং বিশেষভাবে সঙ্গীতে অবদান রাখার দিকে মনোযোগ দিলেন। এর অব্যবহিত পর এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করবো চিত্রজগতে নজরুলের প্রবেশ কীভাবে কতখানি মর্যাদার সাথে ঘটেছিল।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র তখন নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে পা ফেলছে। ১৯৩১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের সুর ভাণ্ডারী নিযুক্ত হলেন। পর দিন 'নজরুল ইসলাম/ম্যাডান কোম্পানীর সুরভাণ্ডারী' শিরোনামে দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে এই দুষ্প্রাপ্য খবরটি এভাবে প্রকাশিত হয় ঃ

"ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইস্‌লামকে 'সুর-ভাণ্ডারী' নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে, কারণ অধুনা বাঙ্গালার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইস্‌লাম রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পানী নট-নটীদের স্বর পরীক্ষার জন্য কেবল গান আবৃত্তির সবাক চিত্রই নির্মাণ করিবেন, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তাঁহারা সবাক করিয়া তুলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।'

চলচ্চিত্র জগতে নজরুল পদার্পণ করেন এই সময়ে।

এ রকমই একটা দুষ্প্রাপ্য তথ্য আমি পেয়েছিলাম পৌষ ১৩৪০ (ডিসেম্বর ১৯৩৩-জানুয়ারি ১৯৩৪)-এর মাসিক সওগাত-এর ২২৯ পৃষ্ঠায়। সেই দুষ্প্রাপ্য তথ্যটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ইনি সম্প্রতি পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেহ ছায়াচিত্র জগতে এরূপ উচ্চপদের অধিকারী হন নাই। আমরা কবিকে তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

বাঙলার চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে আসতে চাইছে সে সময় চলচ্চিত্রাঙ্গনে নজরুল পা রাখলেন সগৌরবে সুর ভাণ্ডারী হিসাবে। বাঙলার সবাক চলচ্চিত্র যখন তার শৈশব কাটিয়ে উঠছে তখন তিনি হলেন ম্যাডানেরই একটি প্রতিষ্ঠান পাইওনিয়ার্স ফিল্ম কোম্পানীর চিত্র পরিচালক। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, অমুসলিম শাসিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তৃণমূল স্তরের এক বাঙলাভাষী মুসলিম পরিবারের সন্তান কেবল তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা, সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে অবলীলাক্রমে উঠে এলেন চলচ্চিত্র জগতেও এক নেতৃস্থানীয় ভূমিকায়। যে 'ভক্ত ধ্রুব' ছবির মাত্র একটি রীল এই ঢাকার ফিল্ম অর্কাইভে আছে, সেটি এই পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর। কবি স্বাভাবিকভাবেই ১৯৩৪-এর ১ জানুয়ারিতে পাইওনীয়ার ফিল্মস-এর এই ছায়াছবির পরিচালক ছিলেন। লক্ষ্য করার মতো বিষয়, এই ছায়াছবির জন্য গান লিখেছেন তিনি। সেই সব গানে সুরও দিয়েছেন তিনি। সঙ্গীত পরিচালনা তাঁরই। এই ছবির সতেরোটি গানের মধ্যে তিনটি গান কবি একক কণ্ঠে গেয়েছেন। একটি গান দ্বৈত কণ্ঠে। এই ছবির একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে কবি ছিলেন সর্বত্রগামী।

এ রকম পরিচয়ই তাঁর পাওয়া যাবে নাটকে, গ্রামোফোন রেকর্ডে। কবি নিজে নাটক

www.pathagar.com

লিখেছেন। অন্যের নাটকেও নানাভাবে অবদান রেখেছেন। অনেক নাটক যে মূলত নজরুলের গানের জন্যই খ্যাতি লাভ করেছে, সে কথা প্রখ্যাত নাট্যকারদের অনেকেই স্বীকার করেছেন।

নজরুলের এবং নজরুলের অবদান সমৃদ্ধ নাটকের সংখ্যা কত? এ বিষয়ে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, শতাধিক হবে। এমনটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণও আছে। নজরুলের অসুস্থ হওয়ার কিছু দিন আগেও দেখছি, তাঁর রচনা ও প্রযোজনায় রেডিও থেকে 'গীতচিত্র' প্রচারিত হচ্ছে। একটি সময়ে গ্রামোফোন রেকর্ডেও গাওয়া হচ্ছে তাঁর ছায়াচিত্রের গান। তাঁর রেকর্ড নাট্যও যে ক'টা সে বিষয়েও শেষ কথা কে বলবে? যেমন শেষ কথা বলার সময় অনেক দূরে যে, নজরুলের লেখা এবং নজরুল সুর সমৃদ্ধ গানের গ্রামোফোন রেকর্ডের সংখ্যা ক'হাজার; রেডিও'র কতগুলি অনুষ্ঠানে কী পরিমাণ অবদান রেখেছেন তিনি।

কাহিনীকার হিসাবে, চিত্রনাট্যের লেখক হিসাবে, পরিচালক হিসাবে, গীতি রচয়িতা হিসাবে, সুরকার হিসাবে, সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে, নজরুল যেসব চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার সঠিক সংখ্যা কত?

এসব নিয়ে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ করার আছে।

১৯৪১-এর শেষভাগে তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হয় ২০ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখে। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি এ সময়েও একাধারে মঞ্চজগৎ, বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড, চলচ্চিত্র, ইত্যাকার সব ক্ষেত্রেই অবদান রাখছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কেবল বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার অধিকারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই কর্মবীর। যেসব পত্র-পত্রিকায়, নাটকে, বেতার অনুষ্ঠানে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, চলচ্চিত্রে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর অবদান রেখেছেন সেগুলো যদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে কী বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি।

দৈনিক 'নবযুগ'-এর তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে কবি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সহাবস্থান এবং নিরন্ন মানুষের দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে যেন দু'হাতে লিখেছেন। পুরোনো ফাইলের দিকে চোখ রেখে আমার সেটাই মনে হয়েছে। এই দৈনিক 'নবযুগ'-এ সাংবাদিকতার কাজ করতে করতেই অকস্মাৎ তাঁকে থেমে যেতে হয়, অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে তাঁর পেশা জীবন শুরু হয় সাংবাদিকতায়। শেষও সাংবাদিকতা দিয়েই। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এ সময় মুসলমানদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের ছবি চলচ্চিত্রে নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটা ফিল্ম কোম্পানীও তিনি করতে চেয়েছিলেন কয়েকজনের সহযোগিতায়। সবচেয়ে বড় কথা এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্বধর্মীদের জন্যও একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন। গণমাধ্যমে তাঁর ভূমিকা ছিল খোদ রবীন্দ্রনাথ থেকেও বহুগুণ বেশি। তাঁর কর্মজীবনে গণমাধ্যমে প্রচারও তিনি কিছু কম পাননি। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের থেকেও বহুগুণ বেশি। আজকের গণমাধ্যমে নজরুলকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে এ থেকে সেটা ধারণাও করা যাবে না।

www.pathagar.com

গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা

এবার গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা প্রসঙ্গে আসছি। গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, নিরক্ষর প্রধান এই উপমহাদেশে বিশেষত নিরক্ষর প্রধান বাংলার উভয় অংশে অডিও ভিজুয়াল গণমাধ্যমের ভূমিকা অর্থাৎ টেলিভিশন, অডিও ক্যাসেট, এবং চলচ্চিত্রের মতো গণমাধ্যম, যে মাধ্যমগুলি মারফৎ নিরক্ষর জনসাধারণও দেখে এবং শুনে সব কিছু জানতে, বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারেন, সেগুলির প্রভাব দৈনিক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার মতো গণমাধ্যমের চেয়েও অনেক বেশি। রেডিওর মতো গণমাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের কথা নিরক্ষর জনসাধারণেরও কানে পৌঁছে দেওয়া যায় বটে, এই মাধ্যমটি এই উপমহাদেশের, বিশেষত উভয় বাংলার নিরক্ষর, নিরন্ন জনসাধারণের কাছে তুলনামূলকভাবে পৌঁছেছে বেশি, কিন্তু এই অডিও মাধ্যমটির প্রভাব, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের মতো অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমের চেয়ে এক দিক থেকে অনেক কম। বাস্তব সত্যটা এই রকম যে, দৈনিক কাগজের মতো একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম দরিদ্র ও নিরক্ষর প্রধান দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। সে তুলনায় রেডিও একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে পৌঁছেছে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে। কিন্তু দেশের জনগণের শিক্ষিত, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত অংশটিই প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবেই হোক সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, আর্থ-রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সব কিছুই অর্থাৎ দেশের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। এই যে শেষোক্ত ব্যক্তিরা, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যালঘু হলেও এই উপমহাদেশের বাংলাভাষী জনসাধারণের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন– তাঁদের কাছে টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট, চলচ্চিত্রের মতো অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সহজলভ্য। অতএব নজরুল চর্চার প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে দেশবাসীর এই অংশের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, প্রভাবিত করার এবং প্রভাবিত হওয়ার, এই উভয় ব্যাপারেই। নজরুল চর্চার প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে এই শেষোক্ত অংশের যেসব ব্যক্তি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, আর্থ-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঙ্গনে নেতৃস্থানীয়, তাঁদের সম্প্রদায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি তাঁরা কীভাবে দেখেন বা দেখতে চান, এ সব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল চর্চার প্রসার ও প্রচার কতখানি হবে না হবে সে ব্যাপারে টেলিভিশনের মতো সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন অগ্রগণ্য, ঠিক তেমনি এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটিকে যারা প্রভাবিত করেন এবং এই গণমাধ্যমটি মারফৎ প্রভাবিত হন তাদের শ্রেণীস্বার্থের, সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের ব্যাপার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এরই পাশাপাশি আসে গণমাধ্যম যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, পরিচালনা করেন, বিষয় নির্বাচন বা পরিকল্পনা করেন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার, কবির জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে পড়াশুনার, জানাশুনার কথা। দৈনিক কাগজ বা সাময়িক পত্র হোক, কিংবা রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের মতো গণমাধ্যম হোক, মালিক হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে,

www.pathagar.com

প্রশাসক হিসাবে, সাংবাদিক কিংবা প্রযোজক অথবা পরিচালক হিসাবে, যাঁরা এখন দায়িত্বভার পাচ্ছেন তাঁরা স্কুল, কলেজ এবং বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী পড়েছেন না পড়েছেন, এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার বাইরে ব্যাপক ও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন খুব কম লোকই।

কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচি বা পাঠ্য তালিকার দিকে নজর দিলে বলা যাবে না যে, নজরুল জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের সংস্থান সেখানে আছে। নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্য তালিকায় নজরুল সাহিত্যের ওপর এক শ' নম্বরের একটা পেপারও নেই। তদুপরি নজরুল সাহিত্যের সামান্য যেটুকু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত আছে তাও 'বিকল্প' হিসাবে। আবশ্যিক করা হয়নি। ফলে যে কোনো ছেলে-মেয়ে নজরুল সাহিত্যের ওপর পড়াশুনা না করেও বাঙলায় এম. এ. পাস করতে পারেন। এরই প্রভাব পড়েছে গণমাধ্যমের সর্বত্র। গণমাধ্যমে নজরুলকে যেভাবে যতটুকু ঠাঁই দেওয়া হয় তার কতটুকু আমাদের গণমনের অনুভূতির তোয়াক্কা করে, কতটুকু আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আর কতটুকু অন্য প্রযোজনে বা অন্যান্য প্রয়োজনে তা একাধারে গবেষণা এবং বিতর্কের বিষয়। তবে গণমাধ্যমে নজরুল উপেক্ষার অনেক দৃষ্টান্তই আছে। নজরুলকে অসম্মানিত করার দৃষ্টান্তও কিছু কম নেই। আমি এখানে দু'-একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

কলকাতার দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকার বর্ষ ১২ ঃ সংখ্যা ৯২-এ ২৬ জুন ১৯৯২ তারিখ শুক্রবার 'প্রিয় সম্পাদক' স্তম্ভে চিঠিপত্র বিভাগে 'নজরুলের নয়?' শিরোনামে তিনটি চিঠি ছাপা হয়েছে। এই তিনটি চিঠির মধ্যে 'দূরদর্শন' ও 'আকাশবাণী'র মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমে নজরুল চর্চার প্রসার ও প্রচারের হালটা কী হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিপত্র বিভাগের প্রথম চিঠিতে নদীয়া থেকে অভিজিৎ দাস লিখেছেন ঃ

"১৮ জুন কলকাতা দূরদর্শনের 'সাহিত্য সংস্কৃতি'-তে নজরুলগীতির ওপর একটি অনুষ্ঠানসূচি সম্প্রচারিত হয়। প্রসঙ্গত বলা হয়, **'আমরা অনেক গান নজরুলগীতি হিসাবে জানি। কিন্তু সেগুলো নজরুলের লেখা নয়, তাঁর সুরারোপিত।'** অনুষ্ঠানসূচীর শুরুতেই নজরুল কণ্ঠের রেকর্ড বাজিযে শোনানো হল ঃ **'পাষাণের ভাঙালে ঘুম....।' এরপর দু'জন শিল্পী তিনটি গান গাইলেন, এবারও নজরুলের রেকর্ড বাজানো হল এবং বলা হল যে, এসব গানের রচয়িতা কাজী নজরুল ইস্‌লাম নন।** অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেও নজরুল কণ্ঠের রেকর্ড বাজিয়ে বড় বড় হরফের প্রশ্ন ঃ...'এটা কি নজরুলগীতি?' এ অনুষ্ঠান সূচির উদ্দেশ্য কী? নজরুলগীতি নিয়ে বিভ্রান্তির দিকটা তুলে ধরা, না, আমাদের প্রিয় কবিকে হেয় করা? অনুষ্ঠান সূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তারা নিজেদের কী ভাবেন?"

নজরুল তাঁর সমসাময়িককালে গণমাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি

www.pathagar.com

কভারেজ পেয়েছিলেন। সেই গণমাধ্যমই তাঁর অসুস্থতার পরে, বিশেষত তাঁর লোকান্তরিত হওয়ার পর এইভাবে তাঁকে হেয় করার জন্য এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নজরুল জনগণের কবি। শাসক শ্রেণীর কেউ, শাসক সম্প্রদায়ের কেউ, গণমাধ্যমের কেউ নজরুলকে অযথা ও অন্যায়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উপমহাদেশের নজরুলভক্ত জনসাধারণ তা মেনে নেবে না, যেমন মেনে নেননি অভিজিৎ দাস।

নজরুল বিষয়ক দ্বিতীয় চিঠিটির লেখক নাওভাঙ্গা থেকে তারকচন্দ্র দাস। তিনি লিখেছেন 'আকাশবাণী'র মতো আর একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমে নজরুল চর্চার কী হাল হয়েছে সে সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠান শুনে প্রভাবিত হয়ে। তিনি লিখেছেন ঃ

"১৪ জুন রাতে 'আকাশবাণী'র কলকাতা কেন্দ্র' 'নজরুলের সব গান নজরুলের নয়, এই নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। তারকচন্দ্র দাস এ প্রসঙ্গেই লিখেছেন ঃ 'পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কিছু গান খুদে শিল্পীরা যে গায়, তার মধ্যে কিছু গান রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়। একটি অনুষ্ঠানে অতিথি থাকার সুবাদে আমি এমন একটি গান শুনেছিলাম। গানটির কথাগুলি হল ঃ "আমি তোমারে ওগো ভুলিব না। তুমি যদি...।" গানটির গীতিকারের নাম আমার জানা নেই। তবে গানখানি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়।"

শেষ চিঠিটি লিখেছেন বীরভূমের সিউড়ি থেকে প্রহেলিকা সাহা। এই চিঠিতে নজরুল সঙ্গীত সংরক্ষণের বিষয়ে তাঁর গঠনমূলক সুপারিশ আছে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দিকটি তুলে ধ'রে তিনি লিখেছেন ঃ

"কাজী নজরুল ইসলামের কিছু গান এখনও অপ্রকাশিত। বহু গান এখনও সুরারোপিত হয়নি। বিভ্রান্তির হাত থেকে নজরুলগীতিকে রক্ষা করতে হলে সব গান প্রকাশ করা দরকার। দ্বিতীয়ত, সুরের অসঙ্গতি রুখতে হলে 'বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড' জাতীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু কাজটি করবে কে? নজরুল গীতি চিরদিন অভিভাবকহীন হয়ে থাকবে?"

প্রহেলিকা সাহার এই প্রশ্নের উত্তর কোন্ দেশের কোন্ সরকার কবে দেবে জানি না।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন যে আমাদের জাতীয় কবিকে হেয় করতে জানে, হেয় করতেও পারঙ্গম সে প্রসঙ্গে এই ১৯৯৩'র মে মাসেরই দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো।

৭ মে ১৯৯৩ তারিখ শুক্রবার সকাল। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ছোট ছেলে-মেয়েদের অনুষ্ঠান 'নতুন কুঁড়ি'-তে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। মরহুম কবি গোলাম মোস্তফার আত্মীয়া নিমা রহমান প্রথম যাকে আবৃত্তি করার জন্য পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সম্পর্কে বললেন যে, সে আবৃত্তি করবে কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা। যাই হোক, কবি গোলাম মোস্তফার মতো একজন বিখ্যাত কবি বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর

www.pathagar.com

সুবাদেই পাত পেলেন কিনা জানি না। কিন্তু এর পর চললো পালাক্রমে পৌনঃপুনিকভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুকুমার রায় আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি। মাঝখানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা আবৃত্তি হল মাত্র একটি। এই ঘাঁটতি সেই দিন কিঞ্চিৎ পূরণ করার চেষ্টা করলেন খ্যাতনামা আবৃত্তিকার কাজী আরিফ। বিচারকের বক্তব্য প্রদানকালে নজরুলের একটা কবিতা তিনি স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন।

প্রায় এই একই রকমের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল ১৪ মে ১৯৯৩ তারিখ শুক্রবার সকালে প্রজ্ঞা লাবণীর উপস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের অনেকগুলি করে কবিতা আবৃত্তি করা হল। তদুপরি প্রজ্ঞা লাবণীও রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। জাতীয় কবি নজরুল ইস্‌লামের যে একটি মাত্র কবিতা আবৃত্তি করতে দেওয়া হ'ল সেটা আবৃত্তি করেছিল অচিরা ভট্টাচার্য। তার আবৃত্তিটাই সবদিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল মনে হলেও কেন জানি না, তাকে কোনো পুরস্কার দেওয়া হল না। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও ব'লবো যে পুরস্কার দেওয়া না দেওয়ার বিষয়টি যদি বিতর্কের বিষয় হয়ও তবু এক্ষেত্রে নজরুলের একটি মাত্র কবিতা আবৃত্তি করাটা কী করে উচিত ব্যাপার ব'লে বিবেচিত হতে পারে?

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটকে যেখানে গান থাকে, সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র সঙ্গীতই কেবল থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মনোভঙ্গিতেই নজরুল চর্চার অন্যান্য বিষয়গুলিও সম্পন্ন হয়। রেডিও বাংলাদেশের অনুষ্ঠানে নজরুল অতখানি উপেক্ষিত না হলেও নজরুল চর্চা যে সেখানেও খুব সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে এমনটা জানা যায়নি। আমাদের চলচ্চিত্রের এখন যা হাল তাতে সেখানে নজরুল চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ঠাঁই থাকার কথা নয়। দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার মতো গণমাধ্যমে নজরুল চর্চার বিষয়টি এক এক প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম। তবে আনন্দবাজার পত্রিকার মতো দৈনিক কাগজ, 'দেশ'-এর মতো সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা রবীন্দ্রচর্চাকে যতখানি ব্যাপক করতে সহায়ক হয়েছে, সেই শক্তিশালী ভূমিকা আমাদের কোনো পত্র-পত্রিকা নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

গণমাধ্যমে নজরুল যে বিশাল এবং বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন তার অনেক কিছুই অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা এ যাবৎ যেমন কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিনি, তেমনি অন্য দিকেও অজ্ঞতা কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, গণমাধ্যমে নজরুলকে খাটো করে দেখানোর যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে রোধ করারও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। গণমাধ্যমগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিভিন্ন দিক গঠনমূলক আলোচনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে তুলে ধরার তেমন কোনো সুপরিকল্পিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না; নজরুল সঙ্গীতের বাণী, সুর ও গায়কী বিকৃতির এবং নজরুল ইসলামের বিপুল সংখ্যক গানের মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক গানের পুনরাবৃত্তি রোধের

www.pathagar.com

কোনো চেষ্টা নজরে আসে না; নজরুল ইসলামের নিজের লেখা নাটক ও নাটিকাগুলি প্রচারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না, নজরুলের ও নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলির প্রিন্ট সংগ্রহ ও সম্প্রচারেও কোনো উদ্যোগ নেই। এ রকম অনেক অনুযোগই তো পেশ করা যায়।

মোদ্দা কথা হল ঃ গণমাধ্যম মারফৎ নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন দিকগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে, সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার কোনো আন্তরিক, সাংগঠনিক উদ্যোগের খবর এ যাবৎ আমরা কখনো পাইনি। অনুরূপভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে নজরুল যে বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান রেখেছে তার একটা বড় অংশ এখনো উদ্ধার ও সংরক্ষণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত এখনো করা হয়নি। তাঁর সমসাময়িক গণমাধ্যমগুলি মারফৎ নজরুল যে বিশাল অবদান রেখেছেন সেগুলি উদ্ধার ও সংরক্ষণ করাটা খুবই জরুরি এবং অপরিহার্য কাজ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে কবি কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত কোন্ কোন্ শর্তে বা চুক্তিতে কীভাবে দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন সে-সব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ছবি, পুরো নথি-তথ্য এখনো আমাদের চোখের সামনে উঠে আসেনি। কিন্তু এইসব তারিখ–তথ্য, নজরুল জীবনীর এই সব উপাদান একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনীর জন্যও নিতান্তই অপরিহার্য।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে ম্যাডান থিয়েটার্সে যোগ দেওয়ার পর থেকে ১৯৪২-এর মাঝামাঝি অবধি নজরুল ইসলাম তাঁর সুস্থাবস্থায় শেষের এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সব্যসাচীর মতো দু'হাতে বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্মে, বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর কয়েক হাজার রেকর্ডে, বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানে কলকাতা ও ঢাকা বেতারে— বিশেষত কলকাতা বেতারে— দৈনিক নবযুগ-এর তৃতীয় ও শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় একই সঙ্গে যে অনন্য ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন সেটা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনের এক বিস্ময়কর ঘটনা। চলচ্চিত্রকার নজরুল, নাট্যকার নজরুল, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক নজরুল, গায়ক এবং অভিনয় শিল্পী নজরুল, প্রযোজক নজরুল, সঙ্গীত প্রশিক্ষক নজরুল, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নজরুল— একই সঙ্গে এরকম কত পরিচয় তাঁর। প্রথম পর্যায়ের দৈনিক নবযুগ থেকে শেষ পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ' পর্যন্ত, কাগজগুলোর অধিকাংশ সংখ্যার জেরক্স কপিও তো সংগ্রহ করা হয়নি। ইতোমধ্যে তাঁর অবদানের অনেক কিছু তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেরাই নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ১৯৩৯-এর ১২ নভেম্বর কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত 'উদাসী ভৈরব' নাটক যে জগৎ ঘটকের নয়, নজরুলের, সেটা গত ২৭ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নজরুল জীবন ও সাহিত্যে রাজনীতি

একটা বিশেষ সময়ে একটা দেশের রাজনীতি দেশের সে সময়কার সর্বস্তরের জনগণের ওপর নানান দিক দিয়ে প্রভাব ফেলে। কোনো সময়েই মানুষ তার দেশের রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কেননা, একটা দেশের রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, ইত্যাকার সব কিছুই। ফলে, একটা দেশের জাতীয় কবি সে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে কোনোক্রমেই উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ, তিনি জানেন, রাজনীতি তাঁকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি প্রভাবিত করে সর্বস্তরের জনগণকে।

রাজনীতি সাধারণভাবে শাসকগোষ্ঠীকে, শাসক সম্প্রদায়কে, শাসক শ্রেণীকে সুবিধাভোগী হওয়ার সুযোগ দেয়। অনুরূপভাবে এই রাজনীতিই কোনো কোনো জনগোষ্ঠীকে, কোনো কোনো সম্প্রদায়কে, কোনো কোনো শ্রেণীকে নানান দিক দিয়ে বঞ্চিতও করতে পারে।

এ দেশের গণমানুষের কাছে নজরুল একজন খুব বড় মাপের কবি। তাঁর সময়েও অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িক কালেও তাঁর অবদান দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। ফলে, দেশের নানান জায়গার মানুষ তাঁকে অভিনন্দিত ও সম্বর্ধিতও করেছে। এত সম্বর্ধনা দেশের আর কোনো কবি কখনোই পাননি।

নজরুল কেবল কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, কথা-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক, এমনকি, রাজনৈতিক চিন্তা নায়ক, রাজনীতিক কর্মী বা সক্রিয় রাজনীতিক নেতা। অতএব 'নজরুল জীবন ও সাহিত্যে রাজনীতি' কী রকম ভূমিকা পালন করেছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা খতিয়ে দেখার একটা প্রয়োজন আছে। এই বিষয়টির ওপর যথার্থ গবেষণামূলক কাজ করতে হলে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাকার অনেকগুলো বিষয়ের ইতিহাসটা জানতে হবে। বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাসটা অনুপুঙ্ক্ষ জানতে হবে।

জীবনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, এই উভয় দিক দিয়েই কেবল অবিচ্ছেদ্য নয়, অপরিহার্য এবং অনিবার্য। কেননা, একটা দেশের সরকার যে রাজনীতি অনুসরণ করে সেই রাজনীতিই সে দেশের নানান স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক ভাগ্য, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য, ইত্যাকার সব কিছুই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিষয়টা এভাবে দেশের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত করে বলেই এর প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যেও পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাবের কথা যদি বিবেচনা করি তবে দেখা যাবে যে,

www.pathagar.com

এই প্রভাব নজরুল-পূর্ব কবি সাহিত্যিকদের লেখায় যেমন আছে, তেমনি আছে নজরুল পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের লেখায়ও। নজরুলের নিজের লেখায় তো রাজনীতির প্রভাব বিভিন্নভাবে আছেই।

নজরুল সাহিত্যে ও শিল্পে রাজনীতির প্রভাব নানানভাবে থাকার অনেক কারণও আছে।

জন্মের পর শৈশবে ও বাল্যে নজরুল পেয়েছিলেন একটা বনেদী অথচ দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার।

নজরুল জন্মেছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। আর এই ঔপনিবেশিক শাসন উপমহাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও শোষণ কেন্দ্রও ছিল বাংলায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৯১১ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজধানীও ছিল কলকাতায়। ১৯১২-য় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। অতএব নজরুল জন্মেছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মূল শোষণ কেন্দ্র বাংলায়।

তদুপরি এই একই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রিটিশরা যাঁদের হাত থেকে অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা নিয়েছিলেন, নজরুল ছিলেন সেই সম্প্রদায়েরই একজন উত্তরাধিকারী। এই সম্প্রদায়ের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা নেওয়ার ফলে ব্রিটিশরা এই সম্প্রদায়টিকে সব সময় কাউন্টার পার্ট বা প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা ভূমি ও রাজস্বনীতি, ভাষানীতি অর্থাৎ সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসাবে ফার্সির স্থলে ইংরেজি প্রবর্তন এবং উর্দু-হিন্দী বিরোধ সৃষ্টি করে হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করা, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি এ সবের ফলে এবং সরকারি অফিস-আদালত থেকে মুসলিম বিতাড়নের ফলে রাজানুগ্রহ বঞ্চিত অত্যন্ত বনেদী মুসলিম পরিবারগুলোর অবস্থাও দিনকে দিন সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় মুসলমানদের এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। পৃথক পৃথকভাবেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের সুবিধাভোগী শ্রেণীর তুলনায় এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নজরুলের কাছে তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থ দাঁড়ালো কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামও বটে।

ফলে সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকা কালেও তিনি "ব্যথার দান", "বাঁধন-হারা" প্রভৃতি যে-সব উপন্যাস লিখেছিলেন সেগুলিতে আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের কথা আছে।

ঠিক এই একই চেতনার প্রকাশ সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন এবং সেনাবাহিনী থেকে তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর লেখা কবিতাগুলির কোনো কোনোটিতেও আছে।

www.pathagar.com

এমনকি, 'শাত-ইল-আরব'-এর মতো কবিতাতেও আছে।

তিনি প্রথম যে কাগজে সাংবাদিকতায় যোগ দেন ১৯২০-এ প্রকাশিত সেই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর অনেক প্রবন্ধেই আছে।

এরপর তাঁর 'দৈনিক সেবক' এবং 'দৈনিক মোহাম্মদী'র লেখাতেও আছে।

এরপর তিনি যে নিজ সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করলেন, সে সময়ের লেখাতে তো আছেই। এই অর্ধ-সাপ্তাহিক "ধূমকেতু"তেই তাঁর নিজের লেখার জন্য এবং অন্য একটি লেখা সম্পাদনার জন্য তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইতোপূর্বে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি যে জবানবন্দী দেন সে জবানবন্দীও তো রাজবন্দীর জবানবন্দী হিসাবে সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

স্বাধীনতা স্পৃহায় জেল কোড ভঙ্গ করায়ও অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার বাণী থাকার কারণে নজরুলের অনেকগুলো বই ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত হয়। এর বাইরেও কিছু বই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল।

রাজনীতির প্রভাব নজরুলের গানে, নাটকে, নিবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, অভিভাষণে স্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন, উভয়ভাবেই নানান দিক দিয়েই আছে। যেমন, সেনাবাহিনীতে থাকাকালে লেখা "ব্যথার দান"-এর মতো উপন্যাসে দেখি রুশ বিপ্লবের খুবই স্পষ্ট প্রভাব।

কাব্যগ্রন্থ "অগ্নিবীণা"র "বিদ্রোহী"তে পড়েছে ১৯২১-এর ডিসেম্বরে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, এই উভয় অধিবেশনে উত্থাপিত স্বাধীনতা প্রস্তাবের প্রভাব। এই উভয় অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি, সমাজসেবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা ফজলুল হাসান হসরৎ মোহানী। মুসলিম লীগ অধিবেশনে তো তিনি মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন। শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'বিদ্রোহী' এরই অব্যবহিত পর লেখা।

"অগ্নিবীণা"র 'শাত-ইল্-আরব' কবিতায় তো তিনি আন্তর্জাতিক আঙিনায় মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি সংগ্রামীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা স্মরণের পাশাপাশি তাঁর নিজের পরাধীন দেশের মুক্তি আকুতির কথাও ব্যক্ত করেছেন।

সেনাবাহিনীতে থাকতেই কবি রাজনীতি চর্চা করেছেন। তাঁর সে সময়কার লেখায় তাঁর রাজনীতি চর্চার, তাঁর স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ছাপ আছে।

১৯২০-এর গোড়ার দিকে কলকাতায় ফেরার পর এক দশকেরও বেশি, প্রায় এক যুগ যাবৎ নজরুল সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। প্রথম দিকে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে। পরে করেছেন সাম্যবাদী রাজনীতি। তাঁর সাম্যবাদী সিরিজের কবিতা ও গানগুলো আমাদের সাহিত্য ও সঙ্গীতে এক অভূতপূর্ব

www.pathagar.com

ও অবিস্মরণীয় সংযোজন।

কিন্তু অনুদার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি তিনি কখনোই পোষণ করতেনা। ফলে মুসলিম লীগ সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য তিনি কোথাও করেননি। অবশ্য হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে একটা আপত্তির পরিচয় তাঁর লেখায় কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আর গান্ধীর মতো শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের কারো কারো সমালোচনা করেছিলেন তিনি। সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও।

মুসলিম লীগকে যে তিনি সমালোচনা করেননি, এর একটা কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, মুসলিম লীগের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দাবী-দাওয়াগুলো ছিল আত্মরক্ষামূলক। অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণের লক্ষ্যে কোনোক্রমেই আক্রমণাত্মক নয়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি করেছেন হিন্দু মহাসভার পণ্ডিত মালব্যদের সঙ্গে। এবং কংগ্রেসের গান্ধী, নেহরু পরিবার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময়ে শান্তি নিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের কথা নেই।

এখনকার দিনে রাজনীতিতে নজরুলের ভূমিকা প্রসঙ্গে এই চিত্রটা মনে রাখা দরকার।

'নবযুগ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর লেখা নিবন্ধগুলোর কয়েকটি পরে "যুগবাণী" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিতে কবির ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আবেগ প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের হরেক রকমের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আকারে।

অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পর্বের লেখায় ভারতের সন্ত্রাসবাদী তথা সশস্ত্র বিপ্লববাদী রাজনীতিকে তিনি উৎসাহিত করেছেন।

সাপ্তাহিক 'লাঙল' তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পর্যায়ে তাঁর লেখায় কৃষক, শ্রমিক, মুটে, মজুর, ধীবর, তাঁতী প্রভৃতি মেহনতী মানুষের আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনায়। শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতির কথাও তাঁর এই পর্যায়ের লেখায় আছে।

সাম্যবাদী চেতনারই স্ফূরণ লক্ষ্য করি তাঁর 'গণবাণী' প্রকাশিত হওয়ার সময়কার লেখায়।

ত্রিশোত্তরকালে নজরুল সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে ক্রমে সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতে, বিশেষত সঙ্গীত জগতে নিমগ্ন হলেন। ইতোপূর্বে আটটি বছর তিনি মেহনতী মানুষদেরকে সচেতন করার বা জাগিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় তামাম বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ ব্যাপকভাবে সফর করেন।

কিন্তু সাংগঠনিক দিক দিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নজরুল কিঞ্চিৎ সরে আসলেও

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখায় তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যেমন, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট, বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠক, সাইমন কমিশন রিপোর্ট, প্রাইমারী শিক্ষা বিল, ইত্যাদি নানান বিষয়ে।

তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও অভিভাষণে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের বিষয়েও অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই আলোচনা-সমালোচনা আছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীন-ভারতের মৈত্রীর কথাও তিনি লিখেছেন।

খেটে-খাওয়া মানুষদেরকেও শ্রেণী-সংগ্রামে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজরুলের মতো আর কোনো কবি-সাহিত্যিক তামাম বাংলাদেশ এবং আসাম সফর কারেননি। তাঁর মতো আর কেউ রাজনীতিকে নানান দিক দিয়ে সাহিত্য-সঙ্গীতে, অভিভাষণে এতখানি স্থান দেননি। এসব নানান কারণে নজরুল জীবন ও সাহিত্যে রাজনীতি একটা পৃথক গবেষণার বিষয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনীতি সক্রিয়ভাবেও কবি-সাহিত্যিকদের আরো কেউ কেউ করেছেন এবং আরো কারো কারো লেখায় রাজনীতির প্রভাব আছে, রাজনীতির কথা সরাসরিও আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও নজরুলের একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। তুলনাটা রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলা সাহিত্যের আর একজন বড় কবির সঙ্গেও করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কেবল আপন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভেবেছেন। কিন্তু নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের কথা বলেছে এবং এটাই উপমহাদেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। আর এ ব্যাপারে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুলের কোনো পূর্বসূরি ছিল না এবং নেই কোনো উত্তরসূরিও। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে নজরুল জীবন ও সাহিত্যের এ-ও এক অনন্য অবদান।

কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, অভিভাষণে এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষদেরকে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার মতো তাঁর সমপর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ তাঁর আগে এবং তাঁর সমসাময়িক কালে যেমন ছিলেন না, ঠিক তেমনি তাঁর পরেও তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।

এই মহৎ কবি তাঁর জীবদ্দশায় সুস্থাবস্থার শেষ দশকটি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে কোনোভাবেই আর যুক্ত ছিলেন না। এর কারণগুলো যে কী সে উল্লেখ তাঁর নানান লেখাতেই আছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের অনুদার স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যুবশক্তিকে ভারবাহী হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। রাজনীতি আর জনসেবার বিষয় হিসাবে থাকছে না। রাজনীতি হয়ে পড়ছে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। রাজনীতি

www.pathagar.com

ক্রমে একটা পেশা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। নীতিগত কারণে বিশেষত ঠিক এইখানেই ছিল নজরুলের আপত্তি।

অবশ্য নজরুল মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো সময়েই সংশ্লিষ্ট না থাকলেও মুসলিম লীগের রাজনীতি এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেননি। বরং পরোক্ষভাবে হলেও তাঁর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলার মুসলিম যুবশক্তি যে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং এটা যে এ ক্ষেত্রে মূলত তাঁরই অবদান, সে উল্লেখ তাঁর লেখাতেই আছে।

এই কাজটা অবশ্য নজরুল খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্নভাবে করতে যাননি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে বাংলার যুবশক্তিকেই তিনি জাগাতে গিয়েছিলেন তাদের নিজ নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। এভাবে তিনি কাজ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম যুব শক্তিকেও জাগিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি অবশ্য মুসলিম লীগের জন্য আলাদাভাবে এই কাজটা করতে যাননি।

তাঁর অনুপ্রেরণায় হিন্দু সম্প্রদায়ের যে যুব শক্তির জাগরণ ঘটেছিল তারা পরেও কংগ্রেস করেছেন, হিন্দু মহাসভা করেছেন, নানান কমিউনিস্ট পার্টিও করেছেন।

তাঁর লেখায় অনুপ্রাণিত মুসলিম যুব শক্তির একটা অংশও নানান ধরনের কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন।

তাঁর নিজের সময়ে নজরুল তখন সামগ্রিকভাবে বাংলার যুব শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাদের নিজেদের আত্মশক্তিতে, আত্মবিশ্বাসে, সততায়, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, মানবিকতায়, তাদের নিজ নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্যে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে, শিক্ষায় ও স্বাধীনতা স্পৃহায় এবং অর্থনৈতিক সাম্যবোধে এবং সামাজিক সুবিচার চিন্তায়। নজরুল তাঁর শিল্পী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনোই এর কোনোটির সঙ্গেই আপোষ করেননি। অর্থাৎ নজরুলের চিন্তা-চেতনায় কখনোই পারম্পর্যহীনতা বা অসঙ্গতি দেখা দেয়নি। বক্তব্য বিষয়ে পূর্বাপর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথে যতই থাকুক না কেন, নজরুলে আদৌ ছিল না।

নজরুল তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে নিজেকে যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন, সেটা তিনি করেছিলেন নিজেকে কোনোভাবেই অনুদার এবং খাটো করতে চাননি বলেই। তাছাড়া আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নানান প্রশ্নে তখন হিন্দু স্বার্থ ও মুসলিম স্বার্থের সংঘাতটা ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছিল। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও নজরুল প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়েই তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আজকের আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিকরা এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নজরুলের এই আদর্শটুকুও যদি অনুসরণ করেন তাহ'লে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষ নিশ্চয়ই নানান দুর্ভোগ থেকে অনেকখানিই রেহাই পাবেন।

www.pathagar.com

অন্তত নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের চর্চাটাও যদি আমরা করতাম, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারার খোঁজ-খবরটুকু যদি আমরা রাখতাম তাহলে আর কিছু না হোক, এটা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজ হতো যে, আমাদের এখনকার শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের কারো কারো অনৌদার্যটা কত ভয়াবহ রকমের, তাঁদের রুচির মান, ব্যক্তিত্বের মান কত নিচের। আমরা নজরুল-চর্চা করলে অন্তত এই অনুদারতা থেকে, এই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু সে কাজটাও আমরা করছি না। আমরা বরং নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থে এই মহৎ কবিকে উপেক্ষা করার কিংবা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি!

www.pathagar.com

নারী ও নজরুল

নজরুল ইসলামের "কুহেলিকা" উপন্যাসটা শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

"নারী লইয়া আলোচনা চ'লিতেছিল।.....

তরুণ কবি হারুণ তাহার হরিণ চোখ তুলিয়া কপোত কুজনের মত মিষ্টি করিয়া বলিল, 'নারী কুহেলিকা।'

যে স্থানে আলোচনা চ'লিতেছিল, তাহা আসলে 'মেস্' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।"

বোঝা গেল, 'নারী কুহেলিকা', এটা তাঁর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কবি হারুণের কথা। কিন্তু নারী সম্পর্কে ঔপন্যাসিক কবি কাজী নজরুল ইসলামের ধারণাটা কী? সেটা কী এ রকমই নেতিবাচক?

থাক্ নজরুল ইসলামের কথা এখন।

প্রশ্নটা হলো ঃ নারীকে কুহেলিকা বলে কারো মনে হতে পারে কখন?

প্রিয় নারীকে কখনো না পেলে?

কোনো নারীকে ভালোবেসে না পেলে হারুণের মতো কবিদের পক্ষে হয়তো প্রতিটি নারীকে ঢালাওভাবে কুহেলিকা ভাবা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কোনো মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে, নজরুল ইসলামের মতো এমন বড় মাপের জীবন-শিল্পীর পক্ষে কখনোই কি কোনো নারীকে কুহেলিকা ভাবা আদৌ সম্ভব ?

নজরুল নিজে বলেছেন, তাঁর জীবনী লেখা রয়েছে তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গীতে। সেখানে কোথাও কোথাও তাঁর নিজের কথা, নিজের জীবন বোধের কথা-ও এসেছে। নজরুল তো নিজেই লিখে গেছেন যে, তাঁর 'কথা লুকিয়ে থাকে' তাঁর 'গানের আড়ালে।'

তাঁর নানান লেখায় দেখি, বিশেষভাবে নারীর কাছেই মানসিক আশ্রয় চেয়েছেন তিনি। নারীকে তিনি নিজে কুহেলিকা ভাবলে এই আশ্রয় প্রার্থনার, এই আশ্রয় চাওয়ার প্রশ্ন কিন্তু ওঠে না, কখনো ওঠার কথাও কিন্তু নয়! নারীকে নিজের থেকে-ও বড় ভাবলে কোনো পুরুষের এমন অনুভূতি হতে পারে।

নারীকে তিনি অবশ্য 'রহস্যময়ী' বলেছেন। তবে তাঁর এই উপলব্ধি অবাস্তব বা অসত্য তো নয়! কেননা, পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয়া করে রাখতে চাইলে প্রতিটি নারীকেই জানতে হয়, বুঝতে হয় তিনি তাঁর প্রিয়তমের কাছেও নিজের রহস্য কখন কতখানি উন্মোচন করবেন। প্রেমেও নারী একজন পুরুষের চেয়ে অনেক সহনশীল বলেই বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করেও এমনটা পারেন।

মেয়েদের কেবল শারীরিক সৌন্দর্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলেই চলে না, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আন্তরিকতা এবং সংযমও তাদের থাকতে হয় এবং থাকেও।

www.pathagar.com

আকর্ষণ করার মতো, আকর্ষণ করে ধরে রাখার মতো মানসিক সৌন্দর্য্য না থাকলে কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য দিয়ে কোনো নারী কখনো কোনো পুরুষকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না। শারীরিক সৌষ্ঠব, শারীরিক সৌন্দর্য্যের চেয়েও কোনো নারীর ব্যক্তিত্ব, মানসিক ঔদার্য্য ও রহস্যও একজন পুরুষকে আকর্ষণ করে অনেক বেশি এবং সেটা স্থায়ীভাবেই। নারীর দৈহিক আকর্ষণ পুরুষের দৃষ্টির, পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার জোয়ার-ভাঁটার শিকার হতে পারে; কিন্তু সংবেদনশীল মনের, স্পর্শকাতর মনের একজন নারীর ব্যক্তিত্ব, ঔদার্য, মননশীলতা এবং রহস্যময়তা স্পর্শকাতর মনের একজন পুরুষকে চিরদিন টানবে। ফলে, একজন নারীকে তাঁর শৈল্পিক বুদ্ধি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে সব সময় নির্ধারণ করে নিতে হয় একজন পুরুষের কাছে তাঁর রহস্য কখন কতখানি উন্মোচিত করবেন তার সীমা-রেখাটি। নজরুলের মতো স্পর্শকাতর মনের একজন ব্যক্তিত্ববান এবং প্রতিভাবান পুরুষকে কেবল শারীরিক নয়, প্রয়োজনীয় মানসিক সান্নিধ্যটুকু দিয়ে ধরে রাখতে পারেন, এমন কোনো ব্যক্তিত্ববান বিদুষী নারীকে নজরুল কি চিরসাথী হিসাবে পেয়েছিলেন কখনো?

নজরুল জীবনে 'রহস্যময়ী' হয়ে এসেছিলেন একমাত্র মিস্ ফজিলাতুন্নেসা। তবে রহস্যের খেলা খুব বেশি বেশি খেলতে গিয়ে প্রেয়সী নারীর ভূমিকায় আসার শুভক্ষণটি, লগ্নটি তিনি আবার চরম উপেক্ষায় অবহেলায় হারিয়েছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর ভূমিকায় না আসার চরম মূল্যটি তিনি পরে তাঁর নিজের বিবাহোত্তর জীবনে পরিশোধ করে গেছেন।

নজরুল সাহিত্যে প্রেমের কথা, ভালোবাসার কথা বিস্তর আছে। নানান ভাবেই আছে।

বিরহের কথাও আছে।

এসব কিছুই আছে কেবল তাঁর নিজস্ব এলেমে নয়, অর্থাৎ কেবল পড়াশুনা বা পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির গভীরতায়।

তাঁর নিজস্ব একটা অত্যন্ত সুস্থ, পরিপূর্ণ এবং গভীর জীবনবোধ ছিল বলেই এসব ব্যাপারে কোথাও তাঁর তরফে কোনো রকম পল্লবগ্রাহীতা ছিল না।

নারীর শরীরকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁর স্বপ্ননায়িকা তাঁর কাছে কখনোই শরীরসর্বস্ব বা দেহসর্বস্ব কিছু ছিলেন না।

মাটির পুতুলের শহর কৃষ্ণনগরের স্মৃতিকথায় এম. আকবর উদ্দিনের লেখায় দেখছি, নারীকে নজরুল চোখে চোখ রেখে দেখতে পারতেন। নারীর সঙ্গে তিনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতেন তাঁর চোখে চোখ রেখেই।

নারীর সান্নিধ্যে তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে যে কথা বলতে পারতেন, এমনটা কী করে সম্ভব হতো এ বিষয়ে কৃষ্ণনগরে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদ এম. আকবর উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি ফুল ভালোবাসেন না?"

www.pathagar.com

এই উদাহরণটা থেকে আর একটা কথা স্পষ্ট, প্রতিদান না পেলেও ভালোবাসতে পারতেন নজরুল। কেননা, ফুল আপন সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে সবাইকে আকর্ষণ করে ঠিকই; কিন্তু প্রিয়তমাজ্ঞানে আলাদা করে তো কাউকে আকর্ষণ করে না!

নারীর প্রসঙ্গে এটাই ছিল নজরুলের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ! এই ফুলকে তিনি কখনো তার বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিনষ্ট ক'রে এর সুবাস পেতে চাননি। তাই বারবণিতা পাড়া থেকে সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় উঠে আসা ইন্দুবালাকেও তাঁর শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখেছি তাঁর কাজীদার প্রসঙ্গ উঠলেই কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের কাজীদার কথা বলতেন! তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তো।

এটা ছিল তাঁদের কাছে তাঁদের স্বপ্নপুরুষের কথা বলা, তাঁদের স্বপ্নপুরুষের স্মৃতি চারণ! সম্ভোগসর্বস্ব দেহবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে এই সূক্ষ্ম পবিত্র অনুভূতিটি আসার কথা নয়। কেননা, স্থূল রুচির ভোগী পুরুষদেরকে তো এই সব নারীরা কিছু কম দেখেননি!

নজরুল আবশ্যিকভাবে সব সময় সেক্স-বিবর্জিত প্রেম বা নিষ্কাম প্রেমের কথাই বলেছেন, এমনটাও কিন্তু নয়। নজরুল জীবন ও সৃষ্টির দিকে চোখ রাখলে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়, নজরুল রক্ত-মাংসের একজন সুস্থ পুরুষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন শিল্পী, অত্যন্ত স্পর্শকাতর মনের, সংবদনশীল মনের জীবন-শিল্পী!

দেহাতীত প্রেমের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপরূপ সুষমা আছে, আকর্ষণীয় অথচ সূক্ষ্ম মাধুর্য আছে; একটা স্নিগ্ধ, অবিস্মরণীয় রোমান্টিকতা আছে। কবির কৈশোরের সেই রোমান্টিসিজমটা তাঁর সুস্থাবস্থায় বরাবরই ছিল। তাঁর সাহিত্যেও সেটা রয়ে গেছে। সেই রোমান্টিসিজমটার কথা আত্মজীবনী লিখে বা তেমনিভাবে চিঠিপত্রে পাবলিক লাইফে এনে তিনি তেমন কিছুই বলতে চাননি। সেটা তিনি একান্তে অনুভব করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে সেটা নানাভাবে প্রকাশও করেছেন। এই সম্পর্ক ভালোবাসার, এই সম্পর্ক গভীরভাবে দু'জনে দু'জনকে জানার, তাঁদের নিজেদেরকেও নতুন করে জানার। অপরিসীম গভীরভাবে ভালোবাসলে একজন প্রেমিক বা প্রেমিকা নিজেকে নতুন করে দেখতে পায়, আবিষ্কার করে!

নজরুল সৃষ্টিতে আছে প্রেমানুভূতির মুগ্ধতাবোধ, প্রেমানুভূতিতে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট হওয়ার মতো সৌন্দর্য্যবোধ এবং মানসীর প্রতি তাঁর নিষ্পাপ, অর্থাৎ শরীরী নয়, মানসিক ভালোবাসার নস্টালজিয়া। নজরুলের মনের অ্যালবামে তাঁর কোনো প্রেয়সীর ছবি ছিল যাঁকে হৃদয়ে রেখে নিশ্চয়ই যাঁকে উদ্দেশ করে তিনি অজস্র বিরহের গান লিখেছেন। অন্তত ইমোশনাল ডিসচার্জের অর্থাৎ আবেগের অভিপ্রকাশের তাগিদে।

আজকের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে পরিকল্পিত আধুনিক, ট্রেলডি, ফাস্ট, দেহবাদী জীবন সম্পর্কে কোনো আগ্রহ যেমন ছিল না তাঁর, ঠিক তেমনি আবার ভালোবাসা থেকে অযথা শরীরকে মুছে দেওয়ার

www.pathagar.com

কোনো সংকল্প বা সংস্কারও তাঁর ছিল না। তবে তাঁর সাহিত্য সঙ্গীত এবং চিঠিপত্রগুলির অনেক কিছুই সাক্ষ্য দেয়, অতীন্দ্রিয় বোধ বা নিষ্কাম প্রেমের সৌন্দর্য্যে সমান অবগাহন করেছেন তিনি। ইন্দ্রিয়ের, পঞ্চেন্দ্রিয়ের ছোট, ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকু ছেড়ে সমস্ত ক্লেদ, পঙ্ক ঝেড়ে ফেলে, দূরে সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্রিয় হয়ে নজরুলের ভালোবাসা এবং সুন্দর একই বিন্দুতে মিলেছে, যেখানে শরীরী মিলনের লোভের ছোঁয়াও নেই, আছে এক চিরন্তন সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, যা অনির্বচনীয়, অলোক সামান্য এবং একই সঙ্গে বিষাদান্ত এবং ব্যথা সুরভিত।

নজরুলের প্রেমানুভূতি দেহজ নয়, দেহাতীত। তা কিছুতেই আটপৌরে প্রাত্যহিকতায় মলিন বা কালিমালিপ্ত নয়। তাঁর প্রেমে শরীরী সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা চোখে পড়ার মতো নয়; আর শরীরপ্রবণতা না থাকায় সে প্রেম কখনোই নিত্য ব্যবহারের বস্তুও হয়ে ওঠেনি।

শরীরী মিলনেও তা নিঃশেষিত হওয়ার নয়, এতটুকুও অনাকর্ষণীয় হওয়ার নয়!

একটা ইন্দ্রিয় বিরহিত প্রেমকে, প্রেমের হাহাকারকে নিজের নিজস্ব জীবনে পরম শ্রদ্ধায় এবং মর্যাদায় বেদী পেতে বসানোর সুযোগ হয়েছিলো তাঁর।

তাঁর প্রেম ইন্দ্রিয়ের নাগালে সীমাবদ্ধ হয়ে ছোট-খাটো চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশে জীর্ণ হয়নি। তাঁর প্রেমে ছিল অপরিসীম ভালোবাসার বিস্ময়, সম্ভ্রমবোধ, অন্তরঙ্গতা এবং মর্যাদা এবং সমীহবোধের সংমিশ্রণ। কামনার ক্ষুধায় নিঃশেষ করার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রিয় নারীকে, তাঁর স্বপ্ননারীকে তিনি রমণী হিসাবে দেখেননি কখনো। এর মানে, আমি বলতে চাইছি, স্থূল বুদ্ধির, স্থূল অনুভূতির লোকরা যেমনটা ভাবেন, তেমনটা নয়। অর্থাৎ ভালোবাসা তাঁর কাছে নিছক রমণেচ্ছা নয়।

তাঁর মতো একজন সংবেদনশীল মনের মানুষের কাছে ভালোবাসা কখনোই 'রমণী রমণ রণে' মত্ত হওয়ার স্থূল আকাঙ্ক্ষা নয়, কেবল শরীরী উত্তেজনা নয়। অনৈতিকতায়, অশালীনতায় এবং স্থূলতায়, রুচিহীনতায় সীমাবদ্ধ হওয়ার নয়।

তাঁর প্রেম শরীরী ভাষায় অনূদিত হওয়ার শর্তে সীমাবদ্ধ হয়নি বলেই তাতে একটা স্নিগ্ধতা আছে, চিরন্তন আকর্ষণ আছে।

আবার সেই প্রেম নিজেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না কোনো আটপৌরে সাংসারিকতায়, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে।

সেই জীবন যাপন, জীবনযাত্রা যা চায় সেটা এ রকম যে, মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য, সামাজিকতা, শারীরিক দাবি-দাওয়া, তাঁর সবটুকু মিটিয়ে দিয়েও ফিরে যাওয়া যায়, ফিরে চাওয়া যায় সেই দেহাতীত ভালোবাসাটির দিকে।

প্রিয় নারীর শরীরে স্রেফ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উল্লাস হয়তো নজরুলের মতো স্পর্শকাতর মনের মানুষের এই প্রেমে নেই, কিন্তু সেখানে অন্যতর তৃপ্তি আছে। কেননা, তাঁর স্থায়িত্ব থাকে এবং যে ভালোবাসা কেবলমাত্র শরীরের ভাষায় অনূদিত হওয়ার সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়ে না, তাঁর দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্যও থাকে অনেক বেশি।

www.pathagar.com

নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক্।

নার্গিসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার বেশ অনেকটা আগের কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে উনিশ শ' বিশের গোড়ার দিকে কবি-সৈনিক যখন সেনাবাহিনী থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতা ফিরলেন তখন তাঁর কিট্-ব্যাগ, স্যুটকেসে কী কী জিনিসপত্র সঙ্গে ছিল তাঁর ?

লেপ, তোশক, সৈনিক পোশাক, শিরওয়ানি, ট্রাউজার্স, কালো উঁচু টুপি, বাইনোকুলার থেকে শুরু করে অনেক দিনের পুরোনো কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল। আর মূল ফার্সিতে লেখা হাফিজের রুবাইয়াৎও।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি জিনিস নজরুল ইসলাম মিউজিয়ামে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো রক্ষা করে আসছিলেন।

সেটা কী?

"ব্যথার দান" গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে বর্ণিত মাথার কাঁটা। উৎসর্গ পত্রে নজরুল ইসলাম লিখেছেন :

"মানসী আমার!
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম ব'লে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলাম।"

এ থেকে স্পষ্টতই ধারণা করা যায়, নজরুলের "ব্যথার দান" গ্রন্থটি মূলত আত্মজৈবনিক।

নজরুলের আত্মজৈবনিক আরো অনেক গল্প কেবল নয়, কবিতা, গান ইত্যাদিও আছে। বিশেষত তাঁর গান!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে 'শেষ পারানির কড়ি' বলেছেন। নজরুলের ক্ষেত্রেও কথাটা কেবল সমান নয়, আক্ষরিক অর্থেই সত্য। আসলে নজরুলের ক্ষেত্রে সত্যটা সমান বললে অনেক কম বলা হবে। সত্যটা নজরুলের ক্ষেত্রে সমানের চেয়েও অনেক বেশি।

এখন থাক্ সে কথা।

নজরুল যাঁর মাথার কাঁটা নিয়েছিলেন সেই মানসী বা স্বপ্নায়িকাটা কে?

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ যখন নজরুল জীবনী বিষয়ক আমার প্রথম প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক' প্রকাশিত হলো সে সময় বাঁকুড়ার শেখ আজিবুল হকের চিঠি পেয়ে আমি তাঁকে নজরুল জীবনের এই পর্বের অর্থাৎ প্রথম পর্বের ওপর কাজ করতে অনুরোধ করি। কেননা, তিনি কবির স্বগ্রামের কাছাকাছি এলাকার লোক!

www.pathagar.com

তিনি এ বিষয়ে কিছু কাজ করেছেন।

তাঁর গ্রন্থে দেখি, নজরুলের এই মানসী ছিলেন স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়। নজরুল যখন রাণীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে টেন ক্লাসে পড়ছিলেন সে সময়কার পুলিশ অফিসার অক্ষয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরী কন্যা। পুলিশ অফিসার অক্ষয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন খুলনা জেলার লোক। অর্থাৎ নজরুলের গানে যেমনটা আছে, সেই 'পূরব দেশের' অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের মেয়ে ছিলেন স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়।

এই কিশোরীকে রাণীগঞ্জের জগন্নাথ গার্ডেনে প্রথম দেখেছিলেন নজরুল।

এক পলকের একটু দেখায়ও এ রকমের ভালোবাসা হয়তো হয় ঠিকই, কিন্তু নার্গিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বহুত আগে সৈনিক জীবনে লেখা নজরুলের "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", "বাঁধন হার"-য় যে বিরহের, প্রেমাকাঙ্ক্ষার, অতৃপ্তির যে হাহাকার উপলব্ধি করা যায় সেটা কি ঐ স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়কে ক্ষণিকের দেখায় সৃষ্টি হয়েছিলো?

এই স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্দেশ ক'রে নজরুল লিখেছিলেন—

"পথিক ওগো চলতে পথে তোমার আমার প্রথম দেখা
সেই দেখাতে দু'টি হিয়ায় জাগলো প্রেমের গভীর রেখা
এই যে মোদের একটু চেনা, আবছায়াতেই বেদন জাগে
দখিণ হাওয়ার মদির ছোঁয়ায় পূবের হাওয়ায় কাঁপন জাগে,
হয়ত মোদের পথের বাঁকেই এমনি ক'রে পথের বাঁকেই
কে জানে ভাই পথের শেষে চলব এবার পথে একা।"

রাণীগঞ্জের জগন্নাথ গার্ডেনে দেখা এই স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করেই নজরুল লিখেছিলেন :

"যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায় তুমি করিবে প্রণাম
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিও, বারেক প্রিয় নিও মোর নাম।"

আমি নিশ্চিত, "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন" "বাঁধন হারা"-য় যে 'মানসী'র বিরহের আকুল কান্নাটা আছে, তার জন্মভূমি কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোনো নারীর প্রতি তাঁর প্রেম নয়, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশে বড় হয়েছেন এমন কোনো নারীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা। এই গ্রন্থ তিনটির অনেকগুলো পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে, আমি যেন কোনো না কোনো প্রথম শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি। আর গ্রন্থত্রয়ে যে প্রেমের উল্লেখ আছে সেটা কোনোক্রমেই একতরফা নয়।

অপরপক্ষে নার্গিসের সঙ্গে তাঁর প্রেমটা আমার মনে হয়েছে পুরোপুরিই এক তরফা।

নজরুলের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন সৈয়দা খাতুনের বয়স কত?

চোদ্দ?

চোদ্দ বছর বয়স মানে তো তাঁর কিশোরী জীবনের প্রথম ভাগ। বয়:সন্ধির সময়। বারো থেকে পনেরো, বয়সন্ধির এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে

www.pathagar.com

মেয়েদের মানসিক পরিবর্তনও খুব তাড়াতাড়ি হয়।

ঘন ঘন মত পাল্টানোরও বয়স এটা।

নজরুল এই নার্গিস প্রসঙ্গেই বাগেশ্রী-কার্ফায় একটি গানে লিখেছিলেন : "চোখের নেশার ভালোবাসা সে কি কভু থাকে গো।" এই গানে নার্গিসের সেই সময়কার মানসিকতার কথাটারও উল্লেখ আছে।

"পুতুল লইয়া খেলা খেলেছ বালিকা বেলা,
খেলিছ পরাণ ল'য়ে তেমনি পুতুল খেলা!
ভাঙিছ গড়িছ নিতি হৃদয়-দেবতাকে গো।"

একদিকে বাস্তব অবস্থাটা যখন এই, তখন অন্যদিকে তাঁর এই বয়:সন্ধিকালে বাড়ির লোকদের কাছে সৈয়দা খাতুন শুনেছেন যে, নজরুল চাল-চুলোহীন একজন উম্মূল মানুষ। ফলে তাঁকে মামা আলী আকবর খানের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকতে হবে। আলী আকবর খানের প্রকাশনা সংস্থায় পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজ করে জীবন ধারণ করতে হবে। অতএব তাঁর তরফ থেকে নজরুল এক সময় উপেক্ষা এবং অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার পেলেন, যেমনটা খান পরিবারের লোকদের সঙ্গে আলাপ করে শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন। সৈয়দা খাতুন পরে যে নজরুল ইসলামকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন সেটা নজরুলের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেই। নজরুলের মতো কোনো সংবেদনশীল মনের প্রেমিক কখনো প্রেমিকার আত্মীয়-পরিজনদের কোনো আচরণে নয়, কেবল মাত্র খোদ প্রেমিকারই বিরূপ ব্যবহারে নিরস্ত হতে পারেন। সেটা বিয়ের উদ্যোগের পনেরো বছর পর নার্গিসের চিঠির জবাবে নজরুলের লেখাতেই আছে :

"তোমার আজিকার রূপ কি জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবী-মূর্তির মত আমার হৃদয় বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-দেবীর মতই বেছে নিলে বেদনার বেদী পীঠ। --- জীবন ভ'রে সেই খানেই চ'লেছে আত্মার পূজা আরতি। আজিকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনে। জানি নে, হয়তো সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব, —তাই অস্বীকার করেই চলেছি।.....

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনেরো বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিলো, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দু'টি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল, তোমার সেই সুপ্ত ললাটের স্পর্শ যে আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে ছিল সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কাল্‌কের কথা! মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল! সারা দিন রাত আমার চোখে ঘুম ছিল না!"

www.pathagar.com

এই ছিল নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের প্রেম এবং তার পরিণতি। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই প্রেম ছিল পুরোপুরিই একতরফা! অর্থাৎ সৈয়দা খাতুনকে নজরুল যতই ভালোবেসে থাকুন না কেন, সেটা সঠিকভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করার মানসিক সামর্থ্য সৈয়দা খাতুনের ছিল না। নজরুল এই কিশোরীকে নিয়ে নিজের মনে সে সময় একটা স্বপ্নের ছবি এঁকে নিয়েছিলেন ঠিকই, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য থেকে খুঁজে পেতে অনেক আদর করে তাঁর এই স্বপ্ননারীর নাম একটা ফুলের নামে নার্গিস রেখেছিলেন, এটাও ঠিক, কিন্তু এসবই ছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক তরফা। মুসাফির মানুষের প্রেম সেদিন প্রতিদান পেলে ফিরে যেতো না।

এই নার্গিসকে উদ্দেশ্য করেই নজরুল লিখেছিলেন :

"যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই কেন মনে রাখ তারে?/
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে।"

এই গানের এক জায়গায় আছে :

"শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই শুভ লগনের বেলা।"

আর একটা গানে নজরুল লিখেছেন :

"যারে আঘাত দিয়ে ফিরায়েছ তুমি কেন ডাক তারে বারে বারে?
যে ফুল হেলায় দলিয়াছ পায়, আজো রেখেছ অনাদরে/
কেন পেতে চাও তারে!"

এই গানটিতেই আর এক জায়গায় আছে :

"দলিত যে ফুল পথের ধুলায়, সে ফুল আজো কি আছে?"

ঢাকার মেয়ে উমা মৈত্র কিংবা রাণু সোমের প্রতি নজরুলের ভালোবাসা কোনো তরফে কখনোই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চিন্তায় আসেনি। এক নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিবাদ মানসিক সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষার স্তরে যে আবেগ আসতে পারেনি সেটার মধ্যে পরিপূর্ণ প্রেমের সম্ভাবনাও থাকা সম্ভব ছিল না। তাই সে প্রসঙ্গ এখানে থাক। কেননা, উমা মৈত্র সম্পর্কে নজরুলের আপন হাতে লেখা "শিউলি মালা"-য় দেখছি, মেনে নেওয়া হয়েছে, 'বিদায় বেলা তো আসবেই।' আর রাণু সোম ওর্ফে প্রতিভা বসু "স্মৃতির জলছবি" এঁকে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা ভালোবাসতেন। তবে এর অনন্ত সম্ভাবনার কথাটা ভাবেননি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন যে, নজরুল তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ এবং তাঁর গানের সবগুলি গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁকে উপহার দিয়েছেন, যেমন অনেক কিছুই নজরুল উপহার দিয়েছিলেন ফজিলাতুন্নেসাকেও! এদিক দিয়ে সৈয়দা খাতুন ওর্ফে নার্গিস কিন্তু বরাবরই বঞ্চিত থেকেছেন। এটাও ভাববার কথা!

নজরুল-প্রমীলা সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ঈর্ষাপ্রণোদিত একটা কথাও প্রতিভা বসু আমাকে বলেছিলেন, তারিখ-তথ্যের ভিত্তিতে যেটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এ থেকে আমি এটা বুঝেছি যে, নজরুলকে ভালোবাসতেন প্রতিভা বসু। আর প্রেমে ঈর্ষাও বোধ হয় প্রায়শই কাজ করে।

www.pathagar.com

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আমার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে যা লেখা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এই কথাগুলো লিখলাম।

নজরুল জীবনে এর পর আসছে মিস্ ফজিলাতুন্নেসা প্রসঙ্গ। এম. আকবর উদ্দীনের স্মৃতিকথায় দেখি, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবটা প্রথমে এসেছিল মিস্ ফজিলাতুন্নেসার কাছ থেকেই। নজরুল তখন এতখানি পাওয়ার ব্যাপারে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু নজরুল যখন ক্রমে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিলেন, ততদিনে অঙ্কের এম. এ. ওই বিদুষী রমণী মাত্রাতিরিক্ত অতি বাস্তব হিসাব-নিকাশে ডুব দিয়েছেন। তবে অঙ্কের নিয়মে কষা একজন বিদুষীর, একজন শিল্পীর জীবনের এই হিসাব-নিকাশ তাঁর বিবাহোত্তর জীবনে একটা মর্মান্তিক ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তা না হলে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় কলকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তাঁর মাথার বালিশের নীচে নজরুলের হাতে লেখা সেই গানের খাতা পাওয়া যাবে কেন, যেখানে নজরুলের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন হাতে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটিও আছে, যাতে তাঁর তরফ থেকে নজরুলকে কিছু দিতে চাওয়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আকুতি ব্যক্ত হয়েছে? বিবাহোত্তর জীবনে ফজিলাতুন্নেসা আর কিছু লিখতে পারলেন না কেন, যেটা তিনি কুমারী বয়সে পেরেছিলেন? এক সময় তিনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিলেন, নিবন্ধ লিখতেন এবং সঙ্গীত চর্চাও করতেন! অথচ বিবাহোত্তর জীবনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইভেন কলেজের অঙ্কের এই অধ্যাপিকা ঢাকা ক্লাবে মদ খেয়ে পথিপার্শ্বে পড়ে থাকতেন কেন, যার ফলে তাঁর কর্ণেল জামাতাকে প্রায় প্রতিরাতে এগিয়ে এসে কষ্ট করে শাশুড়ীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হতো? এ সবই কি চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মিলে যাওয়ার নমুনা? বোঝা যায়, একটা সুস্থ জীবনবোধও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অঢেল বিলাস-বৈভবের মধ্যেও মানসিক নিঃসঙ্গতা এবং হতাশা তাঁকে ওই ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিল।

নজরুলকে তিনি নিঃস্ব, রিক্ত করে দিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু নিজেও কম রিক্ত তো তিনি হননি!

এই ফজিলাতুন্নেসার উদ্দেশেই নজরুল এক সময় লিখেছিলেন ঃ

"আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারী।
নয়নের অনুরাগ-দৃষ্টির সাথে চাহি নয়ন বারি ॥
তব পুষ্পিত তনুতে, হৃদয়-কমলে গোপনে যে প্রেম মধু উথলে
তোমার কাছে সেই অমৃত যাচে তৃষিত এ পথচারী ॥"

কথাটা নজরুলের গানেই ব্যক্ত করলাম। কেননা, নজরুল তাঁর গানেই স্পষ্টত লিখেছেন : "আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে।"

তবে এটাও ঠিক যে, ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা নজরুলের চিঠিগুলো ফজিলাতুন্নেসার হাতে পৌঁছায়নি। তা না হলে ওগুলো কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের বাসা থেকে পাওয়া যাবে কেন? চিঠিগুলো ফজিলাতুন্নেসার হাতে পৌঁছলে এর পরিণতি অবশ্য অন্যরকম হতে পারতো!

www.pathagar.com

বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ

নজরুলের একটি গানে আছে : 'নাম মোহাম্মাদ বোল রে মন/ নাম আহম্মদ বোল'। কথাটা আমার নিজেরও। নজরুলের মতো আমারও কথা : আমি "আল্লাহ'র বান্দা, নবীর উম্মত।" কিন্তু আল্লাহ'র নাম, আল্লাহ'র রসূলের নাম ছাড়াও আর একটা নাম আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সে নাম কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

আমি মুসলমান। দুই ঈদ আমার উৎসব। কিন্তু আমার কাছে আর একটা প্রিয় উৎসব, হয়তো সবচেয়ে প্রিয় উৎসব নজরুলের জন্মদিন। বছরের তিন শ' তেষট্টি দিন আমাকে অফিসে যেতে বল্‌লে আমি যেতে পারি; কিন্তু বাকি দুটো দিন পারি না। বছর অবশ্য তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনে। তাই আরো দুটো দিন বাকি থাকে। সে দুটো দিন নজরুলের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। দশই মোহররম আমার কাছে অন্যতম শোকের দিন। আশূরার দিন কারবালার ঘটনাবলির কথা ভাবলে আমার কান্না আসে। কিন্তু নজরুলের মৃত্যুদিনের কথা বোধ হয় আমাকে সবচেয়ে বেশি বিষণ্ন করে। এক বিস্ময়কর মানুষ। একজন প্রকৃত মানুষ। তাঁকে যত জানছি, ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ছি।

চাল-চুলোহীন এক পরিবার থেকে উঠে আসা একটা মানুষ। এমনিতে খুবই লাজুক প্রকৃতির, সৌজন্যপরায়ণ, সহানুভূতিশীল, সহনশীল, কিন্তু ন্যায়, সততা ও মানবিকতার প্রশ্নে আপোষহীন, ইস্পাত কঠিন। শিরদাঁড়া সোজা করেই প্রতিষ্ঠা পেলেন। সে প্রতিষ্ঠা তাঁকে অঢেল দৌলতবান করতে পারতো। কিন্তু সেদিকে তিনি গেলেন না। সচেতনভাবে, ইচ্ছা করেই গেলেন না। গেলেন ঈমানের পথে, ব্যক্তিত্বের পথে, পৌরুষের পথে। চরম সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সম্বিত হারানোর আগে লিখে গেলেন, 'আমি আজন্ম সৈনিক।' অর্থাৎ তাঁর সৈনিক জীবন বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে, বাঙালী পল্টনের শেষ হয়নি। লড়লেন কেবল বৃটিশের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু মহাসভা-কংগ্রেসের মুসলিম-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও নয়, তাঁর নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী খোদ মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও। তদুপরি ধন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে-ও তাঁর জেহাদ কিছু কম নয়। এমন একটা মানুষ যে চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হবেন, এ তো এক রকম জানা কথা। কবি নিজেও তা জানতেন। তবু এভাবে শহীদ হওয়াটাই তিনি শ্রেয়জ্ঞান করেছেন। সে পরিচয় সম্বিত হারানোর আগে শেষ পর্যায়ের দৈনিক নবযুগের নানান লেখায় রেখে গেছেন। তাঁর ওপর যে একটা হামলা হবে সেটা তিনি এক রকম প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে এত যে তোড়জোড় চল্‌ছিলো এবং কবি যে সব কিছু জেনে-শুনেও ন্যায়ের খাতিরে সচেতনভাবেই এগুচ্ছিলেন, এত কিছু তাঁর পরিবারের লোকেরা জান্‌তেন, এমনটা মনে হয় না। এদিক দিয়ে নিজ পরিবারেও কবি ছিলেন একান্তই

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ। তাঁর পরিবারের লোকেরা সম্ভবত সুখে দিন কাটানোর কথাটুকুই চিন্তা করতেন। কবি এক্ষেত্রে তাঁদেরকে যথাসাধ্য অর্থ যোগানোর দায়িত্বটুকু নিয়েছিলেন। অন্যান্য কর্তব্যও করেছেন। পরিবারের প্রতি যে সার্বিক দায়িত্ব ছিলো তাঁর, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতনই ছিলেন। তবু কবির ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী তাঁরা কতখানি ছিলেন, সে বিষয়ে নানান কারণে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই থেকে যায়। একটা ব্যবধান যে ছিলো এর অন্যতম কারণ দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন। কবির চাওয়া-পাওয়ার ব্যক্তিগত অনুভূতিও এক্ষেত্রে কাজ করেছে। এটাকে প্রেমানুভূতি, ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা কিংবা মানসিক সান্নিধ্য কামনা বলা চলে। এর শুরুটা চুরুলিয়ায় থাকতে, না দৌলতপুরে হয়েছিলে সেটা বলা কঠিন। তবে সম্ভবত চুরুলিয়ায়। পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর মতো এর পরিচয়ও তাঁর লেখায় আছে। মানসীর মাথার কাঁটা হারানোর ঋণ শোধের কথা "ব্যথার দান"-এর উৎসর্গপত্রেও আছে। তা হলেও দৌলতপুরের ঘটনাটা একটা বড় আঘাত হিসাবে এসেছিলো। একটা বড় আনন্দ হিসাবেও। আনন্দটা আগে। আঘাতটা পরে। সব মিলিয়ে এটা ছিলো একটি নিয়ন্ত্রণক্ষম আনন্দ-বেদনারই ব্যাপার। আগেরটার মতো এ ঘটনাও বহুলাংশে কবির ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। তবে তুলনামূলকভাবে আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি। ঢের বেশি বলা চলে। এই ঘটনায় একদিক দিয়ে আজীবন তাঁর চেতনায় না পাওয়ার, অতৃপ্তির সঙ্গীত অনুরণিত হয়েছিলো। সর্বহারার অনুভূতি-ও দিয়েছিলো এই ঘটনা। দৌলতপুরে গিয়ে শেষের দিকে সামাজিক জীবনে একজন চাল-চুলোহীন মানুষ হিসাবে উপেক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। এই উপেক্ষাই তাঁর বিদ্রোহী হওয়ার পক্ষে এক বলিষ্ঠ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু এই ঘটনায়ও কবি নারীবিদ্বেষী হননি। আর্থিক দৈন্যদশার মূল কারণ হিসেবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকেই তিনি সরাসরি দায়ী করেছে। কেবল বিদেশী নয়, স্বদেশী শোষণ ব্যবস্থাকেও তিনি সমান দায়ী করেছেন। তাই সাম্যবাদী সাহিত্য রচনা করেছেন, সাম্যবাদী গান লিখেছেন। 'সর্বহারা' শব্দটারও জন্ম দিয়েছেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, কোথা থেকে কীভাবে কতকীই না হতে পারলো! কবি কিন্তু সেটা জানতেন। তাই লিখতে পেরেছিলেন : 'ডালে তোর জানলে আঘাত / দিসরে কবি ফুল সওগাত।'

কিন্তু এই আঘাতেরও রকমফের আছে। আঘাতে ফুল ফোটে; আবার তেমন আঘাতে ডাল ভেঙেও যায়। ফুল ফোটার মতো আঘাতগুলো এসেছিলো ১৯২১ থেকে। প্রথমে বিয়ের ব্যর্থ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ডাল ভাঙার মতো আঘাত এসেছিলো এর একুশ বছর পর। ১৯৪২-এ। এর আগের আঘাতগুলোকে সূক্ষ্ম আঘাত হিসাবে কবি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সহ্য করতে পেরেছিলেন এবং সৃষ্টিও করতে পেরেছিলেন। বীণার তারে আঙুলের ছোঁয়ার মতো সূক্ষ্ম স্পর্শের মতো। ফলে তাঁর চেতনার বীণার তারে ঝঙ্কার উঠেছিলো, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু শেষের আঘাতটি ছিলো বড্ড বেশি স্থূল! একেবারে শরীরী আঘাত! এই

www.pathagar.com

আঘাতেই কবি তাঁর জীবদ্দশায়ও শেষ চৌত্রিশটি বছর নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন। আবার এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার, এমনটা যে হবে সেটাও কবি তার সুস্থাবস্থায় কোন অবচেতন মন থেকে জানি না, ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।

কবি বিধিলিপিতে বিশ্বাস করতেন। তাই লিখেছিলেন : 'সৃজনভোরে প্রভু মোরে/ সৃজিলে গো প্রথম যবে/ জানতে আমার ললাট লিখন/ কপাল আমার কেমন হবে।'

কবি বিশ্বাস করতেন ঃ তিনি স্রষ্টার হাতের বীণা। স্রষ্টা যেভাবে বাজান, তিনি সেভাবেই বাজেন। দৈবের ওপর, অদৃষ্টের ওপর এতখানিই আস্থা ছিলো তাঁর!

কেবলই কি আস্থা ?

সেটাই শুধু নয়।

তাহলে কি?

নজরুলের জীবন ও সাহিত্য জানা থাকলে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে, দৈবের সঙ্গেও একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিলো তাঁর। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অদৃষ্টের সঙ্গে তাঁর এই প্রত্যক্ষ সংযোগ অর্থাৎ তাঁর নসীবে কী ঘটবে না ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকলেও নিজস্ব পুরুষকারে তাঁর কিছু কম আস্থা ছিলো না। আস্থা কতখানি ছিলো সে বিষয়ে একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাটিও; যেখানে তিনি লিখেছেন : 'বল বীর/ বল উন্নত মম শির/ শির নেহারি আমারি/ নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।' কিংবা যখন তিনি বলেন ঃ 'মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ/ ভীম রণভূমে রণিবে না।'

ভাবা যায় সেই একই মানুষ লিখেছেন?

> "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু,/আর আমি জাগিব না,/
> কোলাহল করি সারা দিনমান/কারো ধ্যান ভাঙিব না/ নিশ্চল নিশ্চুপ/
> আপনার মনে পুড়িব একাকী/ গন্ধ বিধুর ধূপ!"

'গন্ধ বিধুর ধূপের' মতোই তো কবি তাঁর জীবনের শেষ চৌত্রিশটি বছর আপন মনেই পুড়েছেন!

জীবদ্দশায় কবি লিখেছিলেন : "মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।/ যেন গোরে থেকে-ও/ মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥"

মসজিদেরই পাশে কবির কবর হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে।

কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, সত্যনিষ্ঠা যা ঘোষণা করেছিলো, যে ওয়াদা করেছিলো তার কী হলো? তার পরিণতি হলো "মহাভারত"-এর কর্ণের মতো। পুরুষকার থাকা সত্ত্বেও দৈবের কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ-করতে হলো।

সর্বহারাদের দুঃখ মোচনের জন্য জেলে, তাঁতী, চাষী, মুটে, মজুর, মেথরদের নিয়ে সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সর্বহারাদের সংগঠন গড়ার জন্য বছরের পর বছর সারা বাংলা সফর করেছেন। কিন্তু কী হয়েছে সেই সর্বহারাদের অবস্থা আজ?

www.pathagar.com

উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলের অবসান না ঘটা পর্যন্ত শান্ত না হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি। 'সাম্যবাদী' কবিতাবলি লিখেছেন। 'হাতের সুখে গড়া' শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা 'পায়ের সুখে ভাঙা'র আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহ্বান আজো কার্যকর হয়নি।

অন্যদিকে জাতি হিসাবে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতির। মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন :

"নাই তাজ/ তাই লাজ?/
ওরে মুসলিম! / তোরা খজুর শিষে সাজ!/"

মুসলিম উম্মার সেই সংহতি কি আজো এসেছে? সারা দুনিয়া জুড়ে তারা আজো মা'র খায়! গুটিকতক ইহুদীর হাতে আরবরা আজো মার খাচ্ছে, আর বীরত্ব যেটুকু দেখাচ্ছে তা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা-ও তো তা-ই! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এক শ' নব্বুই বছরব্যাপী তারা পিছিয়েছেন। তারপর ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারতীয় মুসলমানরা তো সব দিক দিয়েই আর একটা উপজাতিতে পরিণত হতে চলেছে। তাদের ঠাঁই হতে যাচ্ছে ভারতের ছত্রিশটা উপজাতির পাশে সাঁইত্রিশতম উপজাতি হিসাবে।

নজরুল যে হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের জন্য এত চেষ্টা চরিত্র করলেন, এত লিখলেন, বললেন, গাইলেন, সভা-সমিতি করলেন, তার পর-ও কী হলো? প্রতিবেশী সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক শোষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পোকায় কাটা পাকিস্তান সৃষ্টি করে একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। সে কাজে তারা অনেকাংশে সফলও হলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য কি নজরুল জেল খেটেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন?

নজরুল তো সবদিক দিয়েই সাম্যবাদী ছিলেন। কেবল নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নয়, নারীর জন্য যে সমানাধিকার তিনি চেয়েছিলেন, অতখানি আজকের নারীরাও তো চাইতে সাহস পান না! তাঁর "সাম্যবাদী" কবিতা সিরিজের 'নারী' কবিতায় এখন থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি আগে তিনি লিখে গেছেন : 'অসতী মাতার পুত্র জারজ যদি হয়/অসৎ পিতার পুত্রও জারজ সুনিশ্চয়।' অত্যন্ত সাহসিক উক্তি! তাঁর সময়ে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরোধিতা হয়েছিলো।

নিজ পরিবারিক জীবনেও কত সহনশীল ছিলেন কবি! গিরিবালা দেবী তো ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করেছিলেন! কবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই করেছেন তাঁরা। কিন্তু এ সব কিছুই কবি মুখ বুজে সহ্য করে গেছেন! এতটুকু অনুযোগও করেননি।

সংসারের টাকার প্রয়োজন মেটাতে রাতদিন পরিশ্রম করেছেন। এর মধ্যে দান-ধ্যানও করেছেন।

www.pathagar.com

প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আঘাত হিসেবে এসেছে প্রিয়তম পত্নীর পটস্ ডিজিজ। সে চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন কবি। কাবুলির কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়েছে।

তাঁর স্ত্রীর রোগ নিরাময় হয়নি। এর মধ্যেই কবিকে তাঁর আপন কর্মজীবন অব্যাহত রাখতে হয়েছে। টাকা রোজগার করতে হয়েছে। সাহিত্য সঙ্গীতের নানান ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হয়েছে। সঙ্গীত নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন মূলত তিনি এই সময়েই। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোন কোম্পানী ইত্যাকার কত প্রতিষ্ঠানেরই না চাহিদা মেটাতে হয়েছে তাঁকে!

অসুস্থতার বছরখানেক আগে শেষ পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার নিতে হলো তাঁকে! এই কাগজে নানান বিভাগে দুই হাতে লিখলেন কবি। কেবল পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে নয়, জীবন ধারা তাঁকে যে শ্রেণী-চেতনা দিয়েছিলো সেটা কখনো ভোলেননি কবি।

'নবযুগ-এর এই পর্যায়ে'ও দেখা গেলো সেই সাম্যবাদী চেতনা, সেই নারী মুক্তির কথা, সেই মানবিকতা, ন্যায় বিচারের কথা! দুধকে দুধ এবং পানিকে পানি বলা! নাস্তিক্যে নয়, আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম জ্ঞান করে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে দুই হাতে লিখে চল্‌লেন কবি। তখন সামনে পেছনে পাশে তাঁর কোনো দল নেই, গোষ্ঠী নেই! সংসারে ও সমাজজীবনে তখন নিঃসঙ্গ কবি! স্বার্থান্ধ আততায়ীরা তাঁকে আর সময় দিতে চাইলো না। এ রকমই একটা সময়ে তাঁকে কঠিন আঘাত হানা হলো! এ সময়ই কবি ক্রমে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সে সময়ই তিনি লিখেছিলেন এই মর্মস্পর্শী গান।

"খেলা শেষ হ'লো—/ শেষ হয় নাই বেলা—/

কাঁদিও না, তব তরে রেখে গেনু/ প্রেম-আনন্দ মেলা॥/

---যাহারা আমার বিচার ক'রেছে/ ভুল করিয়াছে জানি/

তাহাদের তরে রেখে গেনু/ মোর বিদায়ের গানখানি।/

হোক অপরাধ/ হোক মোর ভুল/

বালুকার বুকে/ ফুটায়েছি ফুল।...."/

কবির অসুস্থতার পর এই গান জগন্ময় মিত্র গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছিলেন। এই গানই সম্ভবত কবির শেষ জবাব।

নজরুল সারা জীবন তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছু করেননি। এখানে তিনি নিরাপোষ ছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যে সিনসিয়ারিটির অভাব কখনো হয়নি।

এক ঝড়ের রাতে বর্ধমানের এক সংস্কৃতিবান গরীব পরিবারে তাঁর জন্ম। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর শিক্ষা জীবনটুকুও নির্বিঘ্নে কাটেনি। কর্মজীবনও পাল্টেছে নানান কারণে। আবাসিক ঠিকানা-ও। 'নিজ বাস হলো চির পরবাস জন্মের ক্ষণ পরে', তাঁরএ কথা তিনি মরেও প্রমাণ করেছেন।

www.pathagar.com

স্বীয় সম্প্রদায়ে পরিণয়ের সুযোগটুকও তাঁর হয়নি। নিজ পরিবারেও আজীবন দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েনের মধ্যে তিনি দিন যাপন করেছেন। এর ওপর ছিলো দারিদ্র্য, পরাধীনতা এবং স্বার্থান্ধ লোকদের বৈরিতা! বেদনার এই অপার সাগর তিনি সারা জীবন সাঁতরেছেন!

তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকের যে অনুভূতিটা হতে পারে সেটাও তিনি একটি গানে নিজেই লিখে গেছেন। সিন্ধু-ত্রিতালে লেখা কবির এই গানটি আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে। এ গান কেবল নজরুলেরই জীবন ও সৃষ্টিকে স্মরণ করায় :

"বেদনার সিন্ধু-মন্থন শেষ,/ হে ইন্দ্রাণী।

জাগো, জাগো করে/সুধা-পাত্রখানি॥

রোদন সায়রে ধুয়ে পুষ্প-তনু—/এসো অশ্রুর বরষার ইন্দ্র-ধনু,

হের কূলে অনুরাগে/ জীবন-দেবতা জাগে,

ধরিবে বলিয়া তব/ পদ্ম-পাণি ॥

তব দুখ রাত্রির তপস্যা শেষ,....."

বেলা শেষ হওয়ার আগে তাঁর খেলা শেষ হয়েছে। তাঁর দুঃখের রাত্রির শেষ চৌত্রিশ বছরের তপস্যাও এখন থেকে তেরো বছর আগে শেষ হয়েছে। বিলম্বে হলেও এখন তাঁর সম্পর্কে ভাববার সময় আমাদের।

www.pathagar.com

কেবল নজরুল কবিতারই আবৃত্তি

মে-জুন ১৯২৭-এ 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত এবং ১৯২৮-এর জুলাইয়ে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে আঙ্গুর বালা দেবীর গাওয়া এবং পরে সুপ্রভা সরকারের গাওয়া একটা বিরহের গানে নজরুলের নিজের উক্তি ঃ "ভুলি কেমনে/ আজো যে মনে/ বেদনা সনে/ রহিল আঁকা।"

এই গান তিনি ঢাকায় মিস্ ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে লিখেছিলেন।

এটা একজন যথার্থ বিরহী মানুষের, একজন বিরহী পুরুষের অত্যন্ত সৎ এবং চিরন্তন উক্তি। এ উপলব্ধি প্রকৃত প্রেমিকের এবং পুরুষকারের, যে পুরুষকার কখনো সত্যকে অস্বীকার করে না।

প্রেম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির, ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়। কিন্তু সেটা নিতান্তই প্রাইভেট লাইফের বিষয় হলেও নিছক কোনো অনৈতিক শরীরী সম্পর্কের মতো সেটা চুরি করে করার মতো এমন কোনো বিষয় নয় যে, প্রয়োজন হলেও কিংবা অভিব্যক্তির শৈল্পিক বা সাহিত্যিক তাগিদটুকুও অবদমিত করে পাবলিক লাইফে তা অস্বীকার করতে হবে।

নজরুল আত্মজীবনী লেখেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে, কথাসাহিত্যে এবং সঙ্গীতে আত্মজৈবনিক অনেক কিছুই আছে।

নার্গিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঢের অনেক আগে তাঁর সৈনিক জীবনে লেখা "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", "বাঁধন হারা"য় প্রেমাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির যে হাহাকার টের পাওয়া যায়, তার নিবৃত্তি ফজিলাতুন্নেসায় এসেও হয়নি। শেষোক্ত এই বিদুষী রমণীকেই নজরুল হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির অপ্রতিরোধ্য তাগিদে প্রকৃত অর্থেই স্রেফ একজন প্রেম ভিখারীর মতোই কয়েকটি প্রেমপত্র লিখেছিলেন, যা কেবল তৎকালীন সময়েই নয়, বিশেষত পরবর্তীকালে এই ভদ্রমহিলাকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে স্পষ্টতই চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে। অঙ্কে এই বিদুষী রমণীর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার সার্টিফিকেট কিংবা তাঁর বিলেতের ডিগ্রী কিন্তু এই কাজটা করতে পারেনি এবং পারতোও না।

নজরুলের প্রেম বিরহের প্রকাশ ঘটে মূলত তাঁর কথাসাহিত্যে, কবিতায় এবং বিশেষত তাঁর সঙ্গীতে।

উদ্ধৃত এই গানটিতেও আছে তাঁর আত্মজৈবনিক কথা! এই গানটিতে পরে তাঁর সেই মর্মান্তিক উপলব্ধির কথাটিও আছে, যেখানে তিনি লিখেছেন : "আগে মন করলে চুরি/ মর্মে শেষে হানলে ছুরি।"

যন্ত্রণাকাতর মনের অসহ্য, তীব্র আর্তনাদ সত্ত্বেও যথার্থ এক অসাধারণ প্রেমিকের

www.pathagar.com

মতোই তাঁর সততাপূর্ণ উক্তি : "এত শঠতা/এত যে ব্যথা/ তবু যেন তা/ মধুতে মাখা।"

খুব স্পর্শকাতর এবং পরিণত মনের মানুষ না হলে প্রকৃত ভাল কেউ বাসতে পারে না।

এ সময় নজরুল নিশ্চয়ই ছিলেন খুবই পরিণত এবং স্পর্শকাতর মনের মানুষ, অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের মানুষ। সে ভালোবাসা স্বভাবতই ছিল অপরিসীম এবং গভীর, যার কোনো তল ছিল না, যার কোনো কূল ছিল না। তাঁর মনটাই ছিল নিঃসীম আকাশ, তাঁর মনটাই ছিল সীমাহীন সমুদ্র। নিষ্পাপ ভালোবাসা বলতে যা বোঝায়, সেটাও কেবল এই মনেই সম্ভব। এ হেন মনের ভালোবাসাই কেবল কখনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী হতে পারে!

গানটি সুপ্রভা সরকার তাঁর পরিণত বয়সে গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে এই গানটি তিনি শেখাতেনও।

এই গানটি তিনি কেন বেছে নিয়েছিলেন, এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির, উপলব্ধির কিছু মিশে আছে কিনা জানি না। তখন এই দিকটি ভাবিনি বলে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার দেখা হলেও এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইনি।

আজ নানান কারণে এই গানের তাৎপর্যটা উপলব্ধি করতে পারি। এ গানের বাণীতে আছে আদতে নজরুল জীবনের এক অত্যন্ত করুণ এবং মর্মান্তিক উপলব্ধির কথা।

১৯৯৪'র ৫ আগস্ট কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড্-এর সাময়িক পত্র সানন্দা-য় অভিনেতা উত্তম কুমারের ওপর একটা সংখ্যা বার হয়েছিল। প্রচ্ছদে আছে : মহানায়ক উত্তম কুমারের বুকে মাথা রেখেছেন প্রবাদ প্রতিম নায়িকা সুচিত্রা সেন।

দেখে অনেকেই আমরা হয়তো ভেবে বসবো : প্রেমের হদ্দমুদ্দ আর কি! অর্থাৎ নান্দনিক প্রেমের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত সব কিছুই যেন হয়ে গেল!

কিন্তু এই সংখ্যাতেই উত্তম কুমারের একটা উক্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সেই উক্তিতে তাঁর জীবনের চাওয়া-পাওয়ার একটা করুণ হিসাব আছে। সেখানে তিনি বলছেন : "কোনও মেয়ে আমার জন্য কোনও আত্মত্যাগ করেনি।"

তাঁর জীবনে যে শেষ পরিণতিটা হয়েছিল, সেটা এই চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিকাশেরই পরিণতি।

জিটিভি'র মতো উপগ্রহ চ্যানেলগুলোতে এখন যেমনটা দেখায়, লেড়কার ওপর নৃত্যরত লেড়কীর জোয়ানা হওয়াটাই কিন্তু আদৌ কোনো প্রেম নয়। ভালোবাসার বিশ্বজোড়া বৌবাজারের প্রেম চাঁদ বড়াল স্ট্রীটে, সোনাগাছিতে বা টানবাজারেও ওটা মেলার কথা নয়! ও রকম নারী সঙ্গ উত্তম কুমার নিজেও কিছু কম পাননি।

কিন্তু নারী-পুরুষের আবেগের অতি সূক্ষ্ম, সুগভীর, উদার ও অবিস্মরণীয় ঐক্য যে প্রেম, পরিপূর্ণ শরীরী সম্ভোগের জন্যও অপরিহার্য যে প্রেম, যে প্রেম প্রয়োজনে

www.pathagar.com

দেহাতীত ও নিষ্কাম হওয়ারও সামর্থ্য রাখে সেই প্রেমের অভাবই এক সময় তাঁর জীবনকে রিক্ততার হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছিল এবং জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাবের সেই শূন্যতাবোধই এক সময় তাঁকে চরম পরিণতি বেছে নিতে বাধ্যও করেছিল।

এই পরিণতি নজরুল বাধ্য হয়েও বেছে নিতে চাননি, ঠিকই। কিন্তু নিয়তি তাঁকে অন্যভাবে হলেও আরোপিত এই পরিণতিটাই মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

মহাভারতে কর্ণের বীরত্ব কারো চেয়ে কিছু কম ছিল না। কিন্তু অন্য কোথাও না হলেও দৈবের কাছে তাঁর পুরুষকার শেষ পর্যন্ত পরাজিত না হয়ে পারেনি।

মানুষের জীবনের প্রেম আইন শাস্ত্রের কন্ট্রাক্ট ল'র কোনো কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি নয়। অনুভূতির জগতের এই ব্যাপারটা বোধ হয় আল্লাহ্ আলাদাভাবেই দেখাশুনা করেন। এখানে যিনি রিক্ত হন, তিনি জীবনের অনেক কিছুই হারান; যেমনটা ফজিলাতুন্নেসার সান্নিধ্যে আসার পর অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবেই নজরুল জীবনে ঘটেছিল।

সে সময় গ্লামারাস সঙ্গীত শিল্পী এবং অভিনয় শিল্পী পরিবৃত নজরুলকে দেখে তখন কবির ব্যাগ বওয়া ভক্তদের কেউ কেউ বেহুদা চাপা ঈর্ষায় সেটা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে ১৯৪২-এ কবি অসুস্থ হওয়ার পর ১৯৬২-তে কবি-পত্নীও যখন পরলোকগমন করলেন এবং কবির বিরুদ্ধে কুৎসার প্রতিবাদ করার মতো কবি-পরিবারে আর কেউ রইলেন না, তখন কবির ওই ব্যাগ-বওয়া ভক্তদের এক-আধজন কবির বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটিয়ে নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকাশ ঘটালেন।

অর্ধ-শিক্ষিত ওই ব্যাগ-বওয়া লোকগুলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও উপলব্ধি করার অবসর পাননি যে, নজরুল জীবনের প্রেমের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাতে কার্যত উপযুক্ত কোনো নারীই এগিয়ে আসেননি। তাঁরা নজরুলের গানকে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু গানের পাখি নজরুলকে ভালোবাসার কোনো অবসর তাঁরা পাননি।

নজরুল এক সময় অজস্র শিল্পী রমণী পরিবৃত ছিলেন ঠিকই। কিন্তু ওঁরা ছিলেন কেবল ওঁদের নিজেদের প্রয়োজনেই। গানের কথা ও সুরের রচয়িতা নজরুলের প্রয়োজনে কাননবালা বা জাহানারাদের কেউই ছিলেন না; যেমন ছিলেন না কোনো স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়, কোনো সৈয়দা খাতুন কিংবা কোনো ফজিলাতুন্নেসা।

এই বিরহটা যে কোথায় বাজে সেটা তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর নানান ধরনের লেখায় জানিয়ে গেছেন। তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, কবিতায়, চিঠিপত্রে, গানে। এই ধরনের চিঠিপত্র তিনি অবশ্য কেবল মিস্ ফজিলাতুন্নেসাকেই লিখেছেন। তাঁর গানে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, ব্যথাটা বাজে ঠিক 'বুকের তলায়' কোনো একখানে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে লিখেছেন যে, ব্যথাটা বাজে হৃদয়ের মাঝখানে।

www.pathagar.com

তাঁর একটা গানে আছে : "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে/ দেখতে আমি পাইনি/ তোমায় দেখতে আমি পাই নি/" আর রবীন্দ্রনাথের মতো ঠাকুর-দেবতা লোককেও গাইতে হয়েছে : "ফুল তুলিতে ভুল করেছি/ প্রেমের সাধনে।" এবং তিনিও উপলব্ধি করেন যে, 'লজ্জিত বাসর সজ্জাতে' 'অর্ধরাতে' যিনি আসেন তিনি মাতা নন, কন্যা নন, বধূ নন। তাঁর একটিই পরিচয় এবং তা এই যে, তিনি সুন্দরী রূপসী উর্বসী। অর্থাৎ সাধারণ মানবী নন। রূপদর্শী কবি নজরুলের কাছে এটিই ছিল তাঁর প্রিয় নারীর একমাত্র পরিচয়। অন্তর্সৌন্দর্যে তিনিই ছিলেন কবির স্বপনচারী।

নজরুলের বিরহ প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলো স্মরণ করা আবশ্যক।

"কোথায় বিরহ বাজে" শিরোনামে শফি কামাল এবং চিত্রলেখা গুহ আবৃত্তি করেছেন নজরুলের প্রেমের কবিতা।

স্রেফ কেবল নজরুলকে নিয়েই আবৃত্তির এই ক্যাসেট, নজরুল ভক্তদের কাছে নিশ্চয়ই একটা আনন্দদায়ক খবর।

এর এক পিঠে দশটি এবং আর এক পিঠে এগারোটি কবিতার আবৃত্তি এতে আছে।

ক্যাসেটের শিল্পসম্মত প্রচ্ছদে আছে গাঢ় নীল রং, যা আদতে প্রেমের রং।

www.pathagar.com

নজরুল চর্চার প্রয়োজন

জীবন ধারণের খরচ নির্বাহের জন্য অধিকাংশ মানুষকেই কোনো না কোনো কাজ করতে হয়, কিছু না কিছু কাজ করতে হয়।

জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমিও কোনো না কোনো কাজ করেছি। সাংবাদিকতা করেছি, শিক্ষকতা করেছি, রিসার্চ প্রজেক্টের কাজ করেছি; আবার এখন সাংবাদিকতাই করছি।

কিন্তু জীবিকার জন্য যখন যা কিছুই করি না কেন, নজরুল চর্চাকে আমি এ যাবৎ কখনো আমার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম করি নি। নজরুল চর্চা আমার জীবিকা নয়। নজরুল চর্চা আমার কাছে বিলাসিতাও নয়।

বিনোদন তো নয়ই।

নজরুল চর্চা আমার কাছে একটা প্রয়োজন।

একটা অপরিহার্য প্রয়োজন।

সে প্রয়োজন ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তো অবশ্যই; এমনকি, রাজনৈতিকও বটে!

ইতিহাস চর্চা, বিশেষ করে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস চর্চাটাও আমার কাছে ঠিক সে রকমই প্রয়োজন।

এই উভয় বিষয়েই প্রয়োজন আমি যেভাবে অনুভব করি, প্রয়োজন সেভাবে অনুভব করা সবারই প্রয়োজন বলে মনে করি।

এই প্রয়োজন অনুভব করা কেবল প্রয়োজন নয়, উচিত।

প্রয়োজন বললাম এবং উচিত বললাম এ কারণে যে, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ইত্যাকার, জাতীয় জীবনের নানান ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক সময়ে এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আদেশ-নির্দেশ জারী করতে হয়, উদ্যোগ নিতে হয়, গঠনমূলক কাজ-কর্ম বলে মন্তব্য করতে হয়, সে-সব সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণ, আদেশ-নির্দেশ জারী এবং মন্তব্য সুবিবেচনা প্রসূত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইতিহাস, বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস চর্চা, এবং নজরুল চর্চা একান্তই অপরিহার্য।

আমরা হরহামেশাই স্বাধীনতার কথা বলি, জাতিসত্তার কথা বলি, সাংস্কৃতিক সত্তার কথা বলি, আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রিক হরেক রকমের চেতনার কথাও বলি এবং আমরা অবশ্যই দেশ গড়ার কথা বলি। কিন্তু এই সব বিষয়ে কোন্ কথাটা বলা সঠিক হবে, কীভাবে বলাটা সঠিক হবে এবং কোন্ কথাটা ইতিহাসের ধারাপাত স্বীকৃত সত্য, এসব বুঝবার জন্য বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস চর্চা এবং নজরুল চর্চা অপরিহার্যভাবেই আবশ্যক।

www.pathagar.com

আমি এখন কেবল নজরুল প্রসঙ্গেই আসছি।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টির অবদান আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির আঙিনায় ঠিক কী রকম এবং কতখানি সেটা বুঝবার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য বিষয়টিকে আমি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের নিরিখে পেশ করছি। এই প্রেক্ষিতে প্রথমে আনতে চাইছি ব্যক্তি মানুষ হিসাবে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের কথা এবং তাঁদের অবদানের প্রসঙ্গ।

যাঁরা কবি হন, সাহিত্যিক হন, শিল্পী হন, তাঁদের সবার জীবনবোধ এক রকম হয় না। এঁদের সৃষ্টির লক্ষ্য, এঁদের সবার সৃজনশীল কাজের লক্ষ্য এক রকম হয় না। এই ভিন্নতা দেখা দেয় সাধারণত এ কারণে যে, জীবনধারা ব্যক্তি মানুষের শ্রেণী-চেতনা তৈরি করে। মূলত এ কারণে কেউ কেউ শিল্প সৃষ্টি করেন স্রেফ শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্যেই। নিজের আনন্দময় আবেগের অভিব্যক্তি এবং অন্যদেরকেও তাঁর এই উপলব্ধির শরীক করাটাই এই সৃজনশীল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। এটাকে যদি আদৌ লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয় তবে এটুকুই বলা চলে।

কিন্তু যাঁদের লক্ষ্য কেবল শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি নয়, যাঁরা শিল্প সৃষ্টি করেন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে, তাঁদের গোত্রটা অবশ্য আলাদা। তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো পলায়নী মনোভাব থাকে না। জীবনের প্রয়োজনকে তাঁরা উপেক্ষা করেন না। মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, কোনো প্রায়োজনকেই তাঁরা উপেক্ষা করেন না, এড়িয়ে যান না। তাঁরা সৃষ্টিশীল কাজ-কর্ম করেন মূলত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে নয়, ধর্ম, ভাষা, কিংবা অঞ্চলকেন্দ্রিক বিভাজন প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কেবল মাত্র নিজ সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনে নয়, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল, দল, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বব্যাপী সমাজ মানুষের প্রয়োজনে এবং সেটা অনেকটাই সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। নানান দিক দিয়ে খতিয়ে দেখে তাঁরা ইতিহাসকে দেখেন, সমাজব্যবস্থাকে দেখেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখেন, রাষ্ট্রযন্ত্র ও এর উপরি কাঠামো যে সরকার সেই সরকারকে দেখেন গণমানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে একটা নির্দল, নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে হয়। তাঁরা খুবই সৎ এবং বিশ্বাসী হন। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষ হন তাঁরা। মানুষের জন্য তাঁরা সে রকম কিছুই চান যা তাঁরা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেন, নিজেরাও প্রত্যাশা করেন। ফলে এই ধরনের সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন মানুষরা স্বধর্ম বিসর্জন না দিয়েও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী হন। অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক সুবিচার তাঁদের কাছে আর সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত হয়। শোষণমূলক এবং বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা তাঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি, স্বস্তি, সামাজিক সুবিচার এবং নৈতিকতার অন্তরায় বলে মনে করেন। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিহার্যভাবেই থাকে।

www.pathagar.com

আত্মকেন্দ্রিক এবং ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা তাদের কাছে কোনোক্রমেই কাঙ্ক্ষিত মনে হয় না। তাঁদের জীবনধারা সে রকমই হয় যে রকমটা হলে মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন এবং তাঁরও মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, মানুষকে স্থায়ী দিক্-নির্দেশনা দিতে পারেন। ঠিক এ ধরনেরই সৃজনশীল প্রতিভার মানুষ ছিলেন নজরুল।

একজন কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পী হয়েও সাংবাদিক, সংগঠক, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ইত্যাকার নানান ভূমিকায় অনেক বিষয়ে পথিকৃতের কাজ করেও আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ ধরনেরই একটা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি। তাঁর সে ভূমিকা কালোত্তীর্ণও হয়েছে। আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যদি দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে চাই, গঠনমূলক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে গভীর চিন্তা-ভাবনার পরিচয় দিয়ে যদি সর্বক্ষেত্রে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে সে মুক্তিপথের দিশারী হতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব দিক দিয়েই কেবল নজরুল। তাই তো তিনি আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তার রূপকার।

আমাদের সমাজে, শিক্ষাব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে, এমনকি, ব্যক্তি মানুষের চারিত্র্যেও যতগুলো সমস্যা আছে, সবগুলিই তিনি শনাক্ত করেছেন এবং এগুলোর সমাধানের পথও দেখিয়েছেন।

কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে নয়, লেখাপড়া জানা মানুষ-জনদের নানান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষার অপূর্ণতার বিষয়েও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পথ-নির্দেশও দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন আস্তিক; কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, তাই ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

সামাজিক সুবিচারের বিষয়টি ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই জন্য শ্রেণী সমাজকে তিনি পছন্দ করতে পারেননি। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তিনি অনেক সমস্যার আকর বলে মনে করেছেন। তাই ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে আস্তিক হয়েও, নাস্তিক না হয়ে-ও তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। সবাই সমানাধিকার পাক, এ বিষয়ে তাঁর একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, আবেগ ছিল। এ বিষয়ে ব্যক্তি মানুষ হিসাবেও তিনি নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করতেন। আর এ বিষয়েও তাঁর মনে কোনো রকম কৃত্রিমতা ছিল না।

সব রকমের অসততাকেই তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

এই উপমহাদেশের একটা বড় সমস্যা হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে চ'লে আসা হিন্দু ও মুসলমান, এই দু'টো বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত স্বার্থ ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নে অবিচার ও আধিপত্যবোধ কেন্দ্রিক হরেক রকমের সমস্যা।

www.pathagar.com

এটা এক দিক দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও বটে! কেননা, এতে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে অন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার বঞ্চনার ব্যাপারটি থাকে। ধর্মের নামে, একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ, এই পরিচয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় যখন আর একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নানান বিষয়ে শোষণ ও বঞ্চনা করে তখনই সেটাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বলে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথটাকেই তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত পথ বলে মনে করেছেন। নিজের জীবন এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে নজরুল কার্যত সেই প্রমাণটাই রেখেছেন। স্বধর্মে আস্থাশীল হয়েও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্যও এ ক্ষেত্রে তিনি যে রকম বিশাল, ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে তো নেই-ই, বিশ্বসাহিত্যেও নেই।

ধর্ম, ভাষা এবং আঞ্চলিকতা ইত্যাকার কোনো কিছু নিয়েই কোনো বিভাজন প্রবৃত্তি আমাদের প্রিয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছিল না। এ দিক দিয়েও তিনি যথার্থই বিদ্রোহী কবি এবং জাতীয় কবি।

আঞ্চলিকতা, ধর্ম এবং ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে নজরুল সাহিত্যে আছে এক উদার আন্তর্জাতিক চেতনা, এক আন্তর্জাতিক আবেদন। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় প্রয়োজন পূরণ করেও তাঁর সাহিত্য এবং সঙ্গীতে আছে এক আন্তর্জাতিক আবেদন। জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে কোথাও তিনি এমন কোনো পরমাণুপরিমাণ অনুদারতার পরিচয় দিতে চাননি, যা কোনো বিষয়ে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনার, আন্তর্জাতিক আবেদনের, বিশ্বজনীন আবেদনের পরিপন্থী। এখানেও তাঁর ভূমিকা, তাঁর আবেদন অতুলনীয় এবং অনন্য। আর সেদিক দিয়ে তিনি বাঙলার কবি, উপ-মহাদেশের কবি হয়ে-ও অন্যতম বিশ্বকবি কেবল নন, এক অনন্য সাধারণ বিশ্বকবি। অপরিসীম মানসিক ঔদার্য এবং সুবিশাল সংবেদনশীল মনের কারণেই এমনটা হয়েছে। তিনি কেবল অসাধারণ কবি নন, অসাধারণ উদার ও মহৎ মানুষ। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষ। সব মানুষের জন্যই তিনি একজন প্রকৃত মানুষ।

তাঁর সাহিত্যে কমিটমেন্টের স্পষ্ট পরিচয় আছে। আবার সেই একই সঙ্গে নান্দনিকতাও আছে। তাঁর কমিটমেন্ট গণমানুষের কাছে। তাঁর দায়বদ্ধতা তাঁর শিল্পবোধকে, তাঁর সৌন্দর্যবোধকে, তাঁর রুচিবোধকে ছাপিয়ে ওঠেনি। সুন্দরের ধ্যান, এবং গণমানুষের মৌলিক সমস্যাদির অবসান কামনা এবং সমাধান সূত্র তাঁর সাহিত্য-শিল্পে একই সঙ্গে আছে।

প্রেম-প্রকৃতির এবং সংবেদনশীল মনের রোম্যান্টিক কবি তিনি। কেবল সর্বহারার কবি তিনি নন, কেবল সাম্যবাদী কবি তিনি নন।

তিনি বলতেন যে, তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব মানুষের কবি, সবার কবি। কেবল শোষকের কবি তিনি হতে চাননি, কেবল অত্যাচারীর কবি তিনি হতে চাননি;

www.pathagar.com

আর সবারই কবি তিনি হতে চেয়েছিলেন। একটা পক্ষপাতিত্ব তাঁর অবশ্যই ছিল। সে পক্ষপাতিত্ব কোনো ক্ষেত্রেই কোনো জালিমের প্রতি নয়, মজলুমের প্রতি। এছাড়া ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতার সীমানা পেরিয়ে তিনি সব মানুষেরই কবি।

এই সৎ, নিরপেক্ষ এবং সব মানুষের কবিকেই আমাদের প্রয়োজন। তাই নজরুল চর্চা করতে হবে আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে।

আজ আমাদের কাছে নজরুলের কোনো প্রয়োজন নেই। নজরুলের জীবনেতিহাসের, নজরুল সৃষ্টির, নজরুলের অবদানের অপরিহার্য প্রয়োজন কেবল আমাদেরই রয়েছে। আমাদের কাছে এই পরলোকগত মানুষটির আজ আর কোনো প্রয়োজন নেই।

নজরুল চিন্তা, নজরুলের চিন্তাধারা আমাদের জীবনে সমাদৃত হোক। তাহলে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পারবো এবং আত্মমর্যাদা লাভ করতে পারবো। এজন্য নজরুল চর্চার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের সবার কাজ করা দরকার। সর্বস্তরের পাঠ্য তালিকায় নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিভিন্ন দিকগুলো উপযুক্ত মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। নজরুল জীবনীর দুষ্প্রাপ্য উপাদানাদি, চলচ্চিত্র ও নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডাদিসহ নজরুল সৃষ্টির দুষ্প্রাপ্য, অপ্রকাশিত সব কিছুই অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। প্রতিটি নজরুল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং বিভিন্ন ভাষায় নজরুল গ্রন্থগুলোর অনুবাদের ব্যাপারেও আন্দোলন প্রয়োজন। নজরুলকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়ার এবং তুলে ধরার জন্য এ রকম উপেক্ষিত অনেক উদ্যোগই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নজরুল জন্ম-শতবর্ষের প্রার্থনা

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে ঢাকার নজরুল একাডেমীর যে নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়েছিল, সেই নির্বাহী পরিষদে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন সাহেব এবং মিন্টু রহমান সাহেব। এই নির্বাহী পরিষদে আমাকে দেওয়া হয়েছিল গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব। চৈত্র ১৪০৪-এ আমার সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক নজরুল একাডেমী পত্রিকার ২৯ বর্ষ : ২৯ সংখ্যায় এই নিবন্ধটি 'সামনে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী'— এই শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। এর আগে এটি প্রকাশিত হয় ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ। এর আগে সরকারি পর্যায়ে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউটে প্রথমে পঁয়ত্রিশ সদস্যের কমিটির যে অধিবেশন হয় সে সময় এর একটা কপি তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সাহেবকে, একটি কপি নজরুল ইন্সটিটিউটের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক সাহেবকে এবং আর একটি কপি নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবকে দিয়েছিলাম। সেই নিবন্ধটিই এখানে 'নজরুল জন্ম-শতবর্ষের প্রার্থনা' শিরোনামে পরিবেশিত হচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়েই তো আমার পড়াশুনা শুরু। আরো কারো কারো লেখার মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রায় সমস্ত লেখা আমি আমার স্কুল জীবনেই পড়ে শেষ করেছিলাম। কন্ব মুনির আশ্রম থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন সেটা মর্মস্পর্শী বলে আজো বিভিন্ন সময়ে মনে পড়ে। কন্ব মুনি সে সময় উচ্চারণ করেছিলেন, 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু! অকারণে প্রিয়জনের অনিষ্ট আশঙ্কা করে।'

আমার মনে হয়, ভালোবাসার দায়, ভক্তির দায়টা ঠিক এখানেই। কাউকে ভক্তি করলে, কাউকে ভালোবাসলে কিন্তু এই একই উদ্বেগ, একই উৎকণ্ঠা ঠিক থেকেই যায়। যারা নজরুল গবেষক, যারা নজরুল বিশেষজ্ঞ তাদের এক একজনের অনুভূতি হয়তো এক এক রকম, হয়তো আর এক রকম। কিন্তু ভক্তের অনুভূতি তো অন্য জিনিস। সৎ, বিশ্বাসী এবং সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন মহৎ, উদার ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে আমি তাঁকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। ফলে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি আমার কাছে অন্য অর্থ বহন করে। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য আদর্শিক টান অনুভব করি আমি। আমি যে নজরুল চর্চা করি, নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করার চেষ্টা করি সে আমি তাঁর কেবল ভক্ত বলেই।

আরো একটা ব্যাপার অবশ্যই আছে।

যে সমাজে, যে সম্প্রদায়ে আমি জন্মেছি সেখানে তো আমার একটা ঋণ আছে। এই সমাজ, এই সম্প্রদায় দিয়েই তো আমার একটা পরিচয়।

আমি যদি কাকদের সমাজেরও কেউ হই, তাহলেও ময়ূরপুচ্ছ তো আমাকে গৌরবান্বিত করবে না, সম্মানিত করবে না।

www.pathagar.com

ভিক্টোর হুগোর 'লা মিজারএব্‌ল্' সমগ্র ফরাসি সমাজের মানুষের মাথা আত্মবিশ্বাসে যতখানি উঁচু করে দিয়েছিল, নজরুলের এক 'বিদ্রোহী'ও তার চেয়ে কম কিছু নয়, অনেক বেশি কিছুই করেছে। তবু মনে হয়, তাঁকে সেভাবে ধারণ করার মতো, অনুসরণ করার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত আমরা আজও হয়ে উঠতে পারিনি। তা না হলে গণমনে তাঁর সম্পর্কে এত বিশাল ও ব্যাপক আবেগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তিনি এমন উপেক্ষিত কেন যে, তাঁর সৃষ্টির কিছু, তাঁর অবদানের কিছু না পড়ে, না জেনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ-পাস করা যায়? কোন যুক্তিতে, কোন গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনায়?

বাসায় ঘুরতে ফিরতে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে যখন চোখ পড়ে, বিশাল বিশাল চারটি খণ্ডে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্র জীবনী'র কথা ভাবি কিংবা যখন ভাবি 'রবি জীবনী' এই সাতটি খণ্ড লেখার পরও প্রশান্ত কুমার পাল আরো কত খণ্ডে লিখে যে শেষ করবেন সেটা হয়তো তিনি এখন নিজেও বলতে পারবেন না, তখন মনে হয় নজরুল জীবনীর ওপর এ রকম একটা কাজ করার, এ রকম একটা কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করার কেউ কি আমাদের এই বাংলাভাষী সমাজে নেই?

বিভিন্ন খণ্ডে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্র জীবনী'র মতো কিংবা যদি সম্ভব হয় প্রশান্ত কুমার পালের লেখা 'রবি জীবনী'র মতো পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের বন্দোবস্ত করা দরকার। এই কাজটা অত্যন্ত জরুরি এবং অপরিহার্য।

নজরুলের প্রতিটি গ্রন্থের ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশের বন্দোবস্ত করা দরকার। এটা আর একটা জরুরি এবং অপরিহার্য কাজ।

একাধিক হাতে নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ এক নয়, একাধিক হওয়া দরকার।

নজরুল জীবন, নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনার পক্ষে যাতে সহায়ক হয়, সেই লক্ষ্যে আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় নজরুল জীবনীর সময়ানুক্রমিক বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরার জন্য আলোচনা সভা, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, প্রতিটি নজরুল গ্রন্থ, গ্রন্থ-বহির্ভূত প্রতিটি নজরুল রচনা নিয়ে আলোচনা সভা এবং নজরুল সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভার বন্দোবস্ত করা দরকার। এতদ্‌সম্পর্কিত এক একটা বিষয়ের ওপর আলোচনা সভায় এক একজনকে পেপার পড়ার আহ্বান জানানো যেতে পারে এবং এই পেপারের ওপর অন্তত চারজনকে লিখিত আলোচনা পেশ করতে বলা যেতে পারে। আর এটা যে নজরুল চর্চা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হবে সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে এবং গ্রন্থাকারে এগুলো প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকীর তো আর বছর দেড়েকও দেরি নেই। অন্তত এই চিন্তাটা

www.pathagar.com

মাথায় রেখেও তো এই সব জরুরি এবং অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে উদোগী হওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

বিকেলে বা সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখার সুযোগ আমার সাধারণত হয় না। তবু এরই মধ্যে দূরদর্শনের কলকাতা কেন্দ্রে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'কবি নজরুল' দু'দিন দেখলাম।

অনুষ্ঠানটিতে নজরুল জীবনালেখ্যের কিছু কিছু থাকছে। গান, নাচ, আবৃত্তি, সাক্ষাৎকার, এমন অনেক কিছুই এতে থাকছে দেখলাম। কল্যাণী কাজী, খিলখিল কাজীরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো দেখলাম। কবি কলকাতায় সব শেষে সিআইটি রোডের যে বাসাটিতে থাকতেন, যেখানে কবি থাকাকালে প্রতি বছর নজরুল জয়ন্তী হতো, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন নজরুলকে দেখতে যেতেন, নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেখানকার মানুষজনের উৎসাহ ও আগ্রহ কেমন, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেসব কথাও প্রচার হতে দেখলাম। বিভিন্ন সময়ে কবি আর যেসব জায়গায় থেকেছেন সেই সব জায়গাগুলোকেও তুলে ধরা দরকার।

কলকাতায় একটা নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটিও হয়েছে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়েছে এবং আরো পরে বাংলাদেশ সরকারের তরফে জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়েছে।

নজরুলের জন্ম তারিখ হচ্ছে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। এর করেস্‌পন্ডিং ইংরেজী তারিখ হলো ১৮৯৯-এর ২৪ মে। ওই তারিখটি সামনে রেখে এর ঠিক দশ বছর আগে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে এক সভা ডেকে দশকব্যাপী নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য একটা নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটি গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন নজরুল গবেষক এবং তৎকালীন নজরুল অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম। এ দেশের নজরুল চর্চা-কেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন কর্মকর্তার সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে সেই কমিটি আর গঠিত হতে পারেনি। কমিটিটি গঠিত হলে জরুরি ও অপরিহার্য গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলোর অনেক কিছুই হয়তো করা সম্ভব হতো। এ বিষয়ে একটা প্রয়োজনীয় আন্দোলনও গড়ে উঠতে পারতো।

এ দেশে এখনো জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকীর ব্যাপারে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যম এখনো নির্বিকার।

কবির সমাধির ওপর যে স্মৃতিসৌধটা গড়ার কথা ছিল সেটা আজো হলো না।

কবির সমাধি ক্ষেত্র আজো পর্যটন মানচিত্রে ঠাঁই পেলো না।

দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে এটা আজো একটা দর্শনীয় স্থান হিসাবে তুলে ধরা হলো না। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীরা কবির জন্মদিনে সেখানে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে বা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যান না। কবির জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন এখনো সরকারি ছুটির দিন হিসাবেও ঘোষণা করা হয়নি।

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে নজরুলের জন্মদিনটা কোনো সরকার আজো ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেননি। কিন্তু করা উচিত ছিল।

একটা দৈনিক কাগজে ডক্টর রফিকুল ইসলাম একবার লিখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এম.এ. ক্লাসের পাঠ্য তালিকায় নজরুলের ওপর একশ' নম্বরের একটা পেপার থাকা দরকার ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এখনকার যে অবস্থা তাতে যে কোনো ছেলে-মেয়ে নজরুল না পড়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাস করতে পারেন। এই উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে নানান দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে চলেছে। কেননা, এভাবে পাস করে অনেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছেন।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জরুরি ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলোর অনেক কিছুই আজো উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। যেমন, চলচ্চিত্রকার নজরুলের মূল অবদানটা উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং নজরুল যে চলচ্চিত্রের সাথে নানানভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে অবদান রেখেছেন, এই ব্যাপারটা কার্যত চরম অবহেলা করা হচ্ছে। নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো জরুরিভিত্তিতে উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা দরকার।

চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে পা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের সুর ভাণ্ডারীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব ছিল কেবল সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালকের নয়। আরো অনেক কিছু। অভিনয় শিল্পীর স্বরপরীক্ষার ও শিল্পী নির্বাচনের দায়িত্বও ছিল তাঁর। তারপর চলচ্চিত্র যখন সবাক যুগে পা দিচ্ছিল, তখন পাইওনিয়ার্স ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টরের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র কেবল এক নয়, অনেকগুলোই আছে। নজরুল চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁর কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেছেন তিনি, চলচ্চিত্রের গানে সুর দিয়েছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এভাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে নানাদিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয়ে একটা ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার বন্দোবস্ত করা দরকার।

সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফিরে কবি তাঁর বেসামরিক কর্মজীবন শুরু করেছিলেন প্রথম পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এ সাংবাদিকতায় যোগ দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এও সাংবাদিকতা করেছেন তিনি।

দৈনিক 'সেবক' এবং দৈনিক 'মোহাম্মদী'তেও সাংবাদিকতা করেছেন তিনি। দৈনিক 'নকীব' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাঁরা, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মাসিক এবং সাপ্তাহিক "সওগাত"-এও সাংবাদিকতার একটা দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সাময়িকপত্র 'নওরোজ'-এও অত্যন্ত সাময়িকভাবে হলেও সাংবাদিকতার

www.pathagar.com

এবং লেখালেখির একটা দায়িত্বভার তিনি নিয়েছিলেন।
অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' তাঁর সারথ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল'-এর পরিচালক ছিলেন তিনি।
সাপ্তাহিক 'গণবাণী'-তেও সাংবাদিকতার অনেক দায়-দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।
শেষ পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি।

নজরুল সম্পাদিত, নজরুল পরিচালিত বা অন্য যে কোনোভাবে হোক, নজরুল সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোর অন্তত জেরক্স কপি বা ফটোকপি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা উচিত।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডগুলোর সবকিছুই অনুসন্ধান, উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

নজরুল সঙ্গীতের যেসব আদি গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করার জন্য দান হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে যেগুলো আছে সেগুলো টেপ করে রাখা দরকার এবং এইসব রেকর্ড কোম্পানীর ট্রেড মার্কসহ রেকর্ড নম্বর, গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীদের নাম যে লেবেলে যে অবস্থায় ছাপা পাওয়া যায় সেগুলোর ফটো তুলে রাখা দরকার।

আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট

নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর বিকৃতি রোধকল্পে নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুল সঙ্গীত ক্যাসেটে ধারণ করে তা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষার্থী শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও ভক্তদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির বন্দোবস্ত করাটা একটা জরুরি ও অপরিহার্য কাজ।

অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনা

নজরুলের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজটাও খুব জরুরি এবং অপরিহার্য।

(এক) কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো এবং কবির প্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপিগুলো এবং (দুই) কবির সুস্থাবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে কবির যেসব রচনা, সেগুলোর মূল কপি কিংবা জেরক্স বা ফটোকপি সংগ্রহ করা দরকার। (তিন) গ্রামোফোন রেকর্ড, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক এবং বেতার অনুষ্ঠানের জন্য কবি যেসব পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন সেগুলো এবং (চার) কবির লেখা এবং কবিকে লেখা বিভিন্নজনের চিঠিগুলোরও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক, (পাঁচ) কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন।

নজরুল সান্নিধ্যে এসেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের অনেকেই ইতোমধ্যে পরলোকগমন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুলের সহকর্মীদের, তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের এবং নজরুল সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিবর্গের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে

www.pathagar.com

যদি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হতো তাহলে সেই বিপুল তথ্যাদি নিয়ে ইতোমধ্যেই একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী লেখার কাজও শেষ করা যেতো। এখনো যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে অপরিহার্য মনে করেই করা উচিত।

নজরুল রচনার শুদ্ধ পাঠ

নজরুল রচনাবলীর শুদ্ধ পাঠ কী হবে সেটা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করা দরকার।

পাঠ মিলিয়ে দেখতে হবে (এক) কবির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে; (দুই) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল রচনার সঙ্গে; (তিন) বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত নজরুল রচনার সঙ্গে; (চার) গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত নজরুলের গানের বাণীর সঙ্গে; (পাঁচ) বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কবির সুস্থাবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নজরুলের গানের বাণীর সঙ্গে; (ছয়) কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন সংস্করণের সঙ্গে। এভাবে তারিখ-তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠ মিলিয়ে দেখলে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর অনেক পাঠ সংশোধন করা যাবে এবং নজরুল রচনাগুলো সময়ানুক্রমিক সাজানো যাবে বা বিন্যস্ত করা যাবে।

নজরুল জীবনীর তারিখ-তথ্য

নজরুল জীবনীর নানা তারিখ-তথ্য অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংগ্রহের কাজটা করতে হবে। যেমন, কলকাতার সেনানিবাস ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে, করাচীর সেনানিবাসে গিয়ে এবং সেসব জায়গার রেকর্ডস বা খাতা-পত্র, ফাইলপত্র ঘেঁটে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি আর্কাইভসের রেকর্ডপত্র ঘেঁটে, তেমনি বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকেও। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে হবে। নজরুলের সহকর্মী এবং নজরুল সান্নিধ্যধন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপকভিত্তিক সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করতে হবে।

নাট্যকার নজরুল এবং তাঁর নাটক-নাটিকার বিষয়ে তারিখ-তথ্য

লেটোর দল থেকে শুরু করে মঞ্চ, বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য নজরুল নাটক-নাটিকা লিখেছেন, নাটক-নাটিকায় অভিনয় করেছেন, নাটক-নাটিকার জন্য গান লিখেছেন, সেইসব গানে সুর দিয়েছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে পাণ্ডুলিপি, তারিখ-তথ্যাদি অনুসন্ধান ও উদ্ধার করার আছে।

নজরুল চর্চায় উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

দেশ-বিদেশে নজরুল চর্চা-কেন্দ্রিক নানান প্রতিষ্ঠান, নজরুল সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং নজরুল গবেষকদের কাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করা দরকার। দেশ-বিদেশে নজরুল চর্চা-কেন্দ্রিক নানান প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে কাজ করেছে এবং সেগুলোর দু'একটি এবং পরে প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো সংস্থা এখন কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সময়ানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এসব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে যেসব কাজ-কর্ম হয়েছে এবং হচ্ছে সেসব কিছুর বিস্তারিত তারিখ-তথ্যসম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা দরকার।

আলোচনা সভা

নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক নিয়ে অর্থাৎ নজরুল জীবনীর বিভিন্ন দিক, যেমন, নজরুলের শিক্ষা জীবন, সৈনিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদি এবং নজরুল সৃষ্টির বিভিন্ন দিক; যেমন, নজরুল কাব্য-সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত, নজরুল চলচ্চিত্র, নজরুলের নাটক, নজরুলের সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ইত্যাকার নানান বিষয়ে নজরুলের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল সে সব বিষয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা সভার বন্দোবস্ত করা দরকার এবং পৃথক পৃথকভাবে ওসব বিষয়ের ওপর গ্রন্থ প্রকাশ করা দরকার।

এবার নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিষয়টি অর্থপূর্ণ করার দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখে নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার বিষয়ে পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত, সে উল্লেখ একজন নজরুল ভক্ত হিসাবেই করবো। আর এসব ক্ষেত্রের মতো গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রেও আমাদেরকে প্রথমে শনাক্ত করতে হবে জরুরি ও অপরিহার্য কাজগুলো কী কী?

নজরুল জীবনী

গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে জরুরি ও অপরিহার্য কাজ হিসাবে আমি প্রথমেই উল্লেখ করবো বিভিন্ন খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্র জীবনী'-র মতো কেবল নয়, সময়ানুক্রমিক বিভিন্ন খণ্ডে লেখা প্রশান্তকুমার পালের 'রবি জীবনী'র মতো আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা বিভিন্ন খণ্ডে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য 'নজরুল জীবনী' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

যিনি নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত উপাদানাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ করছেন, যিনি উপমহাদেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস সময়ানুক্রমিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত তারিখ-তথ্য সময়ানুক্রমিক বিন্যস্ত করার প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই যাঁর আছে, এই দায়িত্ব কেবল তিনিই পালন করতে পারবেন।

এ বিষয়ে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি যাঁর আছে, জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের এই কাজটা কেবল তিনি করতে পারবেন। কেবল নজরুল বিষয়ক একজন লেখক হলেই যে পারবেন, তা নয়।

আমি গবেষণামূলক এই কাজটা এক সময় সাংগঠনিক পর্যায়েও করেছি পশ্চিমবঙ্গে 'নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা'র তরফে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও কাজটি দীর্ঘদিন যাবৎ করার চেষ্টা করছি বলেই এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা রাখি।

নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব কেবল একজনকে নয়, উপযুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে দেয়া দরকার।

www.pathagar.com

সরকারি পর্যায়েই একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করা দরকার। আর নজরুল বিষয়ে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি আছে এবং জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে ইতোপূর্বে যাঁরা নিবন্ধাদি লিখেছেন, তাঁদের বই রিভ্যুয়ারের কাছে না পাঠিয়ে দায়-দায়িত্ব লেখকের ওপর দিয়েই ছাপা দরকার।

নজরুল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা

প্রতিটি নজরুল গ্রন্থের এবং গ্রন্থ বহির্ভূত প্রতিটি নজরুল রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হলো আর একটি জরুরি ও অপরিহার্য কাজ।

এই কাজটি যিনি করবেন তাঁকেও নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখতে হবে এবং তাঁকে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের নানান জায়গার ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং উপমহাদেশের অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিশেষভাবে বিংশ শতকের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করতে হবে।

কবি কোন্ সময়ে এটা রচনা করেছেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ এই আলোচনায় থাকতে হবে।

কবি যখন এটা রচনা করেছেন তখন তিনি কোথায়, কোন্ অবস্থায়, কী পরিস্থিতিতে থাকতেন, তাঁর জীবিকা বা পেশা তখন কী ছিল, সে সময় কাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ব্যক্তিগত জীবন কী রকম ছিল এবং এসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা কী রকম ছিল, তাঁর আর্থিক জীবন কী রকম ছিল,পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং প্রায়োগিক তাৎপর্য উল্লেখ করতে হবে।

প্রয়োজন মতো শব্দার্থ এবং ছন্দ, অলঙ্কার, রূপক, দৃশ্যকল্প, এ সবের বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয় বর্ণনা ও বিশ্লেষণ থাকতে হবে।

সাহিত্যালোচনা বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রেখে তুলনামূলকভাবে হতে হবে।

এক কথায়, একটা গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনায় যা কিছু থাকা দরকার, সে সবকিছুই থাকতে হবে।

এই কাজটার দায়িত্ব অর্থাৎ এক একটা গ্রন্থ বা রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা সমালোচনা করার দায়িত্ব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক এবং কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে।

নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ

নজরুল সঙ্গীতের সংখ্যা, উৎস, শ্রেণীবিন্যাস, পটভূমি, বাণীর সঠিক পাঠ, সুরের শুদ্ধতা ইত্যাকার বিস্তারিত উপাদান ও তারিখ-তথ্যসম্বলিত 'নজরুল সঙ্গীত' বিষয়ক যথাসম্ভব একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ এক বা একাধিক খণ্ডে প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে। এই কাজটার দায়িত্ব নজরুল সঙ্গীত গবেষক ড. স্বপ্না ব্যানার্জী,

www.pathagar.com

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর বা নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রাহক এবং নজরুল সঙ্গীত গবেষক আব্দুস সাত্তার সাহেবকে দেয়া যেতে পারে। কিংবা এ ধরনের গুণীজনদের প্রত্যেককে তাঁদের নিজেদের মতো করে লিখতে বলা যেতে পারে। অনেককে লিখতে দিলে স্বভাবতই অনেক বেশি কিছু উঠে আসবে। স্বপ্না ব্যানার্জী এবং কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যকে কাজটা বিশেষভাবে দেয়া দরকার। কেননা, ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের কাজ এবং কিয়দংশে হলেও আব্দুস সাত্তার সাহেবের কাজ যেভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাচ্ছে স্বপ্না ব্যানার্জীর কাজ এবং কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের কাজ সেভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়নি। এই সুযোগ না পাওয়ার কারণটাও একটা অনাকাঙ্ক্ষিত কঠিন বাস্তবতা হিসাবে মনে রাখতে হবে এবং সেটা এই যে, একটা আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিন্নতার কারণে হোক, কিংবা অন্য কোনো রকম মতপার্থক্যের কারণে হোক, ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে যে বাস্তবতার কারণে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে প্রতিবেশী শাসক সম্প্রদায় সাতচল্লিশের সেই বাস্তবতাই অনুসরণ করে চলেছেন। সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে যে পরিবর্তনটা এখানে এসেছে, সে রকম কোনো পরিবর্তন ওখানে আসেনি। ফলে নজরুল বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওখানে হলেও তেমন ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজকর্ম করার ব্যাপারে সে রকম কোন পৃষ্ঠপোষকতা ওখানকার নজরুল গবেষকদের অনেকেই পান না। এই বিশেষ দিকটির কথা বিবেচনা করে ওখানকার নজরুল গবেষকদের গঠনমূলক কাজে কার্যকর সহযোগিতা দেয়া দরকার। নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মের স্বার্থেই ওখানকার নজরুল গবেষকদের গ্রন্থাদিও এখানে প্রকাশ করা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো দরকার। ভারত-বাংলাদেশের নজরুল গবেষকদের নিয়ে কেবল নয়, বিশ্বের সবখানের নজরুল গবেষকদের নিয়ে একটা গেট-টুগেদারের বন্দোবস্তও করা আবশ্যক। জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এভাবে জরুরি, অপরিহার্য এবং গঠনমূলক কাজকর্মগুলোর দিকেই সবচেয়ে বেশি নজর দেয়া দরকার, অগ্রাধিকার দেয়া দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো বিশ্বভারতী। বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো বিশেষভাবে রবীন্দ্র চর্চাকেন্দ্রিক। রবীন্দ্র রচনার শুদ্ধ পাঠ কোন্‌টি তা দেখা এবং রবীন্দ্র রচনার অনুবাদের শুদ্ধতা যাচাই করে তা প্রকাশের অনুমতিপত্র দেয়াটাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারাধীন। তদুপরি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাণী ও সুরের শুদ্ধতা যাচাই করে দেখার জন্য বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীত বোর্ডকে। অতএব, রবীন্দ্র অবদান বা রবীন্দ্র সৃষ্টি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেয়ার কোনো সংস্থান ওখানে কোথাও নেই।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামে আছে আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'।

www.pathagar.com

আর ওখানকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা তো আছেই।

এই সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখার মতো ঘটনা এই যে, রবীন্দ্রনাথের নামে মিলনায়তন বা প্রেক্ষাগৃহ, রবীন্দ্রসদন কিংবা রবীন্দ্রভবন কেবল কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা এবং মহকুমা শহরেও আছে। খোদ রাজধানী দিল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও রবীন্দ্রভবন আছে।

সমান গুরুত্বের সাথে অনুরূপ ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্যও কি আমরা করতে পারি না? আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ থাকলে অপরিহার্য কাজ হিসাবেই এগুলো কিন্তু আমাদের করা উচিত।

আমাদের বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবির মর্যাদাপূর্ণ এমন একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা উচিত, যেটার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই অতি সহজেই আমরা উচ্চারণ করতে পারি ঃ 'বল বীর/ বল উন্নত মম শির'।

আমাদের দেশ নেতারাও যেন কবির জন্মদিনের ও মৃত্যুদিনের প্রভাতে তাঁর মাজার জিয়ারতে যান, শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যান।

বাইরের দেশ-নেতারা, সম্মানিত অতিথিরাও যেন এদেশ সফরে এসে অন্তত একবার কবির মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যান; যেমন পাকিস্তানে আল্লামা ইকবালের মাজারে যান তাঁরা।

এসব কিছুর জন্য পয়সার অভাব তো হওয়ার কথা নয়!

পয়সা কেবল সরকার দেবেন কেন? জনসাধারণও দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার একটা সার্কুলার দিয়ে চাঁদা সংগ্রহের আবেদন জানালেই তো কয়েক শ' কোটি টাকা চাঁদা সংগ্রহ অতি সহজেই সম্ভব হয়। আমাদের বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবিকে তো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আদৌ কোনো সুযোগ নেই। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব উৎসাহ ও উদ্যোগে পৃথক পৃথকভাবে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের প্রেরণাও জাগবে। এভাবে আমাদের জাতীয় কবি যথার্থ জাতীয় গুরুত্বও পাবেন।

www.pathagar.com

নজরুল চর্চার নানান অন্তরায়ের উৎসমুখ

।। এক ।।

এটা ১৯৯৯ সাল।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯-'র ২৪ মে। বাঙলায় ১৩০৬-এর ১১ জ্যৈষ্ঠ।

নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখছি।

আমি কোনো বিষয়ে নজরুল বিশেষজ্ঞ বা নজরুল গবেষক কিনা আমি জানি না। সে বিচার অন্যেরা করবেন। সে বিচার দু' শ' বছর পরে কেন, দু' হাজার বছর পরেও হতে পারবে।

তবে আমি নিজে যে কথাটা বলতে পারি সেটা এই যে, আমি একজন নজরুলভক্ত।

কবির একজন ভক্ত হিসাবে তাঁর জীবনী বিষয়ে কাজ-কর্ম করছি। কিংবা বলা ভালো, তাঁর বিষয়ে কাজ-কর্ম করার একটা চেষ্টা করছি।

একজন ভক্ত হিসাবে তাঁর জীবন ও সৃষ্টির সব বিষয়েই আমি সমান আগ্রহী। এ আগ্রহ আমার আন্তরিক। তাঁর সম্পর্কে আমি যা করি সেটা করি আমি অন্তরের টানে। এর সঙ্গে আমার জীবিকা জড়িত নয়। জীবন ধারণের জন্য আমি অন্য কিছু করি। নজরুল চর্চা আমার পেশা নয়। সাংবাদিকতাটা আমার পেশা।

নজরুল চর্চা আমি প্রয়োজনেই করি।

সে প্রয়োজন আমার সমাজের, আমার সম্প্রদায়ের।

নজরুল চর্চা আমি করি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য এবং আমার সমাজ ও সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসী করার জন্য। নজরুল চর্চা আমি করি সম্মানিত হওয়ার জন্য এবং আমার সমাজ ও সম্প্রদায়কে সম্মানিত করার জন্য।

নজরুল চর্চা আমি করি তাঁর জীবন ও সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথ-নির্দেশ আছে বলে, সাম্যবাদী আকাঙ্ক্ষা আছে বলে। গণমানুষের মনে এসব কারণেই তিনি বেঁচে আছেন বলে।

নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট তো নই বটেই, লক্ষ্যহীন কখনোই নই। নজরুল চর্চা আমরা করি আমাদের নিজ নিজ আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং সামাজিক সুবিচার অর্জনের প্রয়োজনে।

নজরুল চর্চা আমার কাছে কোনো বিলাসিতা নয়, একটা প্রয়োজন, একটা অপরিহার্য প্রয়োজন।

আমি বিশ্বাস করি, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, নজরুল চর্চার পথেই, আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে নজরুলের জীবনাদর্শ অনুসরণের পথেই উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতি, সম্মান ও সমৃদ্ধি আসতে পারে। এবং সেভাবেই সবকিছু পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

আমি খুব সংবেদনশীল মনের মানুষ। একজন সৃজনশীল মনের মানুষের যে ইমোশনাল ডিসচার্জের প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজন আমি কথা-সাহিত্যে পুরোপুরি মনঃসংযোগ করেও মেটাতে পারতাম। সেটা না করে আমি যে আমার মনঃসংযোগ মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস চর্চা এবং নজরুল চর্চার ব্যাপারে করলাম সেটা করলাম স্পষ্টতই একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। এর পেছনে আছে গণমানুষের প্রতি আমার আন্তরিক, অকৃত্রিম ভালোবাসা। গণমানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনের ব্যাপারটিকে আমি আমার নিজের প্রয়োজন হিসাবেই দেখি। আমি তো তৃণমূল স্তরের অজস্র সাধারণ মানুষেরই একজন। নজরুলও নিজেকে সেভাবে দেখতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এইখানে রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টির সঙ্গে নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বড় রকমের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থান এবং সমানাধিকার ও সাম্যের প্রশ্নে এবং সব রকমের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সমাজের প্রতি পুরোপুরি দায়বদ্ধ ছিলেন নজরুল। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই কোনো পক্ষপাতহীন উদার্যের পরিচয় দেননি। এর অজস্র সাক্ষ্য রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টিতেই পাওয়া যায়। সেখানে তাঁর শ্রেণীস্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় আছে, বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতি এবং উচ্চ বর্ণের মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন পক্ষপাতিত্বের পরিচয় আছে এবং তাঁর প্রতিবেশী মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি তাঁর নিঃসংকোচ আপত্তিও আছে। এদিক দিয়ে আদর্শের প্রশ্নে নজরুল গণমানুষের কবি। নজরুল বেঁচে আছেন মূলত গণমনে, জনশ্রুতিতে এবং গণমানুষের একান্ত আপনজন হিসাবে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার ওপর নির্ভর করে নয়।

নজরুল চর্চার দাবী আসে গণমন থেকে প্রতিষ্ঠানের কাছে, প্রশাসনের কাছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে, এস্টাবলিশমেন্টের কাছে। অর্থাৎ এটা আসে তৃণমূল স্তর থেকে শাসক শ্রেণীর কাছে। অন্যদিকে রবীন্দ্র চর্চা শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে সম্প্রচারিত হয়, ছড়িয়ে দেওয়া হয় সমস্ত স্তরে।

একদিন মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই এই বিষয়টিও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবে।

উপমহাদেশের মূল সমস্যাদির উৎস এবং ইতিহাস যারা জানেন, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেছেন এবং রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টি বিষয়েও যাঁরা অবহিত হয়েছেন তাঁদের কেউ আমার এই বক্তব্য বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কিছু খুঁজে পাবেন না। এক্ষেত্রে কেবল নথি-তথ্যভিত্তিক ব্যাপক পড়াশুনার মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তি আসতে পারে, আমরা পথ খুঁজে পেতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের আবেগ, অনুভূতি এবং অবস্থানের কথাটাও বলা দরকার। বিষয়টিকে আমি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি সে প্রসঙ্গেই এটা বলছি।

www.pathagar.com

স্কুল জীবনে এন্তার কবিতা লিখেছি।

গল্পও লিখেছি দু'একটা।

স্কুল জীবনে আমার কবিতা প্রথমে দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা স্কুলেই এবং আমি তখন দশম শ্রেণীতে পা দিয়েছি।

কলেজ জীবনে এসেও লিখতাম কবিতা, গল্প।

একটা কবিতা নিকটজনের বিয়ের উপহার হিসাবে ছাপা হয়েছিল।

একটা গল্প ছাপা হয়েছিল কলেজ ম্যাগাজিনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা বের করেছিলেন পত্রিকা।

সেই পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল আমার কলেজ জীবনে লেখা একটি গল্প। 'সেহেলী-সাম্পান' নামে সেই গল্পটি ছিল রূপক এবং অত্যন্ত রোম্যান্টিক। আমি পরে বুঝেছিলাম, সংবেদনশীলতা আমার নিজের জন্য একটা সমস্যা এবং রূপকের আবরণের বিলাসিতা আমার জন্য নয়। আমার সামনে উপমহাদেশের এক কঠিন বাস্তবতা।

একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ আমার দু'-একটা চিঠি ছাপা হয়েছিল সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ে। ইতিহাস চর্চার আগ্রহটাও আসে মূলত এই সময় থেকেই। ইতোপূর্বে যেমনটা নজরুল চর্চায় আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল সেই স্কুল জীবনেই বরীন্দ্রনাথের জন্মশতাব্দী উপলক্ষে ১৯৬১-তে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্কুলের অনুষ্ঠানে আমি আবৃত্তি করেছিলাম 'সুপ্রভাত' কবিতা।

আমার জীবনে নজরুল চর্চারও সুপ্রভাত আসে, নজরুল চর্চারও দ্বারোদঘাটন হয় সে বছরই।

সে বছরই স্কুলের ছেলে-মেয়ে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং বাইরের গুণীজনদের নিয়ে খুব উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে নজরুল জয়ন্তী করেছিলাম। নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখে ছেলে-মেয়েদেরকে সেসব বিষয়ে বক্তৃতা দিতে উৎসাহী করেছিলাম।

আমার জীবনে এভাবেই প্রথমে এসেছিলেন নজরুল। তারপর এর ঠিক দশ বছর পর এসেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস।

এর মূল, এই উভয়েরই মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। আমার সাংস্কৃতিক এবং সমস্ত দিকের অস্তিত্বের চেতনায়।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ১৯৭২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি যখন দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছিলাম তখন আমার মনে কবিতা কিংবা গল্প অথবা উপন্যাসের মতো কোনো কথাসাহিত্য ছিল না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দেখতাম একাত্তর এবং ভারতে পা রাখলেই দেখতাম সাতচল্লিশ। পাশাপাশি দুটো দেশ একই সময় যাত্রা শুরু করেও দুটো বাস্তবতা নিয়ে আছে। দু' জায়গায় দু' রকম বাস্তবতা।

ঊনিশ শ' সাতচল্লিশকে দু'দেশে দু'ভাবে দেখা হচ্ছে। অনেকটা এক যাত্রায় পৃথক ফলের মতো! এই গোটা ব্যাপারটা সুস্পষ্ট বুঝবার জন্য ইতিহাস বিষয়ে যতখানি পড়াশুনা করার প্রয়োজন সেটা আমি করার চেষ্টা করেছি। নথি-তথ্য, তারিখ-তথ্য যা পেয়েছি সে সবের ভিত্তিতেই ইতিহাসের ঘটনাগুলো এবং পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তবতাটা বুঝবার চেষ্টা করেছি, উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ভিত্তিহীনভাবে অযথা কোনো কিছু ধারণা করতে চাইনি বা কল্পনা করতে চাইনি।

আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝি যে, আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নথি-তথ্যের ভিত্তিতে, তারিখ-তথ্যের ভিত্তিতে না জানলে আমরা কোনো দিন কোনো ক্ষেত্রেই মুক্তি পাব না, মুক্ত হতে পারবো না। ইতিহাস চর্চায়, উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চায়, বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস চর্চায় আমার উৎসাহী হওয়ার কারণ মূলত এটাই। আমি আর্কাইভাল ওয়ার্ক করেছি মূলত বিংশ শতাব্দীর অংশের।

এর পাশাপাশি নজরুল বিষয়ক কাজ করেছি আমি কবির একজন ভক্ত বলেই।

ভক্তের একটা ঋণ থাকে। সে ঋণ আন্তরিকতার, ভালবাসার, গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনার।

নিজস্ব জীবন-যাপনে সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা এবং ব্যক্তিত্ব ও নিরপেক্ষতার এবং স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার ও চারিত্রিক ঋজুতার যে অনন্য আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, তাঁর কাছে আমার ঋণ অবশ্যই সে কারণে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, মঞ্চ জগৎ, গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, চলচ্চিত্র, ইত্যাকার নানান আঙিনায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তো বটেই। আমাদের এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বহু ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা ছিল পথিকৃতের।

তাঁর সৈনিক জীবনে যেমন, তেমনি সাংবাদিকতায়, সাহিত্যাঙ্গনে, মঞ্চজগতে, রাজনৈতিক অঙ্গনে, গ্রামোফোন কোম্পানীগুলোতে, বেতারে, চলচ্চিত্রে অধিকাংশ সময়ে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের গুণীজনদের সঙ্গে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত ও ভজন লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অজস্র পৌরাণিক উপাদানাদি ব্যবহার করেছেন। সেই মানুষটিই সততা, বিশ্বস্ততা এবং চারিত্রিক ঋজুতার কারণে বারংবার বহু জায়গায় উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবীর উম্মত। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক সাম্য বা অর্থনৈতিক সমানাধিকারের ব্যাপারেও তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল পূর্বাপর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। নজরুল ছিলেন কেবল আস্তিক নয়, আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং সাম্যবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান

www.pathagar.com

নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

অজস্র উদ্ধৃতি ও নথি-তথ্য দিয়ে দেখানো যায় যে, এই দু'টি জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-চেতনার এবং অবদানের আসমান-জমিন পার্থক্য ছিল। বিশেষত এই উপমহাদেশের গণমানুষের ব্যবহারিক জীবনের খুব প্রয়োজনীয় দুটি দিকে। একটা হলো—অর্থনৈতিক সাম্য বা অর্থনৈতিক সুবিচারের দিক। আর একটা হলো বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের দিক। ব্যবহারিক জীবনের চিন্তাধারায় দু'জনের এই যে পরস্পর বিপরীত দুই মেরুতে অবস্থান, সেটা হয়েছে দু'জনের পরস্পর বিপরীত দুই অর্থনৈতিক স্তরে বা দুই অর্থনৈতিক শ্রেণীতে এবং মনুসংহিতার সমাজ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, এই দুটি ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অবস্থানের কারণে। এই উভয় কারণে নজরুল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কবি এবং গণমানুষের কবি হতে পেরেছেন।

প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মিতাবোধ এবং সহাবস্থানের চিন্তা-ভাবনা থাকায় নজরুল তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীতে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের নানান পৌরাণিক উপাদানাদি ব্যবহার করেছেন। তাদের জন্য কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতে ও ভজন লিখেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের কামনায় এই উপমহাদেশে সাম্যবাদী রাজনীতির অন্যতম পথিকৃতের এবং সাম্যবাদী সাহিত্য ও সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা কবি-সাহিত্যিক-সঙ্গীতকার-সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে পালন করেছিলেন তিনিই।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন শাসন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের অত্যন্ত সঙ্গত আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার কিছু কিছু ফিরে পাওয়ার প্রেক্ষিতে আপত্তি প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের ঐক্যের কথা বলেছেন এবং এগুলো যে ভাগ করা যায় না সে কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রেম, প্রকৃতি এবং এ রকম অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিরপেক্ষ বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেমন, প্রতিবেশী দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের প্রশ্নে নিরপেক্ষতার এবং ন্যায়-বিচারবোধের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের আদর্শ তিনি মানেননি। সেটা মানলে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর তাঁর যে প্রভাব ছিল তাতে উপমহাদেশের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতো।

এই উপমহাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের এ রকম লেখা অর্থাৎ প্রেম, প্রকৃতির মতো বিষয় নিয়ে লেখা, লাইব্রেরির মতো বিষয় নিয়ে লেখা আমার কাছে অবশ্যই প্রিয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতি তাঁর আদর্শ না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহারিক জীবনের এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনোই আমার আদর্শ ভাবতে পারিনি। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দিকটা

www.pathagar.com

মানতে চায়নি বলেই তাঁকে কখনোই আমার আদর্শ ভাবার সুযোগ আমি পাইনি। রবীন্দ্রনাথের এই সীমাবদ্ধতা এসেছে তাঁর নিজস্ব সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে। সমস্যাটা বুঝতে হলে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে।

আর এই প্রেক্ষিতেই উল্লেখ্য, যে ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা মান্য করে যে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে নজরুল এসেছেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের সংস্থান থাকায় নজরুলের ব্যবহারিক জীবনে এবং তাঁর সৃষ্টিতে অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতেও তা এসেছে। এভাবেই ব্যবহারিক জীবনে নজরুল আমাদের আদর্শ।

চিন্তা-ভাবনার মূল ভিত্তিভূমি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি হওয়ার কারণে ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ কখনো আদর্শ হিসাবে মানতে পারেননি। উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো তাই আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাভাষী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার না মেনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐক্যের কথা বললে তা কখনোই আদর্শ হয়ে ওঠে না।

প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের পৌরাণিক উপাদানাদি ব্যবহার করলেও এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য কীর্তন, ভজন ও শ্যামাসঙ্গীত লিখলেও কোনো হীনমন্যতা বা ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় না দিয়ে নজরুল তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সবটুকু তুলে ধরেছেন।

আর একদিকে এটাই হয়েছে সমস্যা। নিজের জীবন ও সৃষ্টিতে নজরুল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতি মানলেও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সমাজ সহাবস্থানের এই নীতি মানার মানসিক প্রস্তুতি এখনো হয়তো নিতে পারেনি। এই নিতে না পারার কারণেই সাতচল্লিশোত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজরুল বিষয়ক পঠন-পাঠন ও নজরুল চর্চা সেখানে উপেক্ষিতই রয়ে গেলো এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক জরুরি ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো সেখানে ব্যাপকভাবে যতখানি হওয়া উচিত ছিল সে তুলনায় তেমন কিছুই হয়নি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অনেক বিলম্বে কিয়দংশে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ অবশ্যই হয়েছে। যেমন, নজরুল জীবন কেন্দ্রিক স্মৃতিকথা বিষয়ে মুজফ্‌ফর আহমদের কাজ, নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থাদির বিষয়ে ড. শিশির করের কাজ, জীবনী বিষয়ে ড. সুশীল কুমার গুপ্তের কাজ, ড. মিলন দত্তের কাজ এবং সঙ্গীত বিষয়ে নারায়ণ চৌধুরীর কাজ, ড. স্বপ্না ব্যানার্জির কাজ, কল্যাণ বন্ধু ভট্টাচার্যের কাজ, ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের কাজ, কল্পতরু সেনগুপ্তের কাজ, ড. বাঁধন সেনগুপ্তের কাজ, পশ্চিম বঙ্গ সঙ্গীত অ্যাকাডেমীর কাজ, পশ্চিম বঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমীর কাজ, হরফ প্রকাশনীর কাজ, নবজাতক প্রকাশনীর

www.pathagar.com

কাজ। পশ্চিম বঙ্গ সঙ্গীত অ্যাকাডেমী এবং পশ্চিম বঙ্গ নাট্য একাডেমীর উদ্যোগটা খুবই সাম্প্রতিক। তবে পশ্চিম বঙ্গ সঙ্গীত অ্যাকাডেমীর কাজটা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, সেখানে নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আর হরফ প্রকাশনী ও নবজাতক প্রকাশনী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকাশনা সংস্থা হলেও এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মালিক নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়েছেন। তদুপরি নবজাতক প্রকাশনীর মালিক মাজহারুল ইসলাম সাহেব তো তাঁর প্রকাশনা সংস্থার বাইরে অনেক আগে থেকেই পশ্চিম বঙ্গ নজরুল জয়ন্তী কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

পশ্চিম বঙ্গের নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মগুলোর মধ্যে নজরুল-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, নজরুল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ নারায়ণ চৌধুরী, ড. স্বপ্না ব্যানার্জি, কল্যাণ বন্ধু ভট্টাচার্য, ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এবং 'নিষিদ্ধ নজরুল' প্রণেতা ড. শিশির করের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বঙ্গে নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মে আমি উদ্যোগী হয়েছিলাম ওখানে নজরুল চর্চার হাল দেখে। নজরুল সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই ওখানে ছিলেন বা আছেন। নজরুলের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনাদির, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদির অধিকাংশই ওখানে পাওয়া যাওয়ার কথা।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টির উপাদানাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলো নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে এটি ছিল একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা। গঠনমূলক কাজ-কর্মের বিষয়ে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারে এই সংগঠন সত্তর এবং আশির দশকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বিশেষত অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জরুরি ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় থাকায় এ বিষয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কাজ-কর্ম করার চেষ্টা আমি করেছি। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা আমি পাইনি। পেলে কাজ-কর্ম স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি পাওয়া যেতো। নজরুল চর্চা আমার পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়। জীবন ধারণের জন্য আমাকে অন্য বিষয়ে অনেক কাজ-কর্ম এবং পড়াশুনা করতে হয়। আমার সময় এবং এনার্জির একটা বড় অংশ ও সব কাজে ব্যয় হয়। জীবন ধারণের একটা সংস্থান আমার নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব হলে এ বিষয়ে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারতাম। এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যে যতটুকু পারছি সাধ্যমতো করার চেষ্টা করছি।

নজরুল চর্চার নানান অন্তরায়

।। দুই ।।

নজরুল বিষয়ে যাঁরা গঠনমূলক কাজকর্ম করেন, নজরুল চর্চা করেন, এই মহান কবির একজন নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত হিসাবে আমি তাঁদেরকে খুবই শ্রদ্ধা করি। আমি

www.pathagar.com

মনে করি : কেউ যদি কবির প্রকৃত ভক্ত হন তাঁরও মানসিকতা, মনোভঙ্গী ঠিক আমার মতোই। কিন্তু বিপত্তিটা বেধেছে ঠিক এই শ্রদ্ধাস্থলেই কোনো কোনো জায়গায়। যাঁরা নজরুল চর্চা করেন, বিশেষত নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত, নজরুল জীবন নিয়ে লেখালিখি করেন, রেডিও-টেলিভিশনের আলোচনানুষ্ঠানে শরীক হন, নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন, তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত জনদের কেউ কেউ যখন, ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা অবাঞ্ছিত অহমিকা, যে-কারণেই হোক, খোদ নজরুল চর্চাকেই সঙ্কুচিত করতে বসেন, তখন সেটা স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা ও আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে।

যাঁরা মুসলিম বিদ্বেষ, বুর্জোয়া কিংবা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুল বিরোধিতা করেন, নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রচার ও পঠন-পাঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, তাঁদের শত্রুতা, বিরুদ্ধাচরণ আমি বুঝতে পারি, জনসাধারণকে তা খানিকটা বোঝাতেও পারি; কিন্তু নজরুল বিষয়ক লেখক-কথকদের মধ্যে ছদ্মবেশে যাঁরা নজরুল চর্চাকে সঙ্কুচিত করেন, এমনকি, লাটে তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন তাঁদের মোকাবিলা করা, তাঁদেরকে শনাক্ত করতে পাঠক সাধারণকে, সরকার এবং জনগণকে সহযোগিতা করার কাজটাই সবচেয়ে শক্ত। এ বিষয়ে হতাশার কারণ যে কতখানি গভীরে সেটা বোঝানোর জন্যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি।

নজরুল-বিষয়ক এক প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মকর্তার মুখে খুবই দুঃখজনক হলেও একদিন শুনলাম, তিনি বললেন : "আমি নজরুল অনুরাগী নই।" বহুদিন পর তিনিই আর একদিন কেনো জানি না, বল্‌লেন : "নজরুল রচনাবলী বের হওয়ার আগে নজরুলের সঞ্চিতা পড়ে আমার মনে হয়েছিলো যে, তিনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবি।"

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে এবং সেটা অবশ্যই থাকাও উচিত। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়টা এই যে, নজরুল বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানের খোদ কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যায়ন যদি এই হয় তা'হলে জরুরি কাজকর্মগুলোও যে জরুরি ভিত্তিতে এবং আন্তরিকতার সাথে হবে, এটা আমরা আর কতখানি আশা করতে পারি? শুধু এটুকুই নয়। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে নজরুল বিষয়ক কাজের কথা আলোচনা করলেই শোনা যাবে 'সে আমরা সব করেছি, সে আমরা সব বলেছি,' এই ধরনের কথা!

জাতি হিসাবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে কতখানি গভীর, নজরুল বিষয়ে অত্যন্ত জরুরি কাজগুলোও যে সময়ে কেনো হয় না, তারই নমুনা হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম। এ বিষয়ে আপাতত এইটুকুই থাক্। কাজ যে কতখানি বাকি আছে, কী বিশাল পরিমাণ কাজ যে বাকি আছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি।

এ যাবৎ আমরা একটা প্রামাণ্য নজরুল জীবনী জনগণের হাতে তুলে দিতে পারিনি। কেউ লিখ্‌লেও তা ছাপানোর জায়গা তেমন নেই। অবশ্য এমনিতে অর্থাৎ

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এই ছাপানোর জায়গা অনেক আছে। আর সে সব জায়গা থেকে হাজার হাজার বই যে ছাপানোও হচ্ছে, এটাও ঠিক। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে, বিশেষত কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তারিখ-তথ্যভিত্তিক একটি প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রকাশ করার সুযোগ আদৌ আছে কিনা তা হলফ করে বলা শক্ত। কারণ অনেক আছে। এক, প্রতিষ্ঠানের কমকর্তা নজরুল বিষয়ক লেখক হলে এ রকম বই ছাপা হবে না। দুই, নজরুল বিষয়ক কোনো লেখকের কাছে এর রিভ্যু করতে দিলে পাণ্ডুলিপি ফিরে আসবে না, কিংবা অসংলগ্ন এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় আসবে, অর্থাৎ শুধু ভিত্তিহীন বিরূপ মন্তব্য আসবে। তিন, কাজটা যদি যথার্থই ভালো হয় তাহলে নজরুল বিরোধীরা চাইবে না যে, সেটা প্রকাশিত হোক। চার, নজরুল বিষয়ক লেখক বা নজরুল স্মৃতিচারক, কিংবা কোনো নেতা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির উক্তি বা আচরণের নথি-তথ্যভিত্তিক আপত্তি যদি কোনো প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপিতে করা হয়ে থাকে এবং সেই ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন, অথবা সেই ব্যক্তির সঙ্গে স্বার্থগত কারণে যুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হন তাহলে সেই পাণ্ডুলিপি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা নাও হতে পারে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন : 'নজরুল বিষয়ক এত বই ছাপা হলো! আর আপনি এ সব কী বলছেন?'

আমার স্পষ্ট জবাব, 'কেবল প্রামাণ্য নজরুল জীবনী নয়, নজরুল জীবনী বিষয়ক কোনো প্রামাণ্য বই এ যাবৎ এখান থেকেও ছাপা হয়নি। মাত্র একটি জায়গায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে ডক্টর শিশির করের "নিষিদ্ধ নজরুল" এ বিষয়ে অবশ্যই ব্যতিক্রম।

প্রামাণ্য নজরুল জীবনী নামে একাধিক বইয়ের উল্লেখ যে-কেউ করতে পারেন। আমি নিজে অবশ্যই সেগুলো পড়েছি। কিন্তু কাজ যে কতখানি অসম্পূর্ণ সেটা দেখানোর জন্য আমি মাত্র তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করবো। এক, নজরুল কোন্ কোন্ স্কুলে কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত পড়েছেন; দুই, নজরুল কোন্ কোন্ ঠিকানায় কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত থেকেছেন; তিন, নজরুল কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন, সময়ানুক্রমে এসব কেউ সাজিয়ে দিতে পারবেন না ঐ সব বই পড়ে। এইটুকুতেই বোঝা যায়, কাজ কতখানি হয়েছে। এই যখন অবস্থা, তখন নজরুল বিষয়ক লেখকদের কারো কারো কাছে শুনতে পাবেন, কিছুমাত্র শরম, সঙ্কোচ না করে নির্দ্বিধায় বলছেন, তাঁরা সবকিছুই করে ফেলেছেন! কেবল নজরুল জীবনী বিষয়েই নয়, নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত, সব বিষয়েই কাজের ঐ একই হাল্!

আস্লে নজরুল বিষয়ক জরুরি কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে, শতাধিক নয়, দক্ষ, নিবেদিত প্রাণ নজরুল ভক্তের সহস্রাধিক হাত দরকার। যাঁরা যথার্থ নজরুল ভক্ত নন, নজরুলের সুনাম বা ভাবমূর্তি যাদের কাছে বাণিজ্যের সামগ্রী কিংবা নিছক ব্যক্তিগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সোপান, তাঁরা চাইবেন, এটা তাঁদের একচেটিয়া

www.pathagar.com

ব্যবসায় হিসাবে থাকুক। আদত সঙ্কট ঠিক এইখানেই। তাঁরা বলতে চান না : কাজ অনেক বাকি আছে, এই এই কাজ বাকি আছে আপনি করুন, উঁনি করুন, আর যিনি পারেন, যিনি চান, সবাই করুন। এটা না বলে সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বলেন : আমি সব করেছি, আমাকে আরো টাকা দিলে, আরো সুযোগ দিলে আরো সব করে দেবো। নজরুল ভক্তের কাছে এর চেয়ে বিরক্তিকর এবং দুর্ভাগ্যজনক খবর আর কী হতে পারে?

আমি জানি : নজরুল জীবনীর অজস্র উপাদান এখনও সংগ্রহ করার আছে, এখনও অনেক কিছুই সংগ্রহ করা যায়। নানান জায়গায় নজরুলের অনেক অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য লেখা এখনও অনেক পাওয়া যায়। নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড পাওয়ার জায়গা এখনও আরো অনেক মেলে। কিন্তু এর জন্য টাকা দরকার, উপযুক্ত লোক দরকার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাল ফিতার বাঁধন একটু শিথিল করে উদ্যোগী হওয়া দরকার। এইভাবে নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো উদ্ধার করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও কোনো উদ্যোগ আছে? সহযোগিতা আছে?

যাঁরা এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন বা যাঁরা করবেন বলে আশা করা হয়েছিল এমন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার কম-বেশি টাকা দিয়েছেন, দিচ্ছেন। কিন্তু কাজ কতটুকু হয়েছে বা হচ্ছে? এর মূল কারণ, আন্তরিকতার অভাব, মানসিক ঔদার্যের অভাব। এ যাবৎ যা দেখেছি, শুনেছি, তা থেকে বুঝেছি, নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার প্রধান গুণটা হওয়া দরকার এই যে, তিনি অবশ্যই একজন নিবেদিত-প্রাণ নজরুল ভক্ত হবেন। একজন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষ যদি যথার্থ নজরুল ভক্ত হন তাহলে তিনি আন্তরিক তাগিদে জেনে নেওয়ার অনেক জায়গাই পাবেন যে, জরুরি ভিত্তিতেও কী কী কাজ করা দরকার এবং কাকে কাকে দিয়ে কীভাবে করা দরকার। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে আর নিছক কোনো নজরুল বিষয়ক লেখক বা তথাকথিত গবেষক বসিয়ে তেমন কাজ হবে না। এতে বরং প্রতিবন্ধকতাই বাড়ে। হয়তো দরকার একজন উপযুক্ত নজরুলভক্ত কর্মীপুরুষ। প্রকৃত নজরুলভক্ত হলে তিনি প্রয়োজন মোতাবেক নজরুল গবেষক, নজরুলভক্তদের দিয়ে কাজ করাতে পারবেন।

কাজ অনেক বাকি। কাজের সিংহভাগটাই বাকি! নজরুল সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে এখনও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের অনেকের কাছ থেকে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে। নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট তৈরি করে ভর্তুকি দিয়ে তা বাজারে ছাড়তে হবে। এই সব ক্যাসেট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, নজরুল বিষয়ক লেখক, নজরুল ভক্তদের হাতে থাকলে নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুরের বিকৃতি অনেকখানিই রোধ করা সম্ভব হবে।

নজরুল বিষয়ে যাঁরা স্মৃতিচারণ ইতোপূর্বে করেছেন তাঁদেরকেও অনেক প্রশ্ন করার আছে। নজরুল জীবনী নিয়ে যাঁরা প্রকৃত গবেষণা করেছেন তাঁরাই জানেন প্রশ্ন

www.pathagar.com

করার আরো অনেক কিছুই আছে। কী কী আছে এ প্রসঙ্গে এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। উদাহরণ হিসাবে দুষ্প্রাপ্য তথ্যটি পৌষ ১৩৪০ (ডিসেম্বর ১৯৩৩-জানুয়ারি ১৯৩৪ : শাবান-রমজান ১৩৫২)-এর মাসিক "সওগাত" : ১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠা থেকে দিচ্ছি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন, এই দুষ্প্রাপ্য খবরটি এখানে পাওয়া গেলো এইভাবে :

"কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ইনি সম্প্রতি পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেহ ছায়াচিত্র জগতে এরূপ উচ্চপদের অধিকারী হন নাই। আমরা কবিকে তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

এই দুষ্প্রাপ্য তথ্যটি আমার 'অজানা নজরুল' গ্রন্থে আছে।

অনেকেই জানেন না, নজরুল বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম চিত্র পরিচালক। কবি নিশ্চয়ই পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর অনেক ছবিরই পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কবি যে পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন এই দুষ্প্রাপ্য তথ্যটি ইতোপূর্বে কেবল অন্যদের লেখায় কেন, খোদ সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের স্মৃতিকথায়ও পাইনি। তাঁর লেখা সওগাত যুগের অন্তর্ভুক্ত স্মৃতিকথায় সেটা পাইনি। আমি নিজে যখন এই শ্রদ্ধেয় প্রাচীন জনের সাক্ষাৎকার নিই, তখনও তিনি এটা স্মরণ করতে পারেননি। অথচ তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকায় এটা আছে। তথ্য অনুসন্ধানের কাজটা যে নানানভাবে, নানান দিক দিয়ে করতে হবে, এরই একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি ব্যাপক আর্কাইভাল ওয়ার্ক যে কতখানি অপরিহার্যভাবে দরকার, সে বিষয়ে আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

দৈনিক বঙ্গবাণীর পুরোনো ফাইল থেকে আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে গিয়েই আমি প্রথম জানতে পারি যে, 'প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুর ভাণ্ডারী নিযুক্ত' করেছিলেন 'ম্যাডন থিয়েটার্স লিমিটেড'। ৯ ফাল্গুন ১৩৩৭ : ২ শওয়াল ১৩৪৯ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ তারিখ শনিবার কবি এই দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। সে সময় ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড 'বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ' করছিলেন। নজরুল যে ম্যাডান থিয়েটার্সের সুর ভাণ্ডারী হয়েছিলেন এ তথ্যও কোনো নজরুল জীবনীতে নেই। এই তথ্যটা আমি অবশ্য আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থেও দিয়েছি। কাজ যে কত অসম্পূর্ণ এ প্রসঙ্গে আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। আমি এখন সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মাত্র দু'টো উদাহরণ দেবো।

১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন প্রথমে বেশ কিছুদিন তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন ঐ বাড়ির আর একটি অংশের বাসিন্দা এবং বাড়িওয়ালা যে ডাক্তার, সেই তিনিই যে রাত এগারোটায় কবিকে সপরিবারে বাড়ি

www.pathagar.com

থেকে উৎখাত করেছিলেন এবং কবি পরিবার চরম অসহায় অবস্থায় প্রায় মাঝ রাতে ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডে এক কবি-বন্ধুর বাসায় ওঠেন এবং সেখানে মাসখানেক থাকেন সে তথ্য সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথায়ও নেই কেন? কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন কালীপদ গুহ রায় যে খোদ কবি পরিবারেই থাকতেন, এ কথাও সূফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথায় নেই কেন? দুর্দিনে কবি পরিবার যে বজবজে শান্তিলতা সেনগুপ্তার কয়লা সড়কের বাড়িতে এক মাস ছিলেন সে তথ্যও কেবল কোনো নজরুল জীবনীতে কেন, সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথায়ও নেই। কোন্ কোন্ বিষয়ে আরো কী কী নেই সে তালিকা বাড়ানোর সুযোগ এখানে নেই। এ প্রসঙ্গে দু'-একটা উদাহরণ দিলাম এ জন্যই যে, এসব কোনো বিষয়েই তথ্যানুসন্ধানের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এ যাবৎ কোথাও নেওয়া হয়নি। অবস্থাটা এ রকমই বহাল আছে যে, কবির বিষয়ে জরুরি কাজকর্ম কেউ করতে চাইলে তাঁকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিগত সামর্থ্যানুসারেই তা করতে হবে এবং এই জরুরি তথ্যাদি গ্রন্থাকারে ছাপাতে হলে তা তাঁর গাঁটের পয়সা দিয়েই ছাপাতে হবে। সেই আর্থিক সামর্থ্য যদি তাঁর না থাকে তবে ঐ পাণ্ডুলিপি কোনো দিন ছাপা হবে কিনা, সেই অনিশ্চয়তায় তাঁর বছরের পর বছর পার হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আমি ব্যতিক্রমের কথা বলছি না।

নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জরুরি কাজকর্মগুলো প্রয়োজনের তুলনায় তেমন কিছু কেন করা যাচ্ছে না, জনগণকে সেই সীমাবদ্ধতার কারণ জানানোর দায়িত্ব তাঁদেরই। উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাবে অনেক কিছুই তো ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে এবং দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। যেগুলো এখনো হারাতে অবশিষ্ট আছে সেগুলোর অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত কি করা যায় না? কাজগুলোকে কেবল কাগজ-কলমে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেই কাজ হবে না। কাজগুলো কীভাবে কেমন গতিতে হচ্ছে, কতখানি হচ্ছে, এ বিষয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলে ভালো হয়। এই দাবীটা কাউকে দোষারোপ করার জন্য নয়, অভিযোগ হানার জন্যও নয়। অযথা তর্কাতর্কিটাও কারো কাম্য হতে পারে না। একটা বিশাল কাজ কীভাবে সময় থাকতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে সেইটা সবাইকে দেখতে হবে। উদ্বেগ এই কাজের বিষয়টি নিয়েই।

নজরুল চর্চার অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে আছে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এম. এ. ক্লাসের বাঙলা পাঠ্যতালিকা। নজরুলকে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবর দেওয়া হয়েছে, খোদ সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের বাঙলা পাঠ্য তালিকায় নজরুল ঐচ্ছিক। অর্থ্যাৎ ছেলেমেয়েরা নজরুল জীবন ও সাহিত্য না পড়েও বাঙলায় এম. এ. পাস করতে পারে। এই ছেলে-মেয়েরাই তো রেডিও-টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙলা একাডেমীতে, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, এমনকি, নিজ পরিবারে যদি শেখান যে, নজরুল বড় কবি নন, তাহলে দোষ দেবো কাকে? এ বিষয়ে কি একটা আন্দোলন হওয়া উচিত নয়?

www.pathagar.com

জাতীয় কবির জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা যায় না?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙলায় এম. এ. ক্লাসে নজরুল সাহিত্য অদ্ভুত হয়ে আছে। আর পশ্চিম বাঙলায় নজরুল কেন্দ্রিক যে প্রতিষ্ঠানটি কিঞ্চিৎ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায় সেখানেও ডক্টর বাঁধন সেনগুপ্ত, ডক্টর মিলন দত্ত, ডক্টর হারাধন দত্ত, ডক্টর শিশির কর, ডক্টর স্বপ্না ব্যানার্জি, কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য, ডক্টর অনুপ ঘোষাল প্রমুখ নজরুল গবেষকরা এক রকম অদ্ভুৎ হয়েই আছেন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সেখানেও নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্ম প্রয়োজনের তুলনায় তেমন কী হচ্ছে? ওখানকার প্রতিষ্ঠান ওখানকার নজরুল গবেষকদেরকে অদ্ভুৎ জ্ঞান করে এখানকার দু'-চারজনকে যে এ যাবৎ নজরুল পুরস্কার দিয়েছেন, এর পেছনে এ দেশে তাদের প্রচার লাভ এবং এ দেশের বাঙলাভাষী জনসাধারণকে ভুল সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছা ছাড়া আর কী থাকতে পারে জানি না। এ সব কিছুই অবশ্য পরোক্ষভাবে হলেও আসল কাজকর্ম থেকে মানুষের দৃষ্টি গৌণ বিষয়ে সরিয়ে রাখতে সহায়তা করে। নজরুল বিষয়ে জরুরি কাজকর্মগুলো যারা শিকেয় তুলে এই সব করেন তাদের কাজে নজরুলভক্ত জনসাধারণের পক্ষে আর কতখানি আহ্লাদিত হওয়ার থাকে?

নজরুল বিষয়ক জরুরি কাজকর্ম কতখানি এবং তা কোথায় কীভাবে কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আর বিলম্ব না করে খতিয়ে দেখা দরকার। নজরুল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোরও হয়তো নানান অসুবিধা, সীমাবদ্ধতা থাক্‌তে পারে; কিন্তু সেটা জনসাধারণকে জানাতে হবে, প্রকাশ্য আলোচনায় আনতে হবে। এভাবে কিংবা অন্য যে-কোনোভাবে হোক, অন্তরায়গুলো জাতীয় স্বার্থেই অবিলম্বে দূর করা দরকার। যা এখনো হারিয়ে যেতে অবশিষ্ট আছে, তা আর হারিয়ে যেতে দিলে চলবে না, যা এখনও হয়নি তা করার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

নজরুল চর্চার অন্তরায়ের উৎসমুখ

।। তিন ।।

বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তার রূপকার। উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং সহাবস্থানের কবি তিনি।

তিনি সাম্যবাদী কবি।

বাংলায় সাম্যবাদী সাহিত্যের এবং আমাদের গণসাহিত্যের এবং গণসঙ্গীতের তিনিই পথিকৃৎ।

উপমহাদেশ বিভক্তির আগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই তিনি জাতীয় কবি হিসাবে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। কেবল মাত্র একটি অনুষ্ঠানে নয়, একাধিক অনুষ্ঠানে। এক নয়, একাধিকবার।

সেদিন কিন্তু তাঁকে কোনো মহল থেকেই খণ্ডিত করে দেখার কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ ওঠেনি। তাঁকে কোনো অনুদার, পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার

www.pathagar.com

কোনো সুযোগও কবি কাউকে দেননি। এমনই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন।

১৯৪২-এর মাঝামাঝি কবি অসুস্থ হয়ে পড়ার বছর পাঁচেক পর ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের প্রতিবেশী সম্প্রদায়েরই এক অনুদার পরিকল্পনাক্রমে উপমহাদেশ যে ভাগ হয় তাতে মূলত প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী কবি উপমহাদেশের কোনো অংশেই আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় উপযুক্ত মর্যাদায় ঠাঁই পাননি এবং সেটা পরস্পর বিরোধী দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সুদূরপ্রসারী একই পরিকল্পনা মোতাবেক।

ভারতের শাসক সম্প্রদায় তাঁকে কার্যত উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করেছে একজন মুসলমান কবি এবং মুসলমানের কবি হিসাবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং গণমাধ্যমে নজরুল চর্চা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকভাবে করলে তাঁর অবদানের আর সব কিছুর সঙ্গে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহৎ ও গৌরবোজ্জ্বল সব কিছুই উঠে আসবে, বিশেষত এ কারণে।

অন্যদিকে ঠিক এই সাতচল্লিশ থেকেই এ দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় বাঙালিত্বের, ধর্মনিরপেক্ষতার এবং মার্কসবাদী নামাবলি গায়ে দিয়ে এ দেশের গণমানুষের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একটা অত্যন্ত গর্হিত, অনৈতিক এবং অবিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং বিপথগামী করতে চেয়েছে সেই সব লোকজন যারা কার্যত এ দেশে প্রতিবেশী দেশের এবং বাইরের কোনো কোনো দেশের শাসক সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

আজ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এ দেশের নজরুল চর্চার বিষয়টি কার্যত আক্ষরিক অর্থেই ঠিক এঁদেরই বা এঁদের শিষ্য সাগরেদদের করুণার ওপরই নির্ভর করছে। ১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৯৪৭ কিংবা ১৯৭১-এর মতো আর তেমন বড় কোনো ঘটনা না ঘটলে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির, ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভর অনুদার মনোভঙ্গির কোনো পরিবর্তনও হবে না।

নজরুল সৃষ্টিতে সাম্যবাদ, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের পৌরাণিক উপাদানাদি থাকলেও নজরুল চর্চা ব্যাপকভাবে করলে এর মধ্যে দিয়েই মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সব কিছুই উঠে আসবে বলে যারা নজরুল ইসলামের মূল চিন্তাধারা অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের চিন্তাধারাটা উপেক্ষা করে সেই পাকিস্তান আমলেই এখানকার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যাঙ্গন নজরুল ইসলামকে যথেষ্ট বাঙালী মনে করেননি, সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুদার লোকজনের ছদ্মবেশী আর একটা অংশ ইসলামপন্থীদের মধ্যে এই অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে উৎসাহিত করেছেন যে, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতে এবং ভজন লেখার কারণে এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে অজস্র হিন্দু

www.pathagar.com

পৌরাণিক উপাদানাদি ব্যবহার করার কারণে এবং তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা, সাম্যবাদী আদর্শ থাকার কারণে নজরুল যথেষ্ট মুসলমান নন।

সেই ১৯৪৭-এর উপমহাদেশ বিভক্তির পর থেকেই এ দেশের শিক্ষাঙ্গন, সাহিত্যাঙ্গন এবং সংস্কৃতির আঙিনা যারা নিজেদের প্রভাবাধীনে রেখে শাসন করছেন সেই তারাই যে মাঝে মাঝে নজরুলকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখার অন্তঃসারশূন্য অভিযোগ তোলেন, সেটাও তারা করেন কার্যত নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই। কোনো আন্তরিকতা থেকে নয়। কেননা, হিন্দুবা বা হিন্দুপন্থীরা অর্থাৎ মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম প্রথা-কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থকরা, প্যান ইসলামিজমের সমর্থকরা, অর্থাৎ ভারতপন্থীরা, মুসলমানরা এবং মার্কসবাদীরা, যাঁরা নজরুলের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তাঁরা নজরুলের সেই দিকটি নিয়েই যদি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে জরুরি এবং অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো করেন তাহলেও তো নজরুল জীবন ও সৃষ্টির সব কিছু অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের অর্থাৎ নজরুল চর্চার পুরো কাজটাই তো হয়ে যায়।

স্টাবলিশমেন্টের তরফে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুল জীবন ও সৃষ্টির সব কিছু অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ব্যাপক এবং কার্যকর কোনো পরিকল্পনা এ যাবৎ যখন নেওয়া হলো না, সে উদ্যোগ প্রতিবেশী দেশে কিংবা এখানে কোনো আমলেই ক্ষমতাসীনরা যখন নিলেন না, এই অবস্থায় যারা যেটুকু করছেন সেটাকে খণ্ডিত নজরুল চর্চা বলে অভিহিত ক'রে লাভ কী?

একজন মুসলমান যদি মিলাদ শরীফের মতো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নজরুলের ইসলামী কবিতা বা গানের বাণী আবৃত্তি করেন, একজন বৈষ্ণব যদি তাদের মন্দিরে নজরুলের লেখা কীর্তন গাইতে পছন্দ করেন, একজন শাক্ত যদি তাদের মন্দিরে নজরুলের লেখা শ্যামাসঙ্গীত গাইতে চান, একজন মার্কসবাদী যদি তাদের সাম্যবাদী আন্দোলনে ব্যবহার করেন নজরুলের লেখা সাম্যবাদী কবিতা, গান, নিবন্ধাদি তাহলে সেটাকেই তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মানতে হবে। ঠিক এভাবেই নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলোও যদি হয় তাহলে তো আর কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু সেভাবে সেটা করতে চাওয়া হচ্ছে না। যে নজরুল ১৯৪২-এ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই তাঁকেই ১৯৪৭-এর পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড় করাতে চেয়ে মূল নজরুল চর্চাকেই ব্যাহত করা হচ্ছে।

নজরুলকে চর্চা করতে হবে তাঁর পূর্ণ স্বরূপে।

নজরুল যা ছিলেন, যেমনটা ছিলেন ঠিক সেভাবেই। ১৯৪৭ হোক আর ১৯৭১ হোক, তাঁর পরবর্তীকালের রাজনীতির সঙ্গে, সাংস্কৃতিক নীতির সঙ্গে জড়িয়ে খোদ নজরুল জীবন ও সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে খাটো করতে চাওয়াটা ঠিক নয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতকে একই সঙ্গে ভারতের এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করতে যাদের আপত্তি নেই, বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা রবীন্দ্র সঙ্গীতকে যারা বাংলাদেশের

www.pathagar.com

জাতীয় সঙ্গীত করতে পারেন, তারা নজরুল বিষয়ে তাদের অনুদারতাটা কীসের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন সে ব্যাখ্যাটা নথি-তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তারা এ যাবৎ তা দেননি।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বাঙালী কারা আর ভারতীয় কারা, বাঙালীর স্বার্থ আর ভারতীয় স্বার্থ বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন, তাঁর ভাষা নীতি কী ছিল, তিনি কোন জাতির, কোন্ কোন্ বর্ণের, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ দেখেছেন, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার তিনি স্বীকার করতেন কিনা সে সব পরিচয় রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে যারা প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করেছেন, অন্তত বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী এবং আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পালের রবি জীবনী যারা পড়েছেন এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়েও যারা পড়াশুনা করেছেন তারা নিশ্চয়ই স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পারবেন উপমহাদেশের গণমানুষের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কার্যত কার চিন্তাধারা মোতাবেক সম্ভব।

নজরুল ছিলেন সাম্যবাদী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই চিন্তাধারা নিশ্চয়ই ইসলাম পরিপন্থীও নয়।

আবার তিনি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের স্বার্থটাকেই কেবল বাঙালীর স্বার্থ, ভারতীয় স্বার্থ হিসাবে দেখেননি। শূদ্রের অধিকারটাও তিনি সমানভাবে পুরোপুরি স্বীকার করতেন। বর্ণ ভেদ, শ্রেণী ভেদ, কোনো সংস্কৃতির প্রতি, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি উন্নাসিকতা তাঁর ছিল না।

তাঁর সৃষ্টি সবার জন্য। তাঁর জীবনটাও সবার জন্যই একটা উদাহরণ। অতএব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দারিদ্র্যপীড়িত গণমানুষ, অধিকার বঞ্চিত গণমানুষ কোনো দিনই তাঁকে ভুলবে না। তাই বারংবার নজরুল চর্চার দাবী আসবে গণমন থেকেই। প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

সুবিধাভোগী শ্রেণী, অনুদার শ্রেণী সে সব দাবীর কাছে একদিন পুরোপুরিই নতি স্বীকার করবে।

একদিকে ভারতের শাসক সম্প্রদায় যেমন ভারতকে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বঙ্গকে কার্যত হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসাবেই দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি তাদেরকে কেউ কেউ ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্ট থেকে এ দেশে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় মুসলিম প্রতিভা বিকাশের যে সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল সে ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত অনৈতিক এবং অবিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যত অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। সাতচল্লিশের পর এমন কতকগুলো বিশাল ঘটনা ঘটানো হয়েছে, যার ফলে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য সংস্কৃতিকে দাঁড় করানো হয়েছে অবিচারের কাঠগড়ায়।

www.pathagar.com

তাদের সম্প্রদায়ের লোক সাতচল্লিশের মধ্য আগস্ট থেকেই ভারতে সব কিছুই করতে চেয়েছেন হিন্দু ও মুসলমান, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু সাতচল্লিশের মধ্য আগস্ট থেকেই সেই একই সম্প্রদায়ের লোক এখানে মার্কসবাদের নামাবলি গায়ে দিয়ে এ দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়েছেন, এ দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আঙিনার মানুষজনদেরকে বুঝিয়েছেন যে, মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চা করাটা সাম্প্রদায়িকতা। এবং মিথ্যা করে প্রচার করেছেন যে, এই সাম্প্রদায়িকতাটাই উপমহাদেশ বিভক্তির জন্য দায়ী। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানান তৎপরতার মধ্যে এদের একজন রবীন্দ্রনাথকে এবং জীবনানন্দ দাসকে যেমন মার্কসবাদ সিদ্ধ করেছেন তেমনি নজরুলের অনুজপ্রতিম এবং নজরুলের তুলনায় মাইনর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে একমাত্র মার্কসবাদী কবি হিসাবে উপস্থিত করেছেন। নজরুল কেবল মানুষ নন, মুসলমান বলে এবং নজরুল সৃষ্টিতে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদানাদি আছে বলে নজরুলকে এই তথাকথিত মার্কসবাদী ভদ্রলোক একবার ছুঁয়েও দেখেননি। এই ভদ্রলোকের বই এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় রেফারেন্স বই হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে। আমরা বুঝবার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠিনি বলেই।

অনরূপভাবে আর একজন মার্কসবাদীর কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি কংগ্রেসপন্থী সন্ত্রাসবাদী মাস্টারদা সূর্য সেনের ওপর বই লিখে সূর্য সেনের রাজনীতিকে মার্কসবাদ সিদ্ধ করে দেখাবার এবং গ্রহণীয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একাধারে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস পন্থী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতিও বিশের দশকে যার লেখনীতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল সেই নজরুলকে তিনি একবার ছুঁয়েও দেখেননি।

অবিভক্ত বাঙলায় সাম্যবাদী সাহিত্যের পথিকৃত হয়েও এবং সাম্যবাদী সাহিত্যে বিশাল, ব্যাপক ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখেও নজরুল সাহিত্য তাঁদের কাছে মার্কসবাদ সিদ্ধ হতে পারলো না। নজরুল সাহিত্য হয়ে রইল অসিদ্ধ এবং কাঁচা। সেটা যেমন তাঁর মুসলমান হওয়ার কারণে, তেমনি তাঁর সৃষ্টির একাংশে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি উঠে আসার কারণেও।

এর ফলটা হলো এই যে, মুসলিম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে দেশটির সৃষ্টি হয়েছিল সে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রটা এবং শিক্ষাঙ্গনের একটা অংশ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ফলে একটা মিশন স্পষ্টতই মার খেয়ে গেলো।

স্রেফ উপমহাদেশ বিভক্তির কারণে ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্ট থেকে পশ্চিম বঙ্গে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ এবং অধিকার যেমন ওখানকার মুসলমানদের আর থাকলো না, অনুরূপভাবে তেমনি এতদঞ্চলে আলাদা রাষ্ট্রসৃষ্টি হওয়ায় এখানকার মুসলমানরা অবাধ সুযোগ পেলেও তাদেরকে একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

www.pathagar.com

লক্ষ্যভ্রষ্ট করার সমস্ত বন্দোবস্তই তার জন্মলগ্নের অব্যবহিত পর পরই আতুরঘরেই পাকাপোক্ত করা হলো। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, সাতচল্লিশপূর্বকালে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয়ে মুসলিম জনমনে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জায়গাটি থেকে সাতচল্লিশোত্তরকালে উপমহাদেশের উভয় অংশের মুসলমানরা দু'তরফে দু'টি ভিন্ন কারণে উৎখাত হয়ে গেলেন। এই পটভূমিতে নজরুল নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রেও বিশেষত পাঠ্য তালিকায় উপযুক্ত মর্যাদায় ঠাঁই পেলেন না। যদিও পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন দত্তরা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা পাকিস্তান আমলে এক ধরনের লেবাসের লোকজন মারফৎ শ্লোগান তুলেছিলেন যে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত লেখার কারণে এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে পৌরাণিক উপাদানাদি ব্যবহার করার কারণে নজরুল যথেষ্ট মুসলমান নন এবং একাত্তরোত্তরকালে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনেক কিছু থাকার কারণে এবং তিনি নানান জায়গায় বারংবার নিজেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবীর উম্মত বলায় যথেষ্ট বাঙালী নন।

আসল কথা হলো, রুদ্ধ দরজার গায়ে হোক কিংবা ক্ষমতাসীন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের পায়ের কাছে হোক, বারংবার মাথা ঠুঁকে এবং অনুনয় বিনয় করেও নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে জরুরি ও অপরিহার্য গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলো করানো যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গেই সেই কঠিন ঋজু প্রশ্নটার জবার জানতে ইচ্ছে করে : ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে উপমহাদেশ যদি ভাগ না হতো তাহলে একদিকের বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে অধিকার বঞ্চিত করে এবং অন্যদিকের বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এ রকম গঠনমূলক ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো থেকে বিরত ও নির্বিকার রাখা কি সম্ভব হতো? নজরুল চর্চার অন্তরায়ের উৎসমুখটা কোথায়?

উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারাপাতটির দিকে যদি আমরা চোখ রাখি তাহলে একটা কথা অস্বীকার করার কিন্তু আর কোনো সুযোগ থাকে না যে, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বৈরী পরিবেশেও প্রতিভা বিকাশের যে সুযোগ নজরুল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন প্লাটফর্মে সাতচল্লিশপূর্বকালে পেয়েছিলেন, সে সুযোগ কোনক্রমেই সাতচল্লিশোত্তরকালে এবং একাত্তরোত্তরকালে পেতেন না। যদি পাওয়ার হতো তাহলে সেই পাকিস্তান আমল থেকেই নজরুল সাহিত্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এম, এ. ক্লাসেও বিকল্প বিষয় হয়ে অবজ্ঞার শিকার হতো না।

www.pathagar.com

সাতচল্লিশ-পূর্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যতই থাক না কেন, উভয়েরই কমন্ এনিমি বা সাধারণ শত্রু ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি ও গণমানুষের কবি, সাম্যবাদী কবি হিসাবে নজরুল উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য সংস্কৃতির এবং রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে সুযোগ সাতচল্লিশোত্তরকালে তিরোহিত হয়েছে। উপমহাদেশ বিভক্তির পর প্রতিবেশী শাসক সম্প্রদায় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজরুল চর্চার দায়-দায়িত্ব আর স্বীকার করেন না।

আর সাতচল্লিশোত্তরকালে বাঙ্লাভাষী মুসলমানরা যারা শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনায় উচ্চাসনে বসেছেন, তারা মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী একটা পরিবেশের কারণে নজরুল সাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। এভাবে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, নজরুল চর্চার অন্তরায়ের উৎসমুখটা আসলে রাজনৈতিক। এখন সমস্যাটা মূলত সাংস্কৃতিক বলেই রাজনৈতিক। সমস্যাটা সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বলেও রাজনৈতিক।

এই সমস্যার সমাধান গণমানুষের তরফে একটা বড় রকমের আন্দোলনের মাধ্যমেই হতে পারে।

www.pathagar.com

নজরুল চর্চার হাল প্রতিবন্ধকতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী" এবং প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী"-র পাশাপাশি রেখে ডক্টর রফিকুল ইস্‌লামের "নজরুল জীবনী" একটু পরে দেখছি।

ফাল্গুন ১৪০০-য় তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক নজরুল একাডেমী পত্রিকার ১০ম সংখ্যায় "নজরুল জীবনী' রচনায় কয়েকটি সমস্যা" প্রসঙ্গে ডক্টর ইস্‌লাম আর কী কী লিখেছেন, এখন সেটা দেখা যাক্।

কবির জন্ম তারিখ তাঁর কাছে প্রথম সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

১৯৪২-এ কবি নির্বাক ও নিশ্চুপ হয়ে পড়ার বিশ বছর পর ১৯৬২-তে কবি পত্নীও যখন পরলোকগমন করলেন, তার দু' বছর পর ১৯৬৪-তে প্রকাশিত একটি স্মৃতি-কথায় কবির জন্ম তারিখ ১১ জ্যৈষ্ঠ, না ১১ বৈশাখ তা নিয়ে জ্যোতিষী পণ্ডিত বি. আর. ব্যানার্জীর বরাত দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে কবির জ্যেষ্ঠ সহোদর সাহেব জানের স্মরণ শক্তির দোহাইও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত স্মৃতিকথায় এটাও কবুল করা হয়েছে যে, "কবির সুস্থাবস্থায় ১১-ই জ্যেষ্ঠ তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। এতে কবি কোনো দিন আপত্তি জানাননি।"

এর পর নজরুলের জন্ম তারিখ আর কতখানি সমস্যা হিসাবে বহাল থাকে? এটা আদৌ কি কোনো সমস্যা? বিতর্কের উৎসটা যথাযথ উল্লেখ করার পরও কি সমস্যা থাকে? যা স্বয়ং কবির কাছে আপত্তিকর মনে হয়নি, তা নিয়ে নজরুল জীবনীকারদের কি বিব্রত হওয়ার মতো কিছু আছে?

তাঁর কাছে দ্বিতীয় সমস্যা : ১০ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করে নাবালক হওয়া সত্ত্বেও এক বছর সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করেছিলেন কিনা!

তাঁর কাছে তৃতীয় সমস্যা : 'নজরুল কোন্ সময় লেটো এবং কোন্ সময় কবি গানের দলে যোগ দেন?'

তাঁর কাছে চতুর্থ সমস্যা : "মক্তব, মাজার, মসজিদ জীবনের পরে যদি তিনি লেটো দলে যোগদান করে থাকেন তাহলে কি লেটো দলের পর তিনি স্কুলে ভর্তি হন"?

'তারপর বাসুদেবের কবি দলে'?

বাসুদেবের কবি দল থেকে গিয়ে গার্ড সাহেবের 'বয়'-এর চাকরিটা নেন?

এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর পর ডক্টর ইস্‌লামের মন্তব্য :

"নজরুলের কিশোর জীবনের এই পর্বটি খুব স্বচ্ছভাবে জানাও যায় না, লেখাও হয়নি। এই পর্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রয়োজন বিশেষত নজরুলের লেটো, কবিদল,

www.pathagar.com

গার্ড সাহেবের খানসামা এবং চা-রুটির দোকানে চাকুরী এবং ঐ পর্যায়ে কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে।"

তাঁর এই মন্তব্যও সঠিক।

কিন্তু এই কথাগুলো এর বহু আগে আমি আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছিলাম। ডক্টর ইস্‌লামের এই লেখার ৬ বছর আগে প্রকাশিত আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থেও এই কথাগুলি আছে।

তবে ডক্টর ইসলামের মতো এই বিষয়গুলিকে আমি কখনোই পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী রচনার অন্তরায় হিসাবে প্রচার করা তো দূরের কথা, বিবেচনাও করিনি।

আমি এক্ষেত্রে সহজ ব্যাপারগুলোকে সহজভাবেই দেখা উচিত ব'লে মনে করি। অর্থাৎ আমি মনে করি, তথ্যাদি যেটা যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে সেটা সেভাবেই উল্লেখ করে কোনটা কোন্ কোন্ কারণে সমর্থনযোগ্য এবং কোন্‌টা কোন্ কোন্ কারণে সমর্থনযোগ্য নয়, তা তারিখ-তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে নজরুল জীবনীকারের পক্ষে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত, কিংবা কোন্ কোন্ তারিখ-তথ্য, নথি বা অন্যান্য উপাদানাদির অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে না, সেগুলি শনাক্ত করা দরকার।

ডক্টর ইস্‌লামের উক্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ৬ বছর আগে প্রকাশিত আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম, বিশেষভাবে নজরুল জীবনের এই প্রথম পর্বের বিষয়ে একটা অনুসন্ধানমূলক গবেষণা হওয়া দরকার। উক্ত গ্রন্থে আমি এ উল্লেখও করেছিলাম যে, ডক্টর সুকুমার সেন আমাকে ব'লেছিলেন, নজরুলের জন্মকাল থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত নজরুল জীবনের এই প্রথম পর্বের ওপর পরিশ্রমী গবেষকের হাতে একটা ডক্টোরাল থীসিস হওয়া দরকার।

আমি মনে করি, নজরুলের সৈনিক জীবনের ওপরও পৃথকভাবে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। এই কাজটা করতে গেলে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে হবে, নজরুল সান্নিধ্যধন্য সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের ব্যাপক সাক্ষাৎকার নিতে হবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় বই-পত্রে সে সময় বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার ব্যাপারে যারা সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র ফাইলপত্র, কাগজপত্র, কলকাতার ৪৬ বীডন স্ট্রীটস্থ 'বেঙ্গলী রেজিমেন্ট হেড্ কোয়ার্টারস্'-এর খাতাপত্র, ফাইলপত্র এবং 'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী আন্দোলন' সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত কাগজপত্র দেখতে হবে। ফোর্ট উইলিয়মে সংরক্ষিত কাগজপত্র এবং করাচী সেনানিবাসে সংরক্ষিত কাগজপত্রগুলিও দেখতে হবে। অর্থাৎ সে সময়কার সেনাবাহিনীর রেকর্ডস থেকেও আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে হবে।

এসব থেকে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদেরকে যেমন উপযুক্ত আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া দরকার, তেমনি তাঁদেরও হওয়া দরকার প্রকৃত নজরুলভক্ত, সৎ এবং

www.pathagar.com

পরিশ্রমী। কাজটির প্রতি একাগ্র দৃষ্টি দেওয়ার জন্য তাদের সময়, এনার্জি মূলত এ দিকটায় নিবদ্ধ করতে হবে।

নজরুল জীবনীর অন্যান্য পর্বের কাজগুলোও ঠিক এভাবেই করতে হবে।

সেনাবাহিনী থেকে কবি কলকাতায় যখন ফিরে এলেন, সে সময় থেকে নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্যাদি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু নজরুল জীবনীর এই পর্বগুলির তথ্যাদিও ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে এবং উপযুক্ত অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের অভাবে অনেক কিছু ক্রমে হারিয়েও যাচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনীর জন্য এসব অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজগুলোও করতে হবে।

এই কাজগুলো যদি করা যায় এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টিকে সময়ানুক্রমিকভাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা রেখে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে নজরুল জীবনীর কলেবর কোনোক্রমেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী" কেন, প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী"-র কলেবরের চেয়ে কিছু কম হচ্ছে না।

যাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানে তাঁদের চাকরি-বাকরির দায়-দায়িত্ব ছাড়াও রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, নানান সভা-সমিতি, নানান কমিটি-সাব-কমিটি, নানান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব পালন করবেন এবং এসব কিছুর পাশাপাশি বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকপত্রের জন্য লেখা তৈরি করবেন তাঁদের পক্ষে এক জীবনে পূর্ণাঙ্গও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রণয়নের কাজ আদৌ করে যাওয়া সম্ভব যে হবে না এবং হতে পারে না, এ কথা হলফ করেই বলা যায়। কিন্তু তাঁরা যা করতে পারবেন না বা করবেন না তা অন্যদেরকেও করার ব্যাপারে যদি নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে, নজরুল জীবনী প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশাজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে?

ডক্টর ইসলাম যে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক সেই নজরুল একাডেমীর তরফে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে তিন দিনব্যাপী নজরুল সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ৩ জুন ১৯৯৪ তারিখ শুক্রবার বিকেলে নজরুল বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা 'নজরুল জীবনী'-র ওপর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইস্‌লামকে দিয়ে। তিনি যা বললেন তার মোদ্দা কথা হলো : এক, নজরুল জীবনী প্রণয়নের প্রাথমিক কাজটা মোটামুটি হয়েছে বলা চলে; দুই, তথ্যাদির অভাবে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রণয়নের কাজ করার আর কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ যেটুকু করার ছিল সেটুকু করা হয়ে গেছে।

ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইস্‌লামের বক্তব্যের প্রথম অংশের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত; কিন্তু তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি অজ্ঞতাপ্রসূত, না বিভ্রান্তি ও অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য করা হয়েছে সেটা বলা মুস্কিল।

এসব কিছুই সেদিন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের সামনে করা হলো। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যদি নজরুল বিষয়ক

www.pathagar.com

পড়াশুনা ভালোমতো না করে থাকেন তাহলে নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে নজরুল সম্মেলনের বদৌলতে তাঁর বিভ্রান্ত হওয়ার একটা অবকাশ সৃষ্টি হলো। আর ডক্টর রফিকুল ইস্‌লামের নাম ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইস্‌লাম না করলেও নজরুল একাডেমীর ব্যানারে এই প্রচারটা মোটামুটি ডক্টর রফিকুল ইস্‌লামের পক্ষেই গেল।

অথচ বক্তৃতামালার অংশ হিসাবে নজরুল জীবনীর ওপর বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হলে আলাদাভাবে অন্য কোনো জীবনী বিষয়ে যারা কাজ-কর্ম করেছেন বা করছেন তাদেরকেও এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশের সুযোগ দেয়ার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী" এবং প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী" যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই দুটি গ্রন্থ ডক্টর রফিকুল ইস্‌লামের "নজরুল জীবনী"-র তুলনায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থে যে কতখানি বড়, তাও লক্ষ্য করেছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী"-র প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮০; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭১; তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৯। চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২।

প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী" প্রথম খণ্ড ৪০৪ পৃষ্ঠার; দ্বিতীয় খণ্ড ২৬৫ পৃষ্ঠার; তৃতীয় খণ্ড ৩২৬ পৃষ্ঠার; চতুর্থ খণ্ড ৩৪৯ পৃষ্ঠার; পঞ্চম খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠার; ষষ্ঠ খণ্ড ৫৫৭ পৃষ্ঠার; সপ্তম খণ্ড ৫১৯ পৃষ্ঠার; অষ্টম খণ্ড ৩২৩ পৃষ্ঠার; নবম খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠার।

প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী"-র নবম খণ্ডের উপজীব্য ১৯২৩-২৪ থেকে ১৯২৫-২৬, এই ৩টি বছর। পরবর্তী পর্যায়ের রবীন্দ্র জীবন তো আরো ঘটনা বহুল। ফলে বাদবাকী 'রবি জীবনী' আরো ৯টি কেন, ১০টি খণ্ডেও শেষ হবে কিনা তা বলা মুস্কিল।

অপরপক্ষে ১৯৭২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগ থেকে প্রকাশিত "নজরুল-জীবনী"র পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী"-র কিংবা প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী"-র কোনো এক খণ্ডের সমান। তামাম নজরুল জীবনকে তিনি এই এক খণ্ডের মধ্যে এনেছেন এবং এটাকেই পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য ব'লে অভিহিত করেছেন। অথচ এটা করতে হলে এ রকম কলেবরের অন্যূন আরো দশটি খণ্ড দরকার। এই গ্রন্থে তিনি নজরুলের যে জন্ম তারিখ দিয়েছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন, "আমরা কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম তারিখ ১৩০৬ সালের ১১-ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে মে, মঙ্গলবার ধরে নিচ্ছি।"

কিন্তু পঞ্জিকায় দেখছি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ : ২৪ মে ১৮৯৯ : ১৩ মোহররম ১৩১৭ তারিখ মঙ্গলবার নয়, বুধবার। এর পর নজরুলের জন্ম-তারিখ নিয়ে 'ইত্তেফাক'-এ একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। ডক্টর ইস্‌লামও অবশ্য পরবর্তীকালে এই বারটি সংশোধন করে নিয়েছেন।

আমার বক্তব্য হলো, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ কালক্রমে গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়েই এগোয়। এটা স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতে হবে এবং অন্যদেরকে কাজের সুযোগ দিতে হবে। কোনোভাবেই কাজের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টাটা হওয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

নজরুল চর্চা ঃ অন্দরে অবরোধ

।। এক ।।

নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সবচেয়ে পুরনো যে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে আছে সেটা হলো নজরুল একাডেমী। এটা একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠানটির নাম নজরুল ইন্সটিটিউট। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে ১৯৬৪ সালে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৫ সালে। তাঁর আমলেই বেসরকারী পর্যায়ের নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমী সরকারি অনুদান পেত লাখখানেক টাকা।

সে টাকা পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে কমতে কমতে ২৫ হাজারে নেমে শেষে গত সরকারের আমল থেকে এখন শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ নজরুল একাডেমীকে সরকারি অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এটা কেন হয়েছে সে বিষয়টি যেমন সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত, তেমনি বিবেচনা করে দেখা উচিত স্বরলিপি প্রকল্পের মতো যেসব প্রকল্প প্রথমে নজরুল একাডেমী গ্রহণ করেছিল সে প্রকল্পে সরকারি আর্থিক সহযোগিতা কবি তালিম হোসেন নজরুল একাডেমীর কর্ণধার থাকাকালেই বন্ধ করে দেওয়ার কোন্ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল? সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইন্সটিটিউটের হাতে কি করার মতো যথেষ্ট কাজ ছিল না?

করার মতো জরুরি ও অপরিহার্য অনেক কাজই যে আছে এ বিষয়েও অনেকবারই লিখেছি। দৈনিকে এবং নজরুল একাডেমী পত্রিকাতেও। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউটে যে প্রথম সভা হয় সে সময় নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে জরুরি ও অপরিহার্য কাজের একটা তালিকাও দিয়েছিলাম তৎকালীন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সাহেবকে, নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক সাহেবকে এবং অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবকে। এর অব্যবহিত পর সেটা দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ কাজই করার ব্যাপারে মনোযোগটুকুও দেওয়া হয়নি।

এই মনোযোগ না দেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ সততার এবং আন্তরিকতার অভাব। অন্তরের তাগিদ, অন্তরের টান না থাকা। কাজটাকে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখা। কাজটাকে পেছনে ফেলে নিজেকে, নিজের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিজের ব্যক্তিগত অহংবোধ এবং আধিপত্য চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া।

আমি নজরুল ইন্সটিটিউট প্রসঙ্গে আরও কিছু কথায় একটু পরে আসছি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমীর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এই নজরুল একাডেমী

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে আরও দু'একটা বিষয়ে নজরুলভক্ত জনসাধারণকে অবহিত করা দরকার। নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নজরুল চর্চার চিত্রটা স্পষ্ট হবে না।

নজরুল একাডেমী

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখ মঙ্গলবার নজরুল একাডেমীর বার্ষিক সভায় নিয়মমাফিক যেসব বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সেগুলো ঠিকই হয়েছে। তবে উপস্থিত সদস্যরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানত দুটি বিষয়ে। ওই উভয় বিষয়ের একটি হলো, ১৯৬৪ সালে নজরুল একাডেমী যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের নামগুলো একটা বোর্ডে লিখিয়ে রাখা।

অন্য বিষয়টি হলো, ২০০০ সালের মে মাসের পর থেকে নজরুল একাডেমী প্রকাশনাও যখন পয়সার অভাবে বন্ধ হয়ে আছে তখন সাধারণ সদস্য নাসিম আহমদের প্রস্তাব মোতাবেক নজরুল একাডেমীর গঠনমূলক কাজকর্মগুলোর জন্য গণমানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হবে কিনা সে বিষয়টি।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নাম বোর্ডে লিখিয়ে রাখা এবং তা প্রদর্শন করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করেননি। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নামাঙ্কিত সেই বোর্ডটি স্থায়ীভাবে রাখা হবে কোথায়? অবাংলাভাষী মুসলমানদের যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর এখনকার নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত সেই জায়গাটি সরকার এখনও তো স্থায়ীভাবে নজরুল একাডেমীকে দেয়নি।

নজরুল একাডেমীর সাধারণ সদস্যদের হাতে রসিদ বই দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করার যে প্রস্তাব নাসিম আহমদ সাহেব দিয়েছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা কেউ কেউ করেছেন এই বলে যে, এতে নজরুল একাডেমীর মান সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, এই প্রস্তাব নজরুল একাডেমীর জরুরি ও অপরিহার্য গঠনমূলক কাজকর্মগুলো অনেকদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকার চেয়েও কি খারাপ?

নজরুল একাডেমীর অর্থ সংকট তো অনেক দিনের। জরুরি ও গঠনমূলক কাজকর্মগুলোর মধ্যে যে কাজগুলো শুরু করা হয়েছিল সেগুলোর অধিকাংশই অর্থাভাবে ক্রমে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

কেবল সাধারণ সভায় নয়, নজরুল একাডেমীর কার্য নির্বাহক কমিটির সভায়ও অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে একাধিক প্রস্তাব নেওয়া হলেও যে কোনো কারণে হোক সমস্যার সমাধান হয়নি। এমতাবস্থায় নজরুলভক্ত গণমানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলার ব্যাপারটাকে মান-সম্মানের বিষয় হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা কোথায়?

আর নজরুল তো গণমানুষেরই কবি। এই চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে নজরুলভক্ত গণমানুষকে আবার সংশ্লিষ্ট করার কাজটাও তো হবে। এটাও তো কম পাওয়া নয়।

তদুপরি প্রশ্ন করা যায়, নজরুলের সুস্থাবস্থায় তাঁকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য চ্যারিটি শোর বন্দোবস্ত করা হয়নি?

কবির অসুস্থাবস্থায় তাঁর পথ্য ও চিকিৎসার জন্য, কবি পরিবারের বাসা ভাড়ার জন্য,

www.pathagar.com

কবি পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য, চিকিৎসার্থে কবিকে ব্রিটেনে এবং জার্মানিতে পাঠানোর জন্য গণমানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়নি?

মনে রাখতে হবে, আমাদের অনেকের ঘরবাড়ি হওয়াটা বা ঘরবাড়ি থাকাটা যেমন বাস্তবতা, ঠিক তেমনি নজরুল একাডেমীর জন্য একটা নিজস্ব জায়গা এখনও না পাওয়াটাও একটা বাস্তবতা।

আমি ইতোপূর্বেও দৈনিক ইনকিলাবে নথি-তথ্য সহকারে উল্লেখ করেছিলাম, পাকিস্তান আমলে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর একাডেমীর স্থায়ী ঠিকানা খোঁজা হয়েছে ওয়ারী এলাকায় প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে, যেখানে তখন একটা সরকারি অফিস চলছিল। একাত্তরোত্তরকালে নজরুল একাডেমীর স্থায়ী ঠিকানা খোঁজা হয়েছে অবাংলাভাষী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়িতে।

নজরুল একাডেমীর জন্য সরকারের কাছ থেকে যেমন জমি চাওয়া হয়নি, ঠিক তেমনি গণমানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেও নজরুল একাডেমীর জন্য জায়গা কেনার এবং ভবন নির্মাণের চেষ্টা করা হয়নি।

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের প্রায় সবাই ছিলেন খ্যাতিমান গুণী মানুষ। এঁদের অনেকেই ছিলেন নজরুল সান্নিধ্যধন্য। নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কবি তালিম হোসেন ছিলেন ভাষা, অঞ্চল, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাকার সমস্ত বিভাজন নীতির উর্ধ্বে। ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ওপর উপযুক্ত দখলও ছিল তাঁর। তিনি অত্যন্ত ভাল সম্পাদক ছিলেন। নজরুল যেমন ছিলেন, ঠিক সেভাবে নজরুলের নানান দিক উদারভাবে চর্চার একটা পরিবেশও তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে নজরুল একাডেমীতে সেই পরিবেশ অবশ্য আজও অব্যাহত আছে। এই পরিবেশ নজরুল একাডেমীর এক অসাধারণ সম্পদ। এখানে যে কোন মানুষ আজও তার যে কোনরকম মতামত প্রকাশ করতে পারেন। কাউকে থামিয়ে দেওয়া হয় না।

নজরুল একাডেমীর প্রকাশনা নজরুলবিষয়ক বিভিন্ন বই, বিশেষত এর পত্রিকাগুলো নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য সম্পদ।

নজরুল একাডেমীর নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষায়তন, সুর-সাকী অনুষ্ঠান, একাডেমীর উদ্যোগে নজরুল সঙ্গীত সম্মেলন— এ সবকিছু কেবল দেশে বা উপমহাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায়ও নজরুল চর্চার প্রসার ঘটিয়েছে।

তাই এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতা করার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কেবল নজরুলভক্ত গণমানুষের নয়, নজরুলভক্ত গণমানুষের সরকারেরও।

কবি তালিম হোসেনের আমলে নজরুল একাডেমী এক সময় নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড, অপ্রকাশিত এবং দুষ্প্রাপ্য নজরুল রচনা এবং নজরুল জীবনের দুষ্প্রাপ্য উপাদানাদি সংগ্রহের উদ্যোগও নিয়েছিল। অর্থাভাবে সেসব কাজ এখন বন্ধ। এর অনেক কিছুর হয়তো হদিসও আজ আর মিলবে না।

www.pathagar.com

নজরুল ইন্সটিটিউট

সরকারি পর্যায়ে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার পর নজরুল একাডেমীকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখার কোন যৌক্তিকতা নেই। নজরুল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে এটাকে একীভূত করার চিন্তার মধ্যেও কোন দূরদর্শিতা নেই। গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক আরও একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে পারে এবং তাহলে সরকারেরও উচিত, তাদের গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া, পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া।

নজরুল ইন্সটিটিউটের ব্যাপারে সরকারের এখন দেখা উচিত, নজরুলভক্ত এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখার বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এমন ব্যক্তিদের গঠনমূলক কাজকর্ম করতে দেওয়ার সংস্থান নজরুল ইন্সটিটিউটে আছে কিনা! অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জরুরি ও অপরিহার্য কাজকর্মগুলো করার সংস্থান এবং এসব কাজ করানোর মতো লোকজন নজরুল ইন্সটিটিউটে আছে কিনা!

জরুরি ও অপরিহার্য গঠনমূলক কাজকর্ম কী কী করার আছে সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ "সামনে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী" শিরোনামে চৈত্র ১৪০৪-এ প্রকাশিত ২৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা নজরুল একাডেমী পত্রিকাতেও ক'রেছি।

আগেই উল্লেখ করেছি, এসব বিবরণ এরও আগে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক, অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম, এঁদেরকেও দিয়েছি। কিন্তু কাজকর্মগুলো হয় না কেন? মূল সমস্যাটা রয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউটে কাদেরকে কাজকর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়টিরও মধ্যে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে নজরুলবিষয়ক পড়াশোনার বিষয়, আন্তরিকতার বিষয়, ভক্তির বিষয়, উদ্যোগ ও গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনার বিষয়গুলো বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। অন্তত জাতীয় কবির ওপর কাজকর্মের বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্মের প্রয়োজনে। তাহলে নজরুল ইন্সটিটিউটে এ যাবৎ যেসব অনিয়ম এবং আন্তরিকতাহীনতার কাজ হয়েছে সেগুলো হতো না।

বিষয়টি এখন এরকম দাঁড়িয়েছে যে, নজরুল ইন্সটিটিউটের কোন কর্মকর্তা ঠিক করে নেন নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে কাকে কাকে আনবেন এবং নামের কোন্ তালিকা সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নেবেন। এর পর নজরুল ইন্সটিটিউটের নজরুলবিষয়ক আলোচনা সভাগুলোতে নাম থাকবে প্রধানত ট্রাস্টি বোর্ডের এই সদস্যদেরই। ফলে অনেক অনিয়মেই এদের অনুমোদন বা প্রশ্রয় পাওয়া সম্ভব হবে।

দেখা গেল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যারা নজরুল বিষয়ে সুবিচার করেননি নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে ঠাঁই দেওয়া হলো প্রধানত তাদেরকেই। স্রেফ ভক্ত হিসেবে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যারা

www.pathagar.com

গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন, তাদেরকে এভাবেই ঠেকানো সম্ভব হলো।

আমাদেরকে বলা হলো, মন্ত্রণালয় এসব ঠিক করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন করা যায়, মন্ত্রণালয় কি এতখানিই প্রাজ্ঞ যে, প্রথম দিকে নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলামকে বাদ দিয়ে ওয়াকিল আহমদ, মঞ্জুর মোর্শেদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আনিসুজ্জামান প্রমুখ অধ্যাপকদের এনেছিলেন? এই একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হয় কার প্রয়োজনে। আর এভাবেই নজরুল ইন্সটিটিউটে নজরুল চর্চা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আর এটাই হলো নজরুল চর্চার অন্দরে অবরোধ! এভাবেই নজরুল বিষয়ক জরুরি ও অপরিহার্য কাজগুলোর তালিকা দৈনিক ইত্তেফাকে, দৈনিক ইনকিলাবে, দৈনিক দিনকাল এবং নজরুল একাডেমী পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রকাশ করে জানালেও হয় না! এভাবেই নজরুল চর্চা এখন অন্দরে অবরুদ্ধ!

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জরুরি ও অপরিহার্য কাজকর্মগুলোর অনেক কিছুই আজও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। যেমন, চলচ্চিত্রকার নজরুলের মূল অবদানটা উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং নজরুল যে চলচ্চিত্রের সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে অবদান রেখেছেন, এই ব্যাপারটা কার্যত চরম অবহেলা করা হচ্ছে। নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো জরুরিভিত্তিতে উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা দরকার।

চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে পা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন নজরুল ম্যাডন থিয়েটার্স লিমিটেডের সুর ভাণ্ডারীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব ছিল কেবল সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালকের নয়। আরও অনেক কিছু। অভিনয়শিল্পীর স্বর পরীক্ষার ও শিল্পী নির্বাচনের দায়িত্বও ছিল তাঁর। তারপর চলচ্চিত্র যখন সবাক যুগে পা দিচ্ছিল, তখন পাইওনিয়ার্স ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টরের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র কেবল এক নয়, অনেকগুলোই আছে। নজরুল চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁর কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেছেন তিনি, চলচ্চিত্রের গানে সুর দিয়েছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এভাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। *নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক কোন প্রতিষ্ঠান, ফিল্ম আর্কাইভ ইত্যাকার কোন প্রতিষ্ঠানই নেয়নি।*

নজরুল সম্পাদিত, নজরুল পরিচালিত বা অন্য যে কোনভাবে হোক, নজরুল সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোর অন্তত জেরক্স কপি বা ফটোকপি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডগুলোর অন্তত জেরক্স কপি বা ফটোকপি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা উচিত।

নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর বিকৃতি রোধকল্পে নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন

www.pathagar.com

রেকর্ড থেকে নজরুল সঙ্গীত ক্যাসেটে ধারণ করে তা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষার্থী শিল্পী, ছাত্রছাত্রী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও ভক্তদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির বন্দোবস্ত করাটা একটা জরুরি ও অপরিহার্য কাজ।

নজরুল সান্নিধ্যে এসেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের অনেকেই ইতোমধ্যে পরলোকগমন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুলের সহকর্মীদের, তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের এবং নজরুল সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিবর্গের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হতো তাহলে সেই বিপুল তথ্যাদি নিয়ে ইতোমধ্যেই একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী লেখার কাজও শেষ করা যেত। এখনো যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে অপরিহার্য মনে করেই করা উচিত।

নজরুল রচনাবলীর শুদ্ধ পাঠ কী হবে সেটা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করা দরকার।

নজরুল জীবনীর নানান তারিখ-তথ্য অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজটা করতে হবে।

গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে জরুরি ও অপরিহার্য কাজ হিসেবে আমি প্রথমেই উল্লেখ করব বিভিন্ন খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা "রবীন্দ্র জীবনী"র মতো কেবল নয়, সময়ানুক্রমিক বিভিন্ন খণ্ডে লেখা প্রশান্তকুমার পালের "রবি জীবনী"র মতো আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা বিভিন্ন খণ্ডে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য 'নজরুল জীবনী' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

প্রতিটি নজরুল গ্রন্থের এবং গ্রন্থ বহির্ভূত প্রতিটি নজরুল রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হলো আর একটি জরুরি ও অপরিহার্য কাজ। বিশেষত স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটির পাঠ্য তালিকায় নজরুল উপেক্ষা রোধ করতে এবং পঠনপাঠনের সুবিধার্থে এটাও একটা অত্যন্ত অপরিহার্য প্রয়োজন।

বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় নজরুল গ্রন্থাদির অনুবাদের কাজগুলোও নজরুল চর্চার প্রসারের প্রয়োজনে করা দরকার।

নজরুল সঙ্গীতের সংখ্যা, উৎস, শ্রেণীবিন্যাস, পটভূমি, বাণীর সঠিক পাঠ, সুরের শুদ্ধতা, ইত্যাকার বিস্তারিত উপাদান ও তারিখ-তথ্যসম্বলিত যথাসম্ভব একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ এক বা একাধিক খণ্ডে প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে।

এরকম অনেক জরুরি কাজই তো করার আছে! নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠান এর কতটুকু সঠিকভাবে করেছে?

নজরুল চর্চার নানান অন্তরায়, সমস্যাদি এবং এর পুরো ছবিটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করার জন্য স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটির পাঠ্য তালিকায় নজরুল কতটুকু ঠাঁই পেয়েছেন, নজরুল চর্চার পরিবেশ কোথায় কতটুকু আছে এবং নজরুল ইন্সটিটিউটের জরুরি ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো কী কী হওয়া উচিত, এই উভয় বিষয়ে বিশেষত রাষ্ট্রযন্ত্র এবং এর উপরিকাঠামো সরকার যারা পরিচালনা করেন,

www.pathagar.com

তারা অবহিত থাকলে সেটা নজরুল চর্চায় আগ্রহী গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক হবে।

একটা দৈনিক কাগজে অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম একবার লিখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এম.এ. ক্লাসের পাঠ্য তালিকায় নজরুলের ওপর এক শ' নম্বরের একটা পেপার থাকা দরকার ছিল। পাকিস্তান আমলের তেইশ বছর এবং বাংলাদেশ আমলেরও তেইশ বছরেরও অনেক বেশি সময় যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় যে অবস্থা বিরাজ করেছে তাতে যে-কোনো ছেলে-মেয়ে নজরুল না পড়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাস করতে পেরেছেন। সেই অবস্থা থেকে সে রকম কোনো কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন গত কয়েক বছরেও হয়নি। এই উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে নানান দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে চ'লেছে। কেননা, এভাবে পাস করে অনেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনে এবং সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছেন। অতএব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেছেন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, এটা দেখেই কাউকে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো দায়িত্বভার দিলেই তাতে সঠিকভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করা হয়ে যায় না। নজরুল জীবন ও সৃষ্টিবিষয়ক কাজে যথেষ্ট ভক্তি, উদ্যোগ নিয়ে কেউ গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন কিনা এবং এভাবে কাজ যারা করছেন তাদেরকে কাজের ব্যাপারে সুযোগ ও সহযোগিতা দেওয়ার মানসিকতা আছে কিনা সেটা নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক কোনো প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বভার দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। তা না হলে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্দরের অবরোধ অপসারিত হবে না।

।। দুই ।।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নজরুল গণমানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়কবি। কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীর একাংশের নানান লেনদেনের হিসাব-নিকাশের টানাপড়েনে নজরুল কার্যত এক বিপর্যয়কর উপেক্ষার এবং অবজ্ঞার শিকার। কথাটা কারো কারো কাছে হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে; কিন্তু আসলে আক্ষরিক অর্থেই এটা সত্য।

প্রথমে নজরুল রচনাবলীর প্রকাশনার আঙিনার বা প্রকাশনার ক্ষেত্রের কথায় আসা যাক।

কারো রচনাবলী প্রকাশ করতে হলে এটা নিশ্চয়ই নিশ্চিত করতে হবে যে, তার রচনার পাঠটা যেন হয় শুদ্ধ পাঠ।

নজরুল রচনাবলীর শুদ্ধ পাঠ কী হবে সেটা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত করা দরকার। রচনাবলীতে এ বিষয়ে পাঠক এবং গবেষকদের অবহিত করার জন্য সবিস্তারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করাও দরকার।

www.pathagar.com

নজরুল রচনার শুদ্ধ পাঠ নিশ্চিত করার জন্য পাঠ মিলিয়ে দেখতে হবে (এক) কবির পাণ্ডুলিপির সাথে; (দুই) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল রচনার সাথে; (তিন) নজরুলের সুস্থাবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত নজরুল রচনার সাথে; (চার) গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত নজরুলের গানের বাণীর সাথে; (পাঁচ) বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কবির সুস্থাবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নজরুলের গানের বাণীর সাথে; (ছয়) নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন নাট্যকারের নাট্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নজরুলের গানের বাণীর সাথে; (সাত) নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন সংস্করণের সাথে।

এভাবে তারিখ-তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠ মিলিয়ে দেখলে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর অনেক পাঠ সংশোধন করা যাবে এবং নজরুল রচনাগুলো সময়ানুক্রমিক সাজানো যাবে বা বিন্যস্ত করা যাবে।

কিন্তু কাজ কি সেভাবে হয়েছে?

কাজ যে আদৌ সেভাবে হয়নি সে বিষয়ে দু'একটা উদাহরণ দিলে উপেক্ষার, অবজ্ঞার এবং ঔদাসীন্যের চিত্রটা স্পষ্ট হবে।

এই কয়েক দিন আগে ২০০২ সালের এই আগস্ট মাসেই নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান সাহেবের অনুরোধে বিটিভিতে গিয়েছিলাম নজরুলের কাব্যগ্রন্থ "সিন্ধু-হিন্দোল"-এর বিষয়ে দু-একটা কথাবার্তা রেকর্ড করাতে।

যাওয়ার আগে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত "নজরুল রচনাবলী", নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্যগ্রন্থ এবং আমার কাছে কলকাতার ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশিত "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্য গ্রন্থের যে প্রথম সংস্করণটি আছে, সেটাও দেখে নিলাম। নাম কবিতা এবং উৎসর্গ কবিতাসহ গ্রন্থটিতে আছে মোট একুশটি কবিতা।

৩০ জুলাই ১৯২৬ (১৪ শ্রাবণ ১৩৩৩ : ১৯ মুহররম ১৩৪৫) তারিখ শুক্রবার চট্টগ্রামের তামাকুমণ্ডিতে লেখা এই নাম কবিতাটি মাত্র দু' পঙ্‌ক্তির। পঙ্‌ক্তি দুটো হলো ঃ

'আলোর মতো জ্বলে ওঠো ঊষার মতো ফোটো!
তিমির চিরে জ্যোতির মতো প্রকাশ হয়ে ওঠো!'

এই পঙ্‌ক্তি দুটো বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীতে "সিন্ধু-হিন্দোল", এই শিরোনাম ছাড়াই ছাপা হয়েছে। আর নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত "সিন্ধু-হিন্দোল" গ্রন্থে কেবল এই কবিতাটির শিরোনাম নয়, পঙ্‌ক্তি দুটিকেও বাদ দিয়ে ছাপা হয়েছে।

নজরুল গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্যের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে?

ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশিত 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থে প্রকাশ তারিখ নেই। কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত ডি এম লাইব্রেরির আরো কোনো কোনো গ্রন্থে প্রকাশ তারিখ

www.pathagar.com

নেই। নজরুল রচনাবলীতে এরকম কোন গ্রন্থের প্রকাশ তারিখ কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে সে উল্লেখের নিশ্চয়ই অবকাশ আছে।

তবে পাঠ মিলিয়ে দেখাটাই সবচেয়ে বড় কাজ। আমার কাছে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে। শেষ পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ' এবং আরো অনেক পত্র-পত্রিকায় নজরুলের অনেক লেখা দেখেছি। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কবিতায় নেই, এমন দু'-একটা স্তবকও নজরুল রচনাবলীতে দেখেছি। আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীতে যখন এমনটা হলো, তখন নতুন সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদের চোখে সেটা পড়লো না কেন?

আসলে সম্পাদনার কাজটা যেভাবে হওয়া দরকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর নতুন সম্পাদনা পরিষদ নিশ্চয়ই কাজটা সেভাবে করেননি। যার পক্ষে নজরুলের যে যে গ্রন্থের, যে যে রচনার পাঠ মিলিয়ে দেখা সম্ভব তার কাছে সেই সেই গ্রন্থের, সেই সেই রচনার পাঠ মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব দেয়া হলো না কেন? এ ধরনের কাজ নতুন সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা করে থাকলে কে কোন্ কোন্ গ্রন্থ, কোন্ কোন্ রচনার বিষয়ে কাজ করেছেন সে উল্লেখ তো থাকা উচিত ছিল।

মুদ্রণ প্রমাদ থাকলে সেটা সংশোধন করে আর কিছু না করে নজরুল রচনাবলীতে নজরুলের প্রতিটি গ্রন্থ প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে প্রতিটি পৃষ্ঠা হুবহু ছাপিয়ে দিলে এবং এর পর প্রতিটি গ্রন্থ, প্রতিটি রচনা সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করলে সেটা একটা বড় কাজ হবে। পাঠক, গবেষক এরকম রচনাবলী থেকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

নজরুলের কোনো গ্রন্থে পৃষ্ঠায় একটা রচনার শেষে অবশিষ্ট খালি জায়গায় আর একটা রচনার শিরোনাম, রচনার প্রথমাংশ পরিবেশন করা হয়নি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীতে সে রকমটা করা হলো কি খরচ বাঁচানোর জন্য? নজরুলভক্ত জনসাধারণ কি নজরুলের লেখার পরিবেশন এভাবে দেখতে চান?

নতুন সম্পাদনা পরিষদ নজরুল রচনাবলী আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীর তুলনায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কমিয়ে চার খণ্ডের মধ্যে আনার সঙ্কল্প নিয়ে যে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করলেন, তাতে অধিক পৃষ্ঠা সংখ্যার কারণে কোন কোন খণ্ড দস্তুর মতো বেঢপ হয়েছে। এমনটা তারা করতে গেলেন কেন? বাংলা একাডেমী এমনটা করলো কেন?

উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্যে নজরুলের অনেক প্রকাশিত লেখা নজরুল রচনাবলীর বাইরে রাখা হয়েছে।

১ ডিসেম্বর ১৯৪১ (১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১১ জেলকদ ১৩৬০) তারিখ সোমবার দৈনিক 'নবযুগ'-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৯তম সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম, এই নামে সাইনড আর্টিকেল 'লক্ষ্যভ্রষ্ট'। দুষ্প্রাপ্য এই নিবন্ধটি অন্যান্য নজরুল রচনার সাথে প্রথমে ছাপতে দিই ঢাকার সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'-তে।

www.pathagar.com

এর কয়েক বছর পর নিবন্ধটি আমার দুটি গ্রন্থেও পরিবেশিত হয়েছে। ১৭ জুলাই ১৯৮৮-তে ঢাকার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থে এবং জুলাই ১৯৮৯-এ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আমার "নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়" গ্রন্থে। ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, এই ঠিকানাস্থিত সাহিত্যম্ থেকে মহালয়া ১৪০৫-এ প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত "শত কথায় নজরুল" গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৪০৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪০৯ পৃষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসেবে এই নিবন্ধটি উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু দৈনিক 'নবযুগ'-এর ফাইল থেকে দিনের পর দিন আর্কাইভাল ওয়ার্ক করে নজরুলের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য রচনা এবং নজরুল জীবনীর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক দুষ্প্রাপ্য উপাদানাদির সাথে এই দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধটি যে আমিই উদ্ধার করেছিলাম, এ বিষয়ে কোন উল্লেখ কল্যাণী কাজী সম্পাদিত এই গ্রন্থে নেই।

সে যাই হোক, এখানে আমার প্রশ্ন— নতুন সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ নজরুলের এই নিবন্ধটিকেও নজরুল রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন?

নজরুল রচনাবলী বাংলা একাডেমী থেকে বের হওয়ার আবশ্যকতা কোথায়?

ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে নজরুল রচনাবলী নজরুল ইন্সটিটিউট থেকেই বের হতে পারে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠাক্ষণ থেকেই ইন্সটিটিউটকে ভিতর থেকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। নজরুল বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে নজরুল ইন্সটিটিউটে স্থায়ী পদে যাতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকেন, সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা লগ্নেই নিশ্চিত করা হয়েছে। এর পর বাকি থাকবেন অস্থায়ী পদে কেবলমাত্র নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক।

পূর্ণাঙ্গ নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম থাকার কথা। এদিক দিয়ে নজরুল ইন্সটিটিউটে যত লোক কাজকর্ম করছেন, তাদের সবাইকেই এই প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন আছে বলে ধরে নিচ্ছি। এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা চান যে, প্রতিষ্ঠানটিতে গঠনমূলক কাজকর্ম হোক। কিন্তু সেইসাথে এই মর্মান্তিক বাস্তবতার কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, নজরুল ইন্সটিটিউট নিশ্চয়ই নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম করার প্রতিষ্ঠান, নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক জনসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্বভার প্রাপ্ত একটা প্রতিষ্ঠান। নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান কিছু, নানা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করাও এই প্রতিষ্ঠানের একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কিন্তু এই কাজগুলো বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে করানোর মতো বিভিন্ন বিভাগের দায়-দায়িত্ব পালন করার মতো, উপযুক্ত লোকজন নজরুল ইন্সটিটিউটের স্থায়ী পদে আছেন? থাকলে তাদের কাছ থেকে সে রকম কাজ আমরা কী কী পেয়েছি?

নজরুল বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বভার দিয়ে কাজ করানো দরকার।

www.pathagar.com

নজরুল ইন্সটিটিউটের অর্গানোগ্রাম, প্রশাসনিক কাঠামো এবং তাদের কাজকর্ম দেখে আমাদের এটাই মনে হয়েছে যে, ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মের সব কিছুই যেন বোঝেন নির্বাহী পরিচালকের পদে অস্থায়ীভাবে যিনি থাকবেন কেবল তিনিই। সব কিছু দেখে মনে হয়, অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজকর্ম বোঝেন, নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানাদিক নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম বোঝেন, নজরুল জীবনী, নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত, নজরুল সংশ্লিষ্ট নাটক, নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র ইত্যাকার বিষয়ে কাজকর্ম করতে এবং করাতে পারেন, এমন উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠাঁই নজরুল ইন্সটিটিউটে যাতে না থাকে সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় যারা নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করেছেন, এমন ব্যক্তিদের কাজকর্ম করার সংস্থান নজরুল ইন্সটিটিউটে থাকা দরকার।

নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডেও কেবল তাদেরকেই রাখার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে, যারা নজরুল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করেছেন, করছেন এবং গঠনমূলক পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। একজন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং আবদুস সাত্তার সাহেব ও আসাদুল হক সাহেবের মতো নজরুল সঙ্গীত গবেষকের পার্থক্যও প্রশাসন এবং তার উপরিকাঠামো যে সরকার, এই উভয়কেই বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তা না হলে নজরুলভক্ত গণমানুষের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা থাকবে এক রকম আর নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম হবে আর এক রকম।

নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে নজরুল ইন্সটিটিউটের আন্তরিকতাহীনতার অনেক উদাহরণ আছে। এর একটি উদাহরণ অবশ্যই নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ। নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাবে যে নজরুল ইন্সটিটিউ সরকারি টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পেরে ফেরত দেয়, সেই নজরুল ইন্সটিটিউট স্মারক গ্রন্থ ছাপার জন্য কি কোন ভাল প্রেস খুঁজে পায়নি, না ভাল প্রুফ রীডার খুঁজে পায়নি?

স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আমার লেখাটা পড়তে গিয়েও লক্ষ্য করেছি যে, ওদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও আন্তরিকতাহীনতা কত অপরিসীম।

কিন্তু নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের সবচেয়ে বড় অংশটাই এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই করাতে হবে। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির অনেক কিছুই পুনর্গঠনের, ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন আছে। প্রতিষ্ঠানটি সেভাবে গড়ে তুলে খুব ভাল করে দেখে-শুনে নজরুল রচনাবলী এখান থেকেই প্রকাশ করা দরকার। প্রতিষ্ঠানটিতে একজন মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা দরকার এবং তার অধীনে সাহিত্য বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ, নাটক ও চলচ্চিত্র বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, (নজরুল জীবনী বিষয়ক কাজ-কর্মসহ) অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ— এই বিভাগগুলো মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে আলাদা আলাদা পরিচালকের অধীনে আনা দরকার।

www.pathagar.com

নজরুল উপেক্ষার পরিবেশেই নজরুলকে খর্ব করে এই নাটক

।। এক ।।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলো তখন আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্যে' প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ হলেন মুসলমান। এই চল্লিশ শতাংশ ভোট কংগ্রেসের কাছ থেকে সরে এসে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টে আসায় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হতে পেরেছে।

ভারতের মার্কসবাদী সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ চাইতেন, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নজরুল চর্চা ব্যাপকভাবে হোক। জ্যোতি বসুকে তিনি তাঁর মনোভাবের কথা জানিয়েছিলেন। ১৯৬৭-তে সেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম তিন দিনব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য সমস্ত সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নজরুল সান্নিধ্যধন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীত শিল্পীরা তো ছিলেনই। তাঁর সান্নিধ্যধন্য রাজনীতিবিদরাও অনেকে ছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মতো মানুষ, যাঁকে একেবারে আবেগহীন বলে ধারণা করা হয়, তাঁকে দেখা গেল, নজরুলকে উপযুক্ত গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হচ্ছে দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে, আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়েছে। এই অনুষ্ঠানের দায়-দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জয়ন্তী কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের নবজাতক প্রকাশনীর মালিক মজহারুল ইসলাম। তাঁর কাছেই শুনেছি ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে তিনি নজরুলের ওপর কথাবার্তা বলেছিলেন ফাইভ ক্লাসে পড়া একটা ছাত্রের মতো। এরপর তাঁকে যখন ওঁরা গাড়িতে তুলে দিতে যান তখন সুনীতি বাবু প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনারা নজরুলকে কি রবীন্দ্রনাথের কাউন্টারপার্ট হিসাবে দাঁড় করাতে চান?'

বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের এটাই দুর্ভাবনা! নজরুল চর্চা মানে কেবল কীর্তন, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত এবং হিন্দুর অজস্র পৌরাণিক উপাদানাদি নয়, নজরুলচর্চা মানে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির সবকিছুই উঠে আসা। সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের নীতিতে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এভাবে চর্চা করতে হলে মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিকেও চর্চা করতে হয় এবং তাতে হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও একটা আলাদা জাতি হিসেবে মানতে হয়, কার্যত স্বীকার করতে হয়। কলকাতা নজরুলের মূল কর্মস্থল হলেও ঠিক এ কারণেই খোদ কলকাতা ইউনিভার্সিটিতেও নজরুল পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নন। এর মূল কারণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজ তাদের এক জাতিতত্ত্বের ধারণায় একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে হিন্দু বানাতে তৎপর। উপমহাদেশে মুসলমানদের আলাদা ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি মানতে কার্যত নারাজ।

www.pathagar.com

১৯৮০ সালের ২৪ মে রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অডিটরিয়াম বেকার হল-এ নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তীতে স্বাগত ভাষণে প্রবোধকুমার সান্যালের একটা বিবৃতির উল্লেখ করে সমবেত সুধীবৃন্দের কাছে আমি প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম ঃ

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলস্ কাউন্টার থেকে এক টাকা দিয়ে বাংলা এমএ ক্লাসের একটা সিলেবাস কিনে দেখলাম সেখানে নজরুল নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসে নজরুলের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি পড়ানো হয় না কেন?

ডি এম লাইব্রেরি এবং হরফ প্রকাশনী নজরুলের বই প্রকাশ করে ধনী হয়েছেন। নজরুল সাহিত্য যদি বটতলার সাহিত্য হয়ে থাকে তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সেটা ঘোষণা করা হোক।"

জনসমক্ষে আমার এই প্রশ্নের জবাবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস বলেছিলেন ঃ "রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, কিন্তু নজরুলের সাহিত্যই আমার মনকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।"

অনুষ্ঠানের সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার রুশ এবং পূর্ব ইউরোপের কবি ও সাহিত্যিকদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেনঃ "সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তারা পাননি, কিন্তু জনগণের মনে স্থায়ী আসন পেয়েছেন তাঁরা।"

নিজেদের সমাজকে উপেক্ষা করে এর চেয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা ডক্টর রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার কিংবা ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ডক্টর মজহারুল ইমলাম সাহেব ছিলেন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আমাকে বলেছিলেন, নজরুল সাহিত্য যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় সে চেষ্টা তিনি করবেন।

এর কিছুদিন পর তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তিনিও আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারছেন না; শান্তি নিকেতনে যাচ্ছেন।

এরপর মাঝে বার-দুই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলস্ কাউন্টার থেকে বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসের সিলেবাস কিনতে গিয়ে পাইনি।

বছর আষ্টেক আগে গিয়ে বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসের যে সিলেবাস পেলাম তাতেও দেখলাম নজরুল নেই। ওদিন কাউন্টারের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন কাউন্টারের একজন ভদ্রলোক, কী কারণে বা কোন্ যোগাযোগের কারণে বুঝলাম না, বললেন ঃ "আমরা এখানে আমাদের মতো করেছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি পারলে তাদের মতো করুক।"

ইতোপূর্বে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলো নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষে মাসখানেক যাবৎ একটা অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেছিল। সাপ্তাহিক 'দেশ'

www.pathagar.com

পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়েই সেটা জেনেছিলাম। মনে আছে সম্পাদকীয় নিবন্ধটির শিরোনামে 'রসুই সন্ধ্যা', এই দুটো শব্দ ছিল। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির ওপর দৈনিক পয়গামে "দেশ রসুরইয়ের 'রসুই সন্ধ্যা" শিরোনামে আমি একটা লেখাও লিখেছিলাম। সেটা কলকাতার দৈনিক পয়গামে ছাপা হয়েছিল। আমার লেখার কারণ, 'দেশ' পত্রিকার উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ব্যাপক নজরুল চর্চার ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, জীবনানন্দ দাশের মতো নজরুল একজন মাইনর কবি, এ রকম মাইনর কবি বাংলা সাহিত্যে অনেকেই আছেন।

বলা বাহুল্য যে, এই শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নজরুলের ব্যাপারে অনেক সংযত হয়েছেন।

ভারত বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজ প্রধান রাষ্ট্র। বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজ কোথাও কখনও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজকে অনুমোদন করে না। 'দেশ' পত্রিকার উক্ত সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের পক্ষেই। সমাজের এই বিধান ডানপন্থী, বামপন্থী নির্বিশেষে সবই মানেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও মেনেছেন। দৈনিক পয়গামে আমার লেখা পড়ে মনুসংহিতার সমাজের একজন বড় সরকারি কর্মকর্তা দৈনিক পয়গামের সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল তরফদারের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ঃ

"নজরুলের লেখাও পড়ানো হয় না?"

।। দুই ।।

নজরুল জন্মশতবর্ষ যে বছর উদযাপিত হ'লো সে বছর কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে 'দূরদর্শন'-এর কলকাতা কেন্দ্রে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর অনুপ ঘোষালের একটা সাক্ষাৎকার শুনলাম। অনুপ ডক্টোরাল থিসিস করেছেন নজরুল সঙ্গীতের ওপর।

তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন সমাজ সচেতন এক ব্রাহ্মণ কন্যা।

সঙ্গীত বিষয়ক তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুপ বারংবার নজরুল সঙ্গীতে ফিরে যেতে চাইছিলেন। আর উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যা প্রতিবারই তাঁকে শান্তি নিকেতন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনই সচেতন সমাজ তাদের এবং সমাজের শাসন!

এই সমাজেরই মানুষ নজরুল জীবন নিয়ে ধারাবাহিক নাটক লিখেছেন এবং মূলত সেই সমাজের মানুষরাই নাটকটিকে রূপদান করেছেন। রূপদান যারা করেছেন তাদের মধ্যে ওখানকার টিভি সিরিয়ালের স্বনামধন্য অনেকেই আছেন। তবে এ ক্ষেত্রে অন্তত দুটো বিষয় স্মরণ করার আছে।

এক. তারা যেসব ধারাবাহিক নাটক এবং টেলিফিল্মে অভিনয় করেন সেগুলো দেখলে মনে হয় না যে, কিছু খুনী এবং 'আব্দুল' চাকর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কোন মুসলমান বাস করেন।

দুই. ধারাবাহিক নাটক এবং টেলিফিল্মগুলোতে তারা যখন অভিনয় করেন তখনো তারা দেখেন কোন মুসলমান অভিনেতা-অভিনেত্রীও নেই।

তদুপরি সেখানকার পাঠ্যপুস্তকগুলো যেভাবে প্রণীত হয়েছে তাতে শিখে এসেছেন

www.pathagar.com

যে, শিক্ষাঙ্গনে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙ্গিনায় মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই।

মোট কথা, মুসলমানদেরকে তারা খাটো করে দেখতেই শিখেছেন। তাদের সমাজ মুসলমানকে, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে উপমহাদেশে অস্তিত্বহীন হিসেবেই দেখতে চান। ব্যাপারটা কার্যত এ রকমই যদি না হবে তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসে নজরুল সাহিত্য পাঠ্যসূচিতে অনুপস্থিত থাকে কি করে?

এই প্রতিবেশী সমাজের এক-আধজন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে নজরুল জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ওপর গঠনমূলক কাজকর্ম করেছেন বা করছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা নেহায়েতই ব্যক্তিগত পর্যায়ে। বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত প্রতিবেশী মনুসংহিতার সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতিতে নজরুল চর্চাকে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে এখনও সামাজিক পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত নেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় নজরুলকে বর্জন করে চলার কারণ ঠিক এটাই। এই সমাজের মানুষ 'কাজী নজরুল ইসলাম' শিরোনামে নাটক লিখলে সাধারণভাবে যেটা হতে পারে সেটাই হয়েছে। নজরুলের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভার উজ্জ্বল্য, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, ইংরেজি, বাংলা, আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, এই সাত সাতটি ভাষার ওপর তাঁর দখল, শরীর মনের একটা সংগঠন হিসাবে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ, সংবেদনশীলতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারবোধসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ নজরুল, তাঁর আপোষহীন স্বাধীন সত্তা এবং স্বাধীনতা চেতনা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য- মণ্ডিত রাজনীতি, তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং মঞ্চ নাটক, গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও-চলচ্চিত্র ইত্যাকার নানান আঙিনায় তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা, এই সব কিছু নিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ নজরুল, যে নজরুল গণমনে অবিস্মরণীয় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে আছেন সে নজরুল কলকাতার দূরদর্শনে 'কাজী নজরুল ইসলাম' নাটকটিতে আসেনি। উপযুক্ত মর্যাদায় আসেনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রস্তুতি পর্বের কথা এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনা অর্জনের কথা। এক অপরূপ মনোমুগ্ধকর জীবনদর্শনের নান্দনিকতায় ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক এলাকা নির্বিশেষে সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে গণমানুষের মনে কিংবদন্তীর নায়কের আসনে ঠাঁই পেয়েছেন যে নজরুল সে নজরুল উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই গণমনে অমর হয়ে আছেন। সে নজরুল কখন কোন্ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সামরিক পোশাক পরছেন, আরবী পোশাক পরছেন, পায়জামা পরছেন, ধুতি পরছেন সেটা তাঁর ভক্ত জনসাধারণ খেয়ালই করেন না, কখন আল্লাহ্ বলছেন আর কখন বলছেন ভগবান, সেটা পার্থক্য করে দেখেন না। কেননা, তিনি অজস্র জায়গায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং নবীর উম্মত; কিন্তু তিনি কবি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবারই। সাহিত্য ও শাস্ত্রকে এক করে দেখেননি তিনি।

www.pathagar.com

সাম্য ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের এই নজরুলের যথাযথ রূপায়ণ অবশ্য সত্যিই কঠিন। নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা, আন্তরিকতা, মনোযোগ ও সততা না থাকলে সেটা করা যাবে না।

কিন্তু সেই কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি অবলম্বনে তৈরি নাটকে যদি ধুতি আর ভগবানই কেবল বড় হয়ে ওঠে তাহলে গণমানুষ তা গ্রহণ করবে না, বলবে ওটা এক জাতিতত্ত্বের ধারণায় নিছক শুদ্ধি আন্দোলনেরই একটা অংশ, বলবে সাম্য ও সহাবস্থানের কবিকে অযথা হিন্দু বানানো হচ্ছে। অনন্য সাধারণ এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে, সৃজনশীল এক বিস্ময়কর প্রতিভা হিসাবে, ঋজু চরিত্রের এক ব্যক্তিত্ববান আকর্ষণীয় পুরষ হিসাবে, বৈঠকের মজলিশের সভার কর্ম পরিবেশের প্রতিভাদীপ্ত এক মধ্যমণি পুরুষ হিসাবে এবং পথিকৃৎ হিসাবে যদি তাঁকে যথাযথভাবে দেখানো হতো তাহলে এহেন অভিযোগ উঠতো না যে, মনুসংহিতার সমাজের লোকদের তৈরি নাটকে নজরুল কেবলই ভগবান ভগবান করেন, শুধুই ধুতি পরেন এবং চুরিও করেন।

নাটকটি বিটিভিতে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নজরুল বিশেষজ্ঞ বলে যারা পরিচিত তাদের সেটা দেখানো উচিত ছিল। বিটিভি নিজেও তো নজরুল জীবন নিয়ে একটা ধারাবাহিক নাটক তৈরির উদ্যোগ নিতে পারত এবং আন্তরিকতা থাকলে সেটাও এখনো তো পারে! সেটা করা হয় না কেন?

আমি নিজে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে যারা ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন তাদের পক্ষে ধৈর্য ধরে এই নাটক দেখাটা খুবই কষ্টকর। তাদের পক্ষে এই নাটক দেখাটা মনে হবে আনন্দদায়ক নয়, যন্ত্রণাদায়ক। নজরুল চুরি করেছেন এ তথ্যও নাকি তারা পেয়েছেন এবং সেটা পরিবেশন করাটা দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। অন্তত নাটকের প্রয়োজনে। ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলি, কল্পিত কোন কাহিনী এবং স্মৃতিকথার পার্থক্যের কথাটা যে স্মরণে রাখা হয়নি, সেটা বোঝা যায়। আমি যতটুকু দেখেছি তাতে লক্ষ্য করেছি, কোন গান কবি কখন লিখেছেন সেটা স্মরণে রাখার ব্যাপারটাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেব নজরুল বিষয়েও একজন পড়াশুনা করা মানুষ। নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসার ওপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। বিটিভিতে এই ধারাবাহিক নাটকটির একটি পর্ব দেখে আর একটি পর্ব দেখার মতো মানসিক শক্তি তিনি অর্জন করতে পারেননি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

তিনি বলেছেন, "নাটকটিতে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে খাটো করে দেখানো হয়েছে।"

জাতীয় কবিকে আমরাও অবশ্য কম খাটো করে দেখি না। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পশ্চিমবঙ্গে ছুটির দিন। যে দেশে কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি সে দেশের কোন সরকার আজও জাতীয় কবির জন্মদিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে পারলেন না। এবার জাতীয় কবির সরকারি পর্যায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঢাকার বাইরে নিয়ে গিয়ে নমঃ নমঃ করে কীভাবে সারা হ'লো সেটা নজরুল গবেষক এবং নজরুল সঙ্গীত

www.pathagar.com

শিল্পী বলে যারা পরিচিত তাদেরও অনেকেই জানতে পারলেন না। নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটা সিডিও বের করা হয়েছে বলে শোনা গেল না।

এদেশেও ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসে যে কোনো ছেলে-মেয়ে নজরুলের ওপর পড়াশুনা না করে এমএ পাস করতে পেরেছেন। ১৯৭২-এর পরও আড়াই দশকের মতো সময় সেভাবেই কেটেছে। এখনও উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে নামকা ওয়াস্তেই পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল সাহিত্যকে মর্যাদা আমরা দিইনি।

নজরুল সাহিত্যকে মর্যাদা দেয়ার মতো প্রস্তুতিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের ক'জনের আছে, জানি না।

নজরুল নাটক, গীতিনাট্য, নাটিকা, এসব লিখেছেন শতাধিক। নাটকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর পথিকৃতের ভূমিকাও আছে। তাঁর সুস্থাবস্থায় কলকাতার মঞ্চে তাঁর একাধিক নাটক মঞ্চস্থও হয়েছে। তাঁর আগে বাঙলাভাষী কোনো মুসলমানের লেখা নাটক কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু তাঁর সেসব নাটক, গীতিনাট্য, নাটিকাগুলোর ব্যাপারে আমাদের গণমাধ্যমগুলো নীরব, নিশ্চুপ!

চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে সময় ম্যাডান থিয়েটার্সের সুর ভাণ্ডারীর দায়িত্ব পালন করেছেন নজরুল। আর চলচ্চিত্র যখন সবাক যুগে এল তখন পাইওনিয়ার্স ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টরের দায়িত্বভার পেয়েছিলেন নজরুল। এ রকম দায়িত্বভার পালন করার ব্যাপারে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম। কিন্তু নজরুল পরিচালিত কিংবা নজরুল সংশ্লিষ্ট কোনো একটি চলচ্চিত্র আমরা আজও উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিনি।

এরকম অনেক কিছুই আমরা পারিনি। আমাদের ফিল্ম আর্কাইভসে চলচ্চিত্রকার নজরুলের একটা ছবি টাঙিয়েও রাখিনি আমরা।

নানান দৈনিক ও সাময়িকপত্রে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন নজরুল। পত্রিকা সম্পাদনাকালে রাজদ্রোহের অভিযোগে জেলেও পাঠানো হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আমাদের প্রেস ক্লাবে তাঁর একটা ছবিও রাখা হয়নি।

এই ক'দিন আগে নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান সাহেবের অনুরোধে বিটিভির "সিন্ধু-হিন্দোল" অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং-এর সময় দেখি কলাকুশলীরা কেবলই তাড়াহুড়া করছেন। বলছেন, "গাড়ি ছেড়ে দেবে।"

শিল্পকলা একাডেমীর অন্যতম পরিচালক এবং আবৃত্তি শিল্পী শফি কামাল সাহেব এসব দেখে চলে আসতে চাইছিলেন। একটা টেবিল সামনে দিয়ে উপস্থাপকের সামনে আলোচকের বসারও কোন বন্দোবস্ত নেই। অব্যবস্থার এহেন পরিবেশে নজরুলকে খাটো করে দেখিয়ে প্রতিবেশী মনুসংহিতার সমাজের তৈরি ধারাবাহিক নাটক 'কাজী নজরুল ইসলাম' বিটিভিতে চলতে পেরেছে।

আবার ওই "সিন্ধু-হিন্দোল" গ্রন্থটি সম্পর্কেও আমাদের আন্তরিকতার অভাবের পরিচয়টা কিছু কম নয়। বাংলা একাডেমী দু'পঙ্‌ক্তির "সিন্ধু-হিন্দোল" কবিতাটি ছেপেছে কবিতার শিরোনামটি বাদ দিয়ে। আর নজরুল ইন্সটিটিউট "সিন্ধু-

www.pathagar.com

হিন্দোল" গ্রন্থটি ছেপেছে গ্রন্থটির নাম কবিতার কেবল শিরোনাম নয়, পঙ্‌ক্তি দুটিকেও বাদ দিয়ে।

আমাদের কর্তাব্যক্তিদের আন্তরিকতার অভাবের ব্যাপারটা খতিয়ে না দেখে সমস্যাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না। নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেব ছাড়া নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে আমরা এমন আর কাউকেই রাখিনি যিনি নজরুল বিষয়ক ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন বলে নজরুলভক্ত জনসাধারণ জানেন।

সব ক্ষেত্রেই এই তো পরিবেশ-পরিস্থিতি!

কবির সমাধির ওপর যে স্মৃতিসৌধটা গড়ার কথা ছিল সেটা আজও হলো না। কবির সমাধিক্ষেত্র আজও পর্যটন মানচিত্রে ঠাঁই পেল না। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে এটা আজও একটা দর্শনীয় স্থান হিসেবে তুলে ধরা হলো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এমএ ক্লাসের পাঠ্য তালিকায় নজরুলের ওপর অন্তত এক শ' নম্বরের একটা পেপার থাকার দরকার ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এখনকার যে অবস্থা তাতে যে কোনো ছেলে-মেয়ে নজরুল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা না করেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করতে পারেন। এই উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা উদাসীন্য নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে নানান দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে চলছে। কেননা, এভাবে পাস করে অনেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এবং প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছেন।

প্রতিটি নজরুল গ্রন্থের এবং গ্রন্থ বহির্ভূত প্রতিটি নজরুল রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হলো আর একটি জরুরি ও অপরিহার্য কাজ। নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর বিকৃতি রোধকল্পে নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুল সঙ্গীত ক্যাসেটে ধারণ করে তা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষার্থী শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও ভক্তদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির বন্দোবস্ত করাটা একটা জরুরি ও অপরিহার্য কাজ।

নজরুল রচনাবলীর শুদ্ধ পাঠ কী হবে সেটা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করা দরকার।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুল সঙ্গীত রেডিও-টেলিভিশন মারফৎ নিয়মিত প্রচার করা দরকার।

উপযুক্ত পরিচিতিসহ নজরুলের প্রতিটি ছবি সময়ানুক্রমিক সাজিয়ে অ্যালবাম আকারে প্রকাশ করা দরকার।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে এরকম অনেক কাজই আছে করার। সে কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের। নজরুল বিষয়ে এই মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের একটা সমন্বয় ঘটানোর বন্দোবস্তও করা দরকার। আমাদের সে উদ্যোগ এবং আন্তরিকতা থাকলে নজরুলের ওপর একটা ধারাবাহিক নাটক এখানেই তৈরি হতে পারে।

www.pathagar.com

নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের সমস্ত সম্ভাবনাই ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে

।। এক ।।

অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার আকর্ষণ ও মমত্ববোধ অনেক বেশি। আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের জন্য নজরুল চর্চাকে আমি অত্যন্ত অপরিহার্য প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করি। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রায় দু'আড়াই বছর হলো আমি নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সভায় যোগ দিতে পারিনি।

নজরুল একাডেমীর মাননীয় সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান সাহেব নির্বাহী পরিষদের সভায় যোগ দেয়ার জন্য ঠিকই চিঠি দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। অথচ আমি নির্বাহী পরিষদের সদস্য। আমার খুব খারাপ লাগে। খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমার করারও কিছু নেই। আমি এই ব্যাপারটিতে নিতান্তই অসহায়।

নির্বাহী পরিষদের মাননীয় সদস্যরা আমাকে অনুগ্রহ করে নজরুল একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। এই দায়িত্বভার পাওয়ার পর নজরুল একাডেমী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা এবং কয়েকটি গ্রন্থ আমার সম্পাদনায় প্রকাশিতও হয়েছে।

পত্রিকার সর্বশেষ যে সংখ্যা এবং সর্বশেষ যে গ্রন্থ যে প্রেসটি থেকে ছাপা হয়েছে সেই প্রেসের পাওনার প্রায় অর্ধেক টাকা নজরুল একাডেমীর মাননীয় সাধারণ সম্পাদক সাহেব নজরুল একাডেমীর আর্থিক অনটনের কারণেই পরিশোধ করতে পারেননি।

অর্থাভাবে প্রকাশনা বন্ধ।

অর্থাভাবে প্রেসের পাওনা টাকার সবটা পরিশোধ করা যায়নি।

প্রেসের মালিক তার পাওনা টাকা আমার কাছেও চান।

পয়সা-কড়ির আমার অনেক প্রয়োজন থাকলেও একজন নজরুলভক্ত এবং নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের কাজ আমি কোনো সম্মানী না নিয়েই করেছি। মাননীয় সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান সাহেব সম্মানী দেয়ার প্রস্তাব একাধিকবার করলেও আমি সম্মত হইনি। আমি কেবল লেখা এবং লেখার বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছি। জীবন ধারণের জন্য পেশা হিসেবে আমি অন্য কিছু একটা করি। একটা দৈনিকে সাংবাদিকতার কাজ করি। প্রেসের পাওনা টাকা পরিশোধ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য ব্যক্তিগত পর্যায়েও যদি আমার থাকতো আমি ও টাকা পরিশোধ করে দিতাম।

ওদিকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে নজরুল একাডেমী পারছে না তার আর্থিক অনটনের কারণেই।

একযুগ আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের আমলে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক এ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি বছরে সরকারি অনুদান পেতো লাখখানেক টাকা।

এতদিনে সেটা বেড়ে অন্তত বিশ গুণ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বাড়েনি। বরং কমে পাঁচ ভাগের এক ভাগে এসেছে।

www.pathagar.com

আমি কোনো বিশেষ সরকারি আমলের কথা বলছি না। আগের সরকারের আমলেও এ রকমটাই ছিল। আগের সরকার ওরকম সিদ্ধান্তটা উত্তরাধিকারসূত্রে তার আগের সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে। আর সরকারি কাজ একজন কেরানি করলেও তো সেই সরকারের ওপর বর্তে যায়, যদি উর্ধ্বতন কেউ সেটা খতিয়ে না দেখেন!

।। দুই ।।

নজরুল একাডেমী পত্রিকার নজরুল জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যায় নজরুল একাডেমীর অফিস সেক্রেটারী রফিকুল আলম খন্দকার সাহেবের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কবির পুত্রবধূ উমা কাজী বলেছেন যে, কবি এবং কবি পরিবারকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এবং কাদের সিদ্দিকী সাহেব। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তারা চিঠিও পেয়েছিলেন। এর পর কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের পরিবারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তারা কবিকে নিয়ে বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামের একটা চিঠি থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর কবি পরিবার মূলত অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে পাকিস্তানে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে সে সময় তাদেরকে আনা হয়নি। তাদেরকে আনা সম্ভব হ'লো কেবল বাংলাদেশ আমলে! এটা মনে রাখার মতো ঘটনা!

কবিকে ঢাকায় আনার পর ঢাকার ধানমন্ডির কবি ভবনে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব যখন কবিকে দেখতে যান তখন রোগ শয্যায় শায়িত কবির মাথায় হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি যখন কবিকে দেখছিলেন সে সময় তোলা একটা ছবি ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকায় এবং পরে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত নজরুল অ্যালবামেও আছে। ছবিটিতে কবির প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের একটা আন্তরিকতা এবং মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই আন্তরিকতার ছবিটা দেখতেও ভালো লাগে!

তাঁর আমলেই বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মাহমুদুল্লাহ্ সাহেব সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পত্রটি কবিকে উপহার দিয়েছিলেন।

।। তিন ।।

কবির ইন্তেকালের পর কবির রূহের মাগফিরাত কামনা করে জিয়াউর রহমান সাহেব মোনাজাত করছেন, এই ছবিটাও ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকায় এবং পরে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত নজরুল অ্যালবামে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের মরদেহ পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না দিয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হ'লো এর পেছনে তাঁর একটা উদ্যোগ, একটা ভূমিকা ছিল। ইতোপূর্বে তাঁর আমলেই বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেন। একুশে পদকে ভূষিত করেন এবং স্বর্ণ পদক দেন, 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার দেন। তাঁর আমলেই ধানমন্ডির কবি ভবনে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ার কথা হয়েছিল। নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালিদ হোসেন সাহেবের কাছে শুনেছি, বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানে দেখা হ'লে নজরুল সঙ্গীত বিষয়ে প্রকল্প পেশ

www.pathagar.com

করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি এবং এ জন্য বারংবার তাগিদও দিয়ে গেছেন তিনি। অত্যন্ত উদার মনে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নজরুল চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে চেয়েছিলেন তিনি। পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তিনি নিজে গিয়ে কবিকে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতীক' উপহার দিয়েছিলেন।

।। চার ।।

এরপর নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের আমলে। নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক নতুন ভবনটিও প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর আমলেই। আসাদুল হক সাহেবের কাছে শুনেছি, এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে কুন্নি দিয়ে সিমেন্ট-বালি ঢালতে উদ্যোগ নিয়ে হঠাৎ থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খিলখিল কোথায়?'

সবুজ লনের পাশে গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকা খিলখিল কাজীকে খুঁজে আনলে তিনি তার সাথে একসঙ্গে কুন্নি ধরে সিমেন্ট-বালি ঢেলেছিলেন ইটের পাশে।

এভাবেই কবির পুত্রবধূ উমা কাজী এবং তাঁর সন্তান খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী এবং বাবুল কাজীর ইজ্জত, মান সম্মান এবং সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারগুলো তিনি দেখেছেন। তাদের থাকার জন্য বনানীতে একটা বাসা এবং প্রয়োজন মোতাবেক ভাতার বন্দোবস্তও করেছেন। চিকিৎসা এবং পানি-বিদ্যুতের বকেয়া বিল নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে সবও দেখেছেন। মিষ্টি কাজী তার স্বামীকে নিয়ে যাতে এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সে জন্য তার স্বামীকে সুতোর পারমিট করে দিয়েছেন।

অনেক সময় নজরুল ইন্সটিটিউট দেখতে গিয়েছেন আকস্মিকভাবে না জানিয়েই। অনেকবারই গেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট দেখতে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল চেয়ার তাঁর আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনেছি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের ব্যাপারে বসতে চেয়েছিলেন এবং বসেও ছিলেন। পরিচয় হওয়ার পর তিনি যখন জানলেন, নজরুলের ওপর ডক্টোরাল থীসিস ওই নজরুল অধ্যাপকদের মধ্যে কেবল রফিকুল ইসলাম সাহেবই করেছেন, তখন নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে চল্লিশ মিনিট তিনি আলাপ করেছিলেন তাঁর সঙ্গেই। ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছেই শুনেছি সে কথা।

এনামুল হক সাহেবের কাছে শুনেছি, নজরুল জয়ন্তী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হয় দেখে এরশাদ সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে জাতীয় পর্যায়ে কেবল নজরুল জন্মবার্ষিকীই পালন করতে চেয়েছিলেন। এই সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীটাও যোগ করতে এনামুল হক সাহেবরাই আলোচনা সভায় পরামর্শ দিয়েছিলেন। অগত্যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তও হয়।

ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনেছি, এরশাদ সাহেব নজরুল ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন ধানমন্ডির কবি ভবনের লনে নয়, শেরে বাংলা নগরে অনেক বড় জায়গায়। সেটা নাকি আমাদেরই কারও অনুদার চিন্তা-ভাবনার

www.pathagar.com

কারণে হয়নি। কেবল এরশাদ সাহেব নন, ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ সাহেবানও নিয়মিত কবি পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদের বিপদে আপদে উদ্যোগী হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। এ সব কথা বিশেষত উমা কাজীর কাছে শুনেছি।

।। পাঁচ ।।

অনেক বাস্তব কারণেই দেশের সিংহভাগ মানুষ বরাবরই নজরুলভক্ত। যাঁরা নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ করবেন বা গঠনমূলক কাজ-কর্ম করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষরাও তাদের কথা সেইভাবে স্মরণ করবেন। আবার এটাও লক্ষ্য করেছি, সরকার প্রধান যথেষ্ট সচেতন এবং উদ্যোগী না হলে তাঁর আশপাশের লোকজন কিংবা যাদের ওপর তিনি নির্ভর করেন তাদের কেউ কেউ ভ্রান্ত পথে নিয়ে যেতে পারেন। একটা মহৎ প্রয়াসও অন্দরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মের ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাবে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের অন্দরে যে কতখানি অবরোধ সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ নজরুল ইন্সটিটিউটের গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখ বৃহস্পতিবারের একটা অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রের খামে পেলাম।

খামে কোনো মানুষের কেবল মাত্র একটি ছবি ছাপাতে হলে নিশ্চয়ই তাঁর সুস্থাবস্থার ছবিই ছাপা উচিত। যে সময়টায় তাঁর কর্মজীবন ছিল সে সময়কার ছবিই দেয়া আবশ্যক। যে ছবিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিটি টের পাওয়া যায়, দেখতেও অন্যান্য ছবির তুলনায় ভালো লাগে সে রকম ছবিই দেয়া উচিত। তাঁর ভালো আলোকচিত্র থাকলে সেটাই দেয়া উচিত। ব্যক্তিত্ববান, সুন্দর, আকর্ষণীয় নজরুল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, শরাবের পিয়ালার মতো মনোমুগ্ধকর ডাগর দুটো চোখ, মাথায় সেই ঝাঁকড়া চুল, যে ঝাঁকড়া চুলের কথা কবি শামসুর রাহমানও তার কবিতায় লিখেছেন, মূলত এ রকম একটা ছবিই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। ছোটবেলায় পাঠ্য বইতে দেখেছি, এই ছবিটাই থাকতো। সঙ্গত কারণেই কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীদের বাসায়ও ওই ছবিটাই খুব বড় করে বাঁধানো আছে দেখেছি। নজরুল-সুহৃদ মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে এই ছবিটা ব্যবহার করেছেন। নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেব যখন নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সে সময় এই ছবিটিই বড় করে ছাপিয়ে বাংলা একাডেমীর বইমেলাতেও বিক্রির বান্দোবস্ত করেছিলেন। নজরুল একাডেমী পত্রিকার গত কয়েকটি সংখ্যায় এবং গ্রন্থে এই ছবিটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটি সবার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে। ছবিটিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশালত্বটাও আসে।

নজরুল জীবনীকার আজহারউদ্দীন খানও লিখেছেন, ছোটো বেলায় নজরুলের কবিতা পড়ে তিনি তাঁর প্রতি যেমন আকর্ষণ বোধ করেছিলেন, তেমনি ঝাঁকড়া চুলের আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ববান নজরুলও তাঁর কাছে কম আকর্ষণের বিষয় ছিল না। নজরুলের কেবল একটি মাত্র ছবি ছাপতে হলে নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় এই ছবিটাই ছাপা উচিত। যখন কর্মক্ষম ছিলেন এমন পরিণত বয়সের এই ছবিটাই তাঁর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করে। ব্যক্তিত্বের সাথে, তাঁর বিদ্রোহী সত্তার সাথে এই

www.pathagar.com

ছবিটাই যথাযথ খাপ খায় বলে অগ্নিবীণার পরবর্তী সংস্করণে ডিএম লাইব্রেরি এই ছবিটাই ছেপেছে।

কিন্তু কোনো বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর আঁকা নজরুলের অসুস্থ অবস্থার স্কেচ বলে নজরুল ইন্সটিটিউটের খামে যা ছাপা হচ্ছে সেটাকে নজরুলভক্ত জনসাধারণের পক্ষে নজরুলের ছবি বলে চেনা বা মানা সম্ভব নয়। অনেকেই দেখে বলেছেন, ওটা নজরুলের না, বিদ্যাসাগরের ছবি। নজরুলভক্ত জনসাধারণকে চিত্রকর্মের এত সমঝদার ভাবতে বদ্ধপরিকর কেন নজরুল ইন্সটিটিউট? মাস আষ্টেক আগে পাওয়া নজরুল ইন্সটিটিউটের আর একটা খামে আর একটা স্কেচ দেখেছিলাম।

গত নজরুল মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার একটি দৈনিকের ক্রোড়পত্রে দেখেছি বেছে বেছে নজরুলের অসুস্থ অবস্থার এমনসব ছবি তারা ব্যবহার করেছেন, যেগুলো দেখলে নজরুল সম্পর্কে মানুষের মনে আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। নজরুল ইন্সটিটিউটে গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন এক-আধজন লোক নিশ্চয়ই আছেন, যারা ওই একই লক্ষ্যে কাজ করছেন। নজরুল চর্চার স্বার্থে তাদেরকে সরকারের অন্য দফতরে বদলি করে দেওয়া উচিত।

জানতে চাইছি, বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রজীবনীতে রবীন্দ্রনাথের যে ছবি ছাপা হয়েছে সেটা কি স্কেচ না অসুস্থ অবস্থার ছবি? আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনীতে বিভিন্ন খণ্ডের প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের যেসব ছবি ছাপা হয়েছে সেগুলো কি স্কেচ? নজরুল ইন্সটিটিউটের তাহলে স্কেচ প্রীতিতে পেয়ে বসল কেন? নজরুল অ্যালবামে নজরুলের অনেক ছবির মধ্যে স্কেচ রাখা যেতে পারে। কিন্তু একটা ছবি ছাপলে দেখতে হবে সে ছবি যেন নজরুলের প্রতিনিধিত্ব করে।

নজরুল ইন্সটিটিউটের ওই অনুষ্ঠানের কার্ডে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন বলে যাদের নাম ছাপা হয়েছে তাতে দেখা গেলো নজরুলের সাহিত্য-সঙ্গীত বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে চলতে নজরুল ইন্সটিটিউট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নমঃ নমঃ করে সারা নজরুলের গত জন্মবার্ষিকীর সময় থেকে এই চিত্রটা স্পষ্ট হয়েছে। নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের এই হাল হলো কেন, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।

নজরুলভক্ত কিনা, নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন কিনা, নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মে উৎসাহ আছে কিনা, নজরুল বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা আছে কিনা–, এসব বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী পদেও কাউকে নেওয়ার সময় বিবেচনা করা হয়নি। নজরুলের ওপর কোনো বিষয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম করতে পারবেন বা করাতে পারবেন এমন কাউকে নজরুল ইন্সটিটিউটের স্থায়ী পদে এ যাবৎ নেওয়া হয়নি। তাহলে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মগুলো হবে কীভাবে?

নজরুল ইন্সটিটিউট নজরুল জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটাও নমঃ নমঃ করে সারলো। নজরুল বিষয়ক যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদেরকে উপেক্ষার শিকারে

www.pathagar.com

পরিণত করে রাখলো নজরুল মৃত্যুবার্ষিকীতেও। নজরুল ইন্সটিটিউটের অনুষ্ঠানাদির কার্ড এবং ট্রাস্টি বোর্ডের দিকে তাকালে নজরুল চর্চার হালটা বোঝা যায়।

নজরুল বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বভার দিয়ে কাজ করানো দরকার।

নজরুল ইন্সটিটিউটের অর্গানোগ্রাম, প্রশাসনিক কাঠামো এবং তাদের কাজকর্ম দেখে আমাদের এটাই মনে হয়েছে যে, ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মের সব কিছুই যেন বোঝেন নির্বাহী পরিচালকের পদে অস্থায়ীভাবে যিনি থাকবেন কেবল তিনিই।

সবকিছু দেখে মনে হয়, অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজকর্ম বোঝেন, নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানাদিক নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম বোঝেন, নজরুল জীবনী, নজরুল সাহিত্য, নজরুল সঙ্গীত, নজরুল সংশ্লিষ্ট নাটক, নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র ইত্যাকার বিষয়ে কাজকর্ম করতে এবং করাতে পারেন, এমন উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠাঁই নজরুল ইন্সটিটিউটে যাতে না থাকে সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করেছেন এবং করছেন, এমন ব্যক্তিদের কাজকর্ম করার সংস্থান নজরুল ইন্সটিটিউটে থাকা দরকার।

এমনটা কেন হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার যে, নজরুলভক্ত গণমানুষের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা থাকছে এক রকম আর নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম হচ্ছে আর এক রকম।

কিন্তু নজরুল রচনাবলীর প্রকাশনা থেকে শুরু করে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মের সবচেয়ে বড় অংশটাই নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠান এই নজরুল ইন্সটিটিউটের মাধ্যমেই করাতে হবে। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির অনেক কিছুই পুনর্গঠনের, ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন আছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে একজন মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা দরকার এবং তার অধীনে সাহিত্য বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ, নাটক ও চলচ্চিত্র বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, (নজরুল জীবনী বিষয়ক কাজকর্ম, পাঠাগার ও আর্কাইভসহ) অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ,— এই বিভাগগুলো মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে আলাদা আলাদা পরিচালকের অধীনে আনা দরকার।

।। ছয় ।।

প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমএ ক্লাস পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেবল আমাদের অস্তিত্ব, আত্মসচেতনতাবোধ এবং আত্মগৌরববোধের স্বার্থে নয়, মনুষ্যত্ববোধ, স্বাধীনতা চেতনা এবং সাম্য ও সহাবস্থান চেতনারও স্বার্থে।

পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটা যেমন ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি নজরুলের জন্মদিনটা ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি মহকুমায় যেমন রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, তেমনি এদেশে

www.pathagar.com

অন্তত প্রতিটি জেলায় নজরুল ভবন নির্মাণ করা আবশ্যক। এ ধরনের বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন ভাবলে এদেশের গণমানুষকে ভবিষ্যতে আরো কঠিন মাশুল দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের মাজারে 'নজরুল স্মৃতি সৌধ'টি হওয়া দরকার। বছর তিনেক আগে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স-এর নামে যে জটিলতাটা সৃষ্টি করা হয়েছে সেটার অপসারণ দরকার।

কবির সমাধি ক্ষেত্র এবং এদেশের নজরুল স্মৃতিধন্য জায়গাগুলো পর্যটন মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

নজরুল সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলো উদ্ধার করা দরকার।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি বের করে সেগুলো নজরুলভক্ত জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা দরকার।

নজরুল সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের গান রেডিও-টেলিভিশন মারফত নিয়মিত অন্তত এক ঘণ্টা করে প্রচার করা দরকার।

যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সম্ভাবনা আছে এমন নতুন শিল্পীদের দিয়ে নজরুল সঙ্গীত গাওয়ানো দরকার নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের সময়কার পরিপূর্ণ জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য।

শুক্রবার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে নজরুল সঙ্গীতের বিশেষ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা দরকার।

নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাকার ক্ষেত্রেও নজরুল সঙ্গীত যাতে অগ্রাধিকার পায় এসব বিষয়েও উৎসাহ দেওয়া দরকার।

নজরুলের নাটকগুলো, চলচ্চিত্রগুলো দেখানো দরকার। দেশ-বিদেশে নজরুলের ওপর তৈরি ডকুমেন্টারিগুলোও।

রেডিও-টেলিভিশনে নিয়মিত নজরুল বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানেরও বন্দোবস্ত করা দরকার। যেগুলো এক যুগ আগেও হতো সেগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেলো কেন?

সরকারি পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সময় থেকে নজরুল জন্মবার্ষিকী আলোচনা সাব-কমিটির সভায় নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম যারা করেছেন তাদের এক একজনকে এক একটা বিষয়ের ওপর নিবন্ধ লেখার দায়িত্ব দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন দিনে আলোচনা সভায় বিভিন্ন অধিবেশনে নজরুল বিশেষজ্ঞরা নজরুল গবেষকরা আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতেন। এখন সে-সব বন্ধ। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্র বিষয়ক কাজ-কর্ম আমাদের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্ম কার্যত আমাদের ওপর নির্ভর করে। এটা এক দুর্ভাগ্যজনক কঠিন বাস্তবতা।

ইংরেজিতেও নজরুলের সবগুলো গ্রন্থের অনুবাদ আজো হলো না। বিভিন্ন ভাষায় নজরুলের গ্রন্থগুলোর, সব ধরনের লেখাগুলোর অনুবাদ বের হওয়া দরকার।

নজরুল সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি থেকে নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্ত কিছু অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা দরকার।

নজরুলের বিভিন্ন সময়ের ছবি, নজরুল বিভিন্ন সময় যেসব জায়গায় থেকেছেন

www.pathagar.com

সেসব জায়গার ছবি, ইত্যাকার সব কিছু সময়ানুক্রমিক সাজিয়ে প্রকাশ করা দরকার।

ছবিগুলোর সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণও আলাদা আলাদা করে থাকা দরকার।

ফিল্ম আর্কাইভস, প্রেস ক্লাব ইত্যাকার জায়গায় নজরুলের ছবি থাকা দরকার।

নজরুল রচনাবলী পাঠ মিলিয়ে যেভাবে বের করা উচিত সেভাবেই বাংলা একাডেমী বা অন্য কোনোখান থেকে নয়, নজরুল ইন্সটিটিউট থেকেই বের করা দরকার।

কেবল দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নজরুল সাহিত্য, সঙ্গীত যাতে উপযুক্ত মর্যাদায় ঠাঁই পায় সে বিষয়ে নানাভাবে প্রয়াস চালানো দরকার।

প্রতিবেশী দেশে নজরুলের স্মৃতিধন্য অনেক কিছু আছে। সেগুলো যাতে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয় সে বিষয়ে সরকারের তৎপর হওয়া আবশ্যক।

জেলা স্তরে এবং জাতীয় পর্যায়ে বছরে অন্তত দু'বার নজরুল সঙ্গীত সম্মেলনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

নজরুল ইন্সটিটিউটের উচিত নজরুলের একেকটা দিক নিয়ে মাসে অন্তত একটি করে নজরুল বক্তৃতার আয়োজন করা। বক্তৃতা অবশ্যই লিখিত আকারে হওয়া দরকার, যাতে পরে এসব বক্তৃতার সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়।

একাধিক নজরুল জীবনীকারের লেখা একাধিক নজরুল জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। ক্রমে এই পদ্ধতিতেই কেবল পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রণীত হতে পারে।

যারা ইতোমধ্যেই নজরুল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করেছেন তাদের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রিভ্যুয়ারের কাছে না পাঠিয়ে দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর দিয়ে সরাসরি প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করতে হবে। তা না হলে নজরুল বিষয়ক প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অনেক কিছুই প্রকাশ করার সুযোগ থাকবে না। মনে রাখতে হবে, অসূয়াপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে কাজ করে, আর সেটা খুব ভাল কিছু, নতুন কিছু বার হওয়ার পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা "রবীন্দ্র জীবনী"র পাণ্ডুলিপি কিংবা প্রশান্তকুমার পালের লেখা "রবি জীবনী"র পাণ্ডুলিপি কোনো রিভ্যুয়ারের কাছে পাঠানো হলে তা তো কোনদিনই প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো না, এটা স্মরণ রাখলে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব।

নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদেরকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বা গ্রন্থ প্রকাশের খরচ দিয়ে সরকার প্রকাশিত সেসব গ্রন্থ কিনে নিয়ে ভাল গ্রন্থাদির প্রকাশনার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন।

নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মগুলোকে অনুদারতা কবলিত হতে দিতে না চাইলে কিছু সহজ ব্যবস্থার, বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থানও রাখতে হবে।

নজরুল ইন্সটিটিউট অনুপযুক্ত কাউকে নজরুল জীবনী লেখার জন্য টাকা দিয়েছে, আবার সেই কাজ যাতে অনুপযুক্ত ঘোষিত হয় সেরকম রিভ্যুয়ারের কাছে পাঠিয়ে

www.pathagar.com

কাজ এবং জনগণের টাকা দুটোই নষ্ট করেছে, এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এরকম ঘটনা ঘটে মূল কাজটার প্রতি আন্তরিকতার অভাব থাকলে।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মগুলো কী কী হয়নি, কী কী হওয়া দরকার, এসব বিষয়ে নজরুল গবেষক, নজরুল বিশেষজ্ঞরা কেউ লেখেন না।

আমি নজরুলভক্ত।

নজরুলভক্ত গণমানুষেরই একজন। তাই বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে বারংবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, যারা উদ্যোগ নিলে, পৃষ্ঠপোষকতা করলে গঠনমূলক কাজকর্মগুলো করা সহজ হয়, সম্ভব হয়। এসবের অনেক কিছুই এক বছরের মধ্যে করে ফেলার মতো কাজ হয়তো নয়, কিন্তু এক বছরের মধ্যে দৃষ্টি দেয়ার মতো কাজ নিশ্চয়ই।

এরশাদ সাহেবের আমলে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মগুলোকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়নি। পরবর্তী সরকারের আমলে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মের পরিবেশ মোটামুটি আগের মতোই বহাল ছিল। কিছু লোক নজরুল বিষয়ক কাজকর্মগুলোকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে সুবিধা পেতে চাইলেন বিশেষত নজরুল জন্মশতবর্ষের সময় থেকে। গত এক বছরের অনুষ্ঠানাদির চিত্রটা দেখলে মনে হয়, সেই ট্রেডিশনটাই হয়তো অনুসরণ করা হচ্ছে কোনো কোনো কর্মকর্তার অনুদার স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে। এতে নজরুল চর্চাই কেবল ব্যাহত হচ্ছে।

যে জাতীয় কবির বিষয়ে কাজকর্মের ব্যাপারে গণমানুষের তরফে এত আবেদন-নিবেদন আমাদের, সেই তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছি আজকে নয়; এখন থেকে প্রায় পৌনে এক শতাব্দী আগে। এসব স্মরণ রাখলে আমরা নজরুল বিষয়ক কাজকর্মগুলোকে ভাবতে পারব।

।। সাত ।।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯-এর ২৪ মে হলে ১৯২৮-এর ৩০ নভেম্বর তাঁর বয়স কত? ঊনত্রিশ বছর?

মানে তরুণ?

এই বয়সে আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর শিক্ষা-দীক্ষ, কথাবার্তা কোন্ স্তরের হয়ে থাকে?

তা সে যা-ই হোক, এই বয়সেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা এবং নানান আঙ্গিনায় অবিস্মরণীয় অবদানের গুণে গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও আন্তরিকতার কাছে যথার্থ জাতীয় কবি হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন।

কিন্তু বিশেষ কোন্ গুণে তিনি জাতীয় কবি? চিন্তাধারার, জীবন ও সৃষ্টির কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি জাতীয় কবি?

১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসাবে সংবর্ধনা দেয়া হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্ব কুমার চন্দ, করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ

www.pathagar.com

এস ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে।

এরও এক বছর আগের কথা।

কার্তিক ১৩৩৫-এর মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত নাজির আহমদ চৌধুরীর 'এছলাম ও নজরুল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুদার, অগভীর ও অদূরদর্শী বক্তব্যের প্রতিবাদে ৩০ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখে ময়মনসিংহ থেকে মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম্ হোসেন খান ৩০ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখে 'সওগাত'-এ তাঁর চিঠিতে লেখেন ঃ

"উক্ত প্রবন্ধের লেখক বাঙ্লার তিন কোটি মুসলমানের দোহাই দিয়া জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের উপর দাবি করিবার অধিকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। লেখক দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে কবিকে যেরূপ জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক।... নজরুল ইসলাম বাঙ্লার জাতীয় কবি এবং এই বাঙ্গালী জাতি হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই গঠিত। তাই তাঁহার 'রচনায় ইসলামী ও হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় ভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে। নতুবা রচনা সুন্দর হইবে না' এবং জাতীয় কবির লেখার ভিতর উভয়রূপ ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক। ইহাতে 'হতাশ হইয়া পড়িবার' কিছুই নাই।"

ইতোপূর্বে ১৯২৩-এ প্রণীত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বা বেঙ্গল প্যাক্ট ১৯২৫-এ তাঁর অকাল মৃত্যুর পর ১৯২৬-এ কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন বানচাল হয়ে গেছে, ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং আর্য্য সমাজের নেতা, মনুসংহিতার সমাজের অন্যতম সমাজপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পরিকল্পনা মোতাবেক অসহযোগ-খেলাফৎ আন্দোলনের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির শেষ জেরটুকুও মুছে দিতে কলকাতায় রাজ-রাজেশ্বরী মিছিল বের করে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া হলো, ঐ ১৯২৮-এ হিন্দু-মুসলিম কনফারেন্সটাও বানচাল হয়ে গেল।

এরপর ত্রিশের দশকে তিন তিনটি গোলটেবিল বৈঠকও বানচাল হয়ে গেলো। অবিভক্ত ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতিতে কোন বিষয়ে মুসলমানদের পরমাণু পরিমাণ দাবিও বৈদিক ব্রাহ্মণশাসিত প্রতিবেশী মনুসংহিতার সমাজ মানতে নারাজ।

ইতোপূর্বে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়া ডক্টর কেশব রাও হেডগেওয়ার ১৯২৫-এ বিজয়া দশমীর দিন কানপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, উপমহাদেশে মুসলমানদের, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কোন ঠাঁই হবে না। ১৯৩৭-এ যেসব প্রদেশে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো সেই সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। সেই সাতটি প্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লোকেরাই কেবল যে সরকারি চাকরিতে ঢোকার অবাধ সুযোগ পেল, শুধু তা-ই নয়, তারা সামরিক বাহিনীতে ঢোকারও সুযোগ পেল। পরিকল্পিতভাবে তারা মুসলিমবিরোধী দাঙ্গাও বাধালো।

www.pathagar.com

অগত্যা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে এসব কিছুর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের বসবাসের জন্য জায়গা আলাদা করে দেয়ার কথা বলা হ'লো কার্যত আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

নজরুল আলজাইমার্স ডিজিজে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এর বছর আড়াই পর ১৯৪২-এর ৯ অক্টোবর।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নজরুলের জীবন ও সৃষ্টির মূল্যায়ন কী রকম দাঁড়ালো? আলজাইমার্স ডিজিজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রায় বছর দুই পর জুন ১৯৪৪ (আষাঢ় ১৩৫১)-র মাসিক মোহাম্মদীতে মুজিবুর রহমান খাঁ লিখলেন ঃ

"কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের আদি জাতীয় কবি বললে অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন এবং বলবেন— এ কেমন করে হয়? নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন।

তিনি বলেছেন— পাকিস্তান বলা হয়তো ঠিক হয় না, বলা উচিত আল্লা জিন্দাবাদ। সুতরাং নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন আর সমর্থন করুন– আসলে তাঁর দেখায় যাকে বলে পাকিস্তানবাদ তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসাবেই দেখতে পাই। নজরুল ইসলাম জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন— 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল/ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।'

এ গানটি থেকে আর ভুল হবার অবকাশ থাকে না যে, নজরুল ইসলাম মুসলিম জাতীয়তাবাদের চারণ কবি।...

নজরুল ইসলামের শক্তি ও শৌর্যের কবিতার বেশির ভাগের ভিতর আমরা হিন্দু তমুদ্দুনাশ্রিত বিষয়বস্তু দেখতে পাই। হিন্দু প্রভাবান্বিত বাঙলার সাহিত্য এবং রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এখানে একথাও আমাদিগকে স্বীকার করতেই হবে যে, একমাত্র নজরুল ইসলামই মুসলমান কবিদের ভিতর সর্বপ্রথম হিন্দু তমদ্দুনের প্রভাব কাটিয়ে মুসলমান বিষয়বস্তু নিয়ে এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গীর স্বাজাতিক বৈশিষ্ট্য এবং আবহাওয়া অনাবিল রেখে সত্যিকার কবিতা লিখতে পেরেছেন।...

মুসলমান জাতীয় ভাবধারা শক্তিবাদ এবং সাম্যবাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম পাঁচমিশেলি জিনিসের অনেক আমদানি করেছেন। গীতার শক্তিবাদ ও রাশিয়ার কমিউনিজমের কথা তিনি তাতে বেপোরোয়াভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একটা জিনিস সব সময়ই তাঁর কবিতার সুরের ভিতর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি কখনও মুসলিম স্বাজাতিকতার মূলধারা থেকে বিচ্যুত হন নাই। প্রকাশভঙ্গিতে যুগের দাবি এবং আবেষ্টনের প্রভাবকে তিনি স্বীকার করেছেন মাত্র।...

মুসলিম স্বাজাতিক সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করলে আমরা একটা জিনিস কবিতায় লক্ষ্য করি। কাজী নজরুল ইসলাম পেয়েছেন বিরাট পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকার।

www.pathagar.com

আরবি-ফারসি শব্দ চয়ন, উপমা এবং অলঙ্কার সংগ্রহের ব্যাপারে পুঁথি সাহিত্যের ঐশ্বর্যকে নজরুল ইসলামের পূর্বে কেউ কাজে লাগাতে পারেননি।"

২৮ মে ১৯৫০ তারিখের দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হ'লো ঃ

"পূর্ব পাকিস্তানের জবান কীরূপ হইবে, তার সুর কীরূপ হওয়া চাই, তার নির্ভুল পরিচয় তাঁহার রচনায় রহিয়াছে। এই হিসাবে আমরা তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় ভাবের সার্থক উদ্‌গাতা বলিয়া অভিনন্দন না জানাইয়া পারি না।"

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী আগে ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে কলকাতার এলবার্ট হলে জাতীয় পর্যায়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যখন সংবর্ধনা দেয়া হয়, এর প্রাক্কালে বৈশাখ-শ্রাবণ, কার্তিক-মাঘ ১৩৩৫-এর 'মোয়াজ্জিন'-এর সম্পাদকীয় অভিমতে গণমানুষের কথা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেটাই এখানে স্মরণ করছি ঃ

"নজরুলের পূর্বে বঙ্গ-মোসলেম সমাজে কাব্য-সাহিত্যের অভাব অনুভব হইতেছিল। কিন্তু আজ এ সমাজ একজন মুসলমান কাব্য-সাহিত্যিকের অপূর্ব সৃষ্টি সম্পদের মহান দানে বঙ্গ-সাহিত্যের আসর গৌরবান্বিত হইয়াছে দেখিয়া বুকভরা তৃপ্তি গৌরব অনুভবকরতঃ ক্রমশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। বিষের বাঁশি— বাদক এই কবি মরণোন্মুখ মোসলেমের— শুধু মোসলেম নয়, অমোসলেমেরও প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ-নৈপুণ্য, শব্দ চয়ন-চাতুর্য ও উদ্যাম উদ্দীপনাময় বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখা বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। আর মুসলমান আজ তাহার একজন ভাইকে বঙ্গ-সাহিত্যের সুউচ্চ আসনে সমাসীন দেখিয়া জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে।"

বলাই বাহুল্য যে, নজরুল এরপরও এক যুগ সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান আঙ্গিনায় বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেও কি সেগুলো চর্চা করার যোগ্যতা আমরা অর্জন করতে পারব না?

তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবীর উম্মত, এ কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েও কেবল মুসলমানের কবি হতে চাননি তিনি। সেতুবন্ধ হিসাবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব মানুষের কবি হতে পেরেছেন। তিনি আপোষহীন স্বাধীনতা চেতনার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানবতাবাদী কবি, সাম্য ও সহাবস্থানের কবি। মানুষ হিসাবেও তিনি এক পরিপূর্ণ মানুষ। আন্তর্জাতিক চেতনায় এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় তিনি এক অনন্য পুরুষ, অনন্য প্রতিভা। তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবন মাত্র দু'দশকের কিছু বেশি সময়ের হলেও প্রতিভা হিসাবে, ব্যক্তিত্ব হিসাবে, আদর্শ মানুষ হিসাবে এই আঙিনায় তার সমপর্যায়ের আর কেউ নেই। আমাদের নজরুল চর্চা নজরুল বিষয়ক পঠন-পাঠন ঠিক এই নিরিখেই হওয়া উচিত।

কেবল প্রেম, প্রকৃতি বিষয়ক লেখার ক্ষেত্রে নয়, কিংবা সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট নয়, এমন সব লেখার কারণেও নয়, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়েরও সমস্ত লেখাতে নজরুল কেবল মুসলমানের নয়, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, নাস্তিক নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সবার কবি। সাম্যবাদী এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতিতেই তিনি সবার কবি এবং এ জন্যই তিনি আমাদের আদর্শ।

নজরুল তাঁর একটি গানে বলেছেন, "কেবল মুসলমানের তরে আসেনি ক' ইসলাম"। সেই একই নিরিখে নজরুলও কেবল মুসলমানদের জন্য আসেননি।

প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়েও লিখেছেন, সর্বহারাদের জন্য শ্রেণীহীন সমাজ কামনায় কবিতা, গান, কথাসাহিত্য, নিবন্ধাদি রেখে গেছেন, এসব কিছু দেখে কারও মনে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বারংবার উল্লেখ করে গেছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং নবীর উম্মত; কিন্তু তিনি কবি সবারই এবং উল্লেখ করে গেছেন যে, শাস্ত্র এবং সাহিত্য এক নয়। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবারই, সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর হাতে পরাধীনতা, আসমান-জমিন শ্রেণী বৈষম্য এবং মানুষের চরম দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যজনিত দুর্দশা কোন উপেক্ষার বিষয় নয়।

সাংস্কৃতিক প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ধর্মের নামে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের পক্ষে এবং এ কারণেই আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পক্ষে।

অর্থাৎ তিনি চাইতেন যার যা ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সেসব তার থাকুক, সেসব সংরক্ষণের, চর্চার অধিকারও তার থাকুক এবং এ কারণেই বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের কথাও তিনি বলেছেন।

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হল-এ জাতির পক্ষে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যখন সংবর্ধনা দেয়া হয়, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' (দুর্গম গিরিকান্তার মরু দুস্তর পারাবার)-এর সমপর্যায়ের জাতীয় সঙ্গীত তিনি কোথাও শোনেননি।

১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বাংলা ভাগ হওয়ার বছর তিনেক আগে এবং আলজাইমার্স ডিজিজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়ার বছর দুই পর ১৯৪৪-এর জুনে মাসিক মোহাম্মদীতে মুজীবুর রহমান খাঁ "দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল/ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।"

এই সঙ্গীতটিকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত করার কথা বলেছিলেন।

১৯২৯ থেকে ১৯৪৪, এই পনেরো বছরের ব্যবধানে দুটো ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে নজরুলের দু'রকম জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করা হয়েছে।

অর্থাৎ সহাবস্থানের পরিবেশ থাকলে এক রকম। আর সহাবস্থানের পরিবেশ না থাকলে আর একরকম।

www.pathagar.com

কিন্তু নজরুলের চিন্তাধারায় এর কোনটাই আলাদা কিছু ছিল না। তিনি একই বছরে একই মাসে একই দিনে একই সিটিংয়ে কীর্তন-ভজন, শ্যামাসঙ্গীত যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন সাম্যবাদী গান এবং ইসলামী গান। গবেষক, লেখক এবং পাঠকদের জন্য হলেও তাঁর ইসলামী গান যেমন প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তেমনি তাঁর কীর্তন-ভজন, শ্যামাসঙ্গীতও নয় মুসলমানদের জন্য। তিনি কাজ করেছেন কার্যত সেতুবন্ধ হিসেবে ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্য। ফলে কেউ তাঁর একটা দিক গ্রহণ করলে সেটাকে খণ্ডিতভাবে দেখা বলে না।

মুসলমানদের সভা সমিতিতে, মিলাদ মাহফিলে ইসলামী গান, ইসলামী কবিতার আবৃত্তি শুনেছি। আবার অনেক হিন্দু বৈষ্ণব পরিবারের ঠাকুরঘরে থাকে কীর্তন-ভজন, আবার অনেক শাক্ত হিন্দু পরিবারের ঠাকুরঘরে থাকে তাঁর লেখা শ্যামাসঙ্গীত। ভারতের অনেক পূজা মণ্ডপে শুনেছি তাঁর শ্যামাসঙ্গীত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমএ ক্লাসে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছিল নজরুলের অসুস্থতার অনেক পরে আবদুল আজীজ আল্-আমানের কলকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত নজরুলের লেখা শ্যামাসঙ্গীতের বই "রাঙা জবা"। এটা তাদের সংস্কৃতির সাথে, এক জাতিতত্ত্বের ধারণার সাথে খাপ খায়।

কিন্তু ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাকার সবকিছুই বহাল রেখে এবং নজরুলও না পড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করার যে সংস্থান রাখা হ'লো সেটাই বিস্ময়কর।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখেছি, ১৯৪১ সালের শেষভাগে ১৯ সেপ্টেম্বর (২ আশ্বিন ১৩৪৮ ঃ ২৬ শাবান ১৩৬০ তারিখ) শুক্রবার কলকাতায় টাউন হল-এ পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, মুসলিম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান দরকার।"

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্মবীররা টেরো কমিউনিস্ট এবং টেরো সোশালিস্টদের প্রভাবে মুসলিম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির পথটা কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই নজরুল উপেক্ষার উৎসাহটা আসছে ঠিক ওখান থেকেই। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের আলাদা কোন জাতিসত্তা থাকবে না। আর এটা হলে আলাদা কোন রাজনৈতিক ভূগোলও থাকবে না। আলাদা জাতিসত্তা না থাকলে আলাদা কোন রাজনৈতিক ভূগোলের সম্ভাবনাও আর থাকবে না।

www.pathagar.com

নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদের সবাইকে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে দরকার

।। এক ।।

ফরিদপুরের সন্তান হরিপদ রায় চৌধুরী মহাশয় পাকিস্তান আমলে দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিক ছিলেন। একজন সাব-এডিটর ছিলেন তিনি।

এখান থেকে যাওয়ার পর তিনি আরো পড়াশুনা করেছেন এবং শিক্ষকতা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং কবি শাহাদৎ হোসেন যে এলাকার মানুষ সেখানে হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাইস্কুলে তিনি এক সময় সহকারী শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ফরিদপুরেরই সন্তান ডক্টর সুরেশচন্দ্র মৈত্র যখন ওই স্কুলের সেক্রেটারী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন হরিপদ রায় চৌধুরী মহাশয় সে সময় সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন।

স্কুলে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম।

ক্লাসে তিনি প্রায়ই কথাবার্তায় জর্জ বার্নাড শ'-র একটা উক্তি উচ্চারণ করতেন ঃ 'দেয়া(র) ইজ্ নো মরালিটি, ল্যাক্ অব্ অপারচুনিটি।' নীতি বা নৈতিকতা বলে কোনো কিছু নেই, কেবল সুযোগের অভাব।

আমার নিজের পড়াশুনা এবং অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য মনে হয়েছে যে, কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। এটা সত্য হলে তো বিশ্বাসের, আস্থার এবং আশা করার কোন জায়গা আর অবশিষ্ট থাকে না!

অনেক অনুযোগ, আপত্তি এবং গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যেও, অনেক বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেও আশা করারও অনেক কিছু থাকে বলেই কিংবা আশা করি বলেই আমরা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক কিছুই লিখি। প্রত্যাশার কিছু অবশিষ্ট না থাকলে নিশ্চয়ই আর লিখতাম না!

কথাটা কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নয়, গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই লিখছি।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটে গেলেই কি সব প্রয়োজন মিটে যায়? মানুষ তো কার্যত ব্যবহারিক জীবনে আক্ষরিক অর্থেই সামাজিক জীব। সমাজের প্রয়োজন না মিটলে ব্যক্তির প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়। সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান না করে কোনো ব্যক্তির আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কোনোক্রমেই নিশ্চিত করা যায় না। এই নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রযন্ত্র এবং এর উপরি কাঠামো যে সরকার, এই উভয়েরই। কেননা, একটা দেশের সব কিছুই তো কোনো না কোনো মন্ত্রণালয়ের এবং দায়িত্বভারপ্রাপ্ত কোনো না কোনো মন্ত্রী মহোদয়ের অধীন।

আমি এখানে নজরুল চর্চা প্রসঙ্গেই এসব কথা লিখছি।

www.pathagar.com

।। দুই ।।

এই দু'হাজার তিন সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে দৈনিক ইনকিলাবের মাননীয় সম্পাদক এ, এম, এম, বাহাউদ্দীন সাহেবকে যখন আমার সম্পাদনায় ৪২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০, এই ঠিকানাস্থিত ইউরেকা বুক হাউস থেকে প্রকাশিত "নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা" শিরোনামে বইটি দিতে গিয়েছিলাম তখন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'বই তো বেরিয়েছে বুঝলাম! কিন্তু আপনার মূল্যায়ন হয় না কেন?'

এমন একটা প্রশ্ন তিনিও যে করতে পারেন সে বিষয়ে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম না।

আমার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, মমত্ববোধ এবং শুভ কামনাটা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনচিত্তে উপলব্ধি করলাম। চিরদিন তাঁর এই কথাটা, এই জানতে চাওয়ার ঔদার্যপূর্ণ ব্যাপারটা আমার স্মরণে থাকবে। তিনি যে নিজ থেকে এভাবে বিষয়টা চিন্তা করেছেন, গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রশ্নটা হয়তো একটু অন্যভাবে হলেও সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আরো কেউ কেউ হয়তো করেছেন। কিন্তু যে কাগজে আমি আমার জীবন ধারণের জন্যও কাজ করি, সেই কাগজের মাননীয় সম্পাদক সাহেব তাঁর প্রথম কথাতেই যে এভাবে এটা জানতে চাইলেন সেটা আমার কাছে একাধারে আনন্দদায়ক এবং সৌভাগ্যের কথা। তাঁর এই কথাটা আমি নিশ্চয়ই কোনোদিন ভুলব না। আমার মনে থাকবে।

তাঁর এই প্রশ্নের জবাব সবদিক দিয়ে ঠিকঠাক দিতে হলে তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষের অনেক সময় নষ্ট হবে মনে করে অতি সংক্ষেপে কেবল এটুকুই বললাম যে, 'আমি কাজটুকু একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আমি সেভাবে নিজের জন্য এটা করছি না।'

উঁনি বললেন, 'ঠিক আছে, যান!'

তাঁর সহানুভূতিটুকুর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হয়ে চলে এলাম।

গত সতেরো বছরে এটা আমার জন্য একটা আনন্দদায়ক স্মৃতি।

।। তিন ।।

এর দু'একদিন পর ১০ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয়েছে সেই নতুন নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নামের একটা তালিকা পেলাম। কে কোন্ দায়িত্বভার পেয়েছেন, সে উল্লেখও দেখলাম।

দৈনিক ইনকিলাবের মাননীয় সম্পাদক সাহেবকে এটা পাঠিয়েছেন।

পিওনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উঁনি কি কথা বলতে বলেছেন?'

www.pathagar.com

উঁনি সে রকম কোন নির্দেশ দেননি, এটা জানার পর ওটা ভাল করে দেখে রেখে দিলাম।
ওটা তাঁর কাছে কীভাবে গেছে, জানি না।
বার্তা বিভাগ মারফৎ ? এখানকার কারো হাত দিয়ে?
না সরাসরি প্রতিষ্ঠানটির তরফ থেকে?
এর কয়েকদিন আগে নজরুল একাডেমীর অফিস সেক্রেটারী রফিকুল আলম খন্দকার সাহেব এসেছিলেন।
তিনিই হয়তো যেখানে হোক দিয়ে গেছেন। আমাকে কিছু বলেননি।

।। চার ।।

কয়েকদিন আগে ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ রবিবার বিকেলে মরহুম উস্তাদ ফুল মোহাম্মদ সাহেবের দুই মেয়ে এসেছিলেন। তাদের আব্বার জন্মদিনে তাদের বাসায় যাওয়ার দাওয়াত করতে।

তারা নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের পাঁচজন সদস্যের মনোনয়ন এবং এরপর পনেরো জন সদস্যের নির্বাচন, ইত্যাকার ব্যাপারে নানান জনের কাছে যে নানান কথা শুনেছেন সে বিষয়ে আসল ঘটনাটা জানতে চাইলেন। এই বিশজন সদস্য পরে যে গঠনতন্ত্রের সংস্থান মোতাবেক আরও পাঁচজন সদস্যকে কো-অপ্ট করবেন এই প্রসঙ্গটা তখন আসেনি।

তারা যেসব প্রশ্ন করেছেন সে রকম প্রশ্ন অবশ্য কাগজের অফিসের এবং বাইরে অনেকেই করেছেন। অতএব অতি সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে আসল অবস্থাটার কথা যথার্থ নজরুল চর্চার সংস্থান সৃষ্টির স্বার্থেই লেখা দরকার।

।। পাঁচ ।।

নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য হিসেবেই গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্বভার এখন থেকে বছর ছয়েক আগে যখন পেলাম তখন সাধারণ সম্পাদক সাহেব দু'দিন রাতে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমাকে এ জন্য কত দিতে হবে। আমার নিজের আর্থিক প্রয়োজন যতই থাক, আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম বলে কোন সম্মানী নিতে চাইনি। যে বিষয়টি আমি বুঝি, যে বিষয়ে একটা নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট পলিসি এবং পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে মনে করি, সে বিষয়ে আমি কেবল স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম। সমস্ত বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পলিসি এবং একটা সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক নিয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করার পদ্ধতি ও পরিবেশ সৃষ্টি হোক– সেটাই চেয়েছিলাম।

আমি সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলাম।

আমার সম্পাদনায় নজরুল একাডেমী পত্রিকার প্রথম যে সংখ্যাটা বের হয় সে সময় আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে ক্রমে কাজের সুযোগটা আর তেমন থাকেনি।

www.pathagar.com

আমার মনে হয়েছিল এসব বিষয়ে একটা পদ্ধতি নির্ধারণ করা দরকার, একটা নিয়মাবলী প্রণয়ন করা দরকার। এই পদ্ধতি, এই নিয়মাবলী কেমন হওয়া দরকার, সেসব বিষয়ে একটা খসড়া প্রস্তাবও আমি পেশ করেছি।

পরে মনে হ'লো, একাডেমীর নির্বাহী পরিষদে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার মতো কে আছেন– সেটা বুঝতে পারছি না।

।। ছয় ।।

আমার সম্পাদনায় নজরুল একাডেমী পত্রিকার শেষ যে সংখ্যা এবং শেষ যে গ্রন্থটি যে প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় সেই প্রেসটিতে কাজ দেয়ার সময় কোনো আগাম টাকা দেয়া হয়নি। সমস্ত পত্রিকা এবং গ্রন্থ নজরুল একাডেমী অফিসে ডেলিভারী দেয়ার পর প্রেস টাকা চেয়েছে।

এই অবস্থায় ২০০০ সালের মে মাসের পর থেকে নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত হওয়াটাও কঠিন হয়ে ওঠে।

প্রেসের টাকা পরিশোধ না করাকে কেন্দ্র করে একটা জটিল পরিস্থিতির কারণে দু'আড়াই বছর নির্বাহী পরিষদের সভায় যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও আমার আর ছিল না।

ওই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর নজরুলের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনের অনুষ্ঠানেও দেখতাম কার্ডে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসাবেও আমার নাম থাকতো না। অতএব, অনুষ্ঠানে যাওয়ারও আর প্রশ্ন উঠতো না। অনুষ্ঠানগুলোতে কোনো নজরুল গবেষকের নামও অবশ্য থাকতো না।

কিন্তু নির্বাহী পরিষদের প্রতিটি সভায় উপস্থিত হওয়ার দাওয়াতপত্র আমি ঠিকই পেতাম। অফিস সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ে নিয়ম মোতাবেক ফোনও করতেন। এর মধ্যে ২০০২ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ টেলিভিশনের "সিন্ধু-হিন্দোল" অনুষ্ঠানে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ "সিন্ধু-হিন্দোলন" সম্পর্কে কিছু বলার জন্য নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাহেব আমাকে বিশেষভাবে বেশ কয়েকবার বলেন।

বারংবার বলেন।

তিনি বিশেষভাবে বলার কারণে টেলিভিশনের উক্ত অনুষ্ঠানে গেলাম।

কিন্তু পরে লক্ষ্য করলাম, সাধারণ সম্পাদক সাহেবের অনুরোধে টেলিভিশনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পরও ২০০২ সালের ২৭ আগস্ট (১২ ভাদ্র, ১৪০৯) তারিখে নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও কার্ডে আমার নাম নেই।

তখন ব্যাপারটা বুঝলাম। টেলিভিশনের নজরুল বিষয়ক অনুষ্ঠানে যাওয়া আর নজরুল একাডেমীতে যাওয়া, এই ব্যাপার দুটো এক নয়।

কিন্তু এর পরও নির্বাহী পরিষদের সভার চিঠি আসে।

বুঝলাম, নির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটি সভায় উপস্থিত না হলে অনেককেই যেহেতু বাদ দিতে হয়, ঠিক সে কারণেই আমাকেও বাদ দেয়া হচ্ছে না।

www.pathagar.com

।। সাত ।।

১০ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ মঙ্গলবার ছিল আমার অফ্ ডে।

ওদিন বাসায়ই ছিলাম।

সাধারণ সম্পাদক সাহেব ফোন করলেন দুপুরের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন কিনা বলেন?'

বেশ কঠিন প্রশ্ন! এবং প্রশ্নটিকে আমার আন্তরিকতাপূর্ণ বলেও মনে হ'লো।

এভাবেই উঁনি বলছেন।

আমি শুনছি।

প্রেসের টাকার ব্যাপারটা ওদেরকে আরো কাজ দিয়ে পুষিয়ে দেয়ার কথা বললেন।

প্রকাশনার ব্যাপারে অর্থ সংস্থানটি কীভাবে হবে সেটাও বললেন।

উঁনি বিশেষভাবে বললেন, 'আসেন না!'

বাসায়ই ছিলাম। তাঁকে যাব বলে কথা দিলাম।

গেলাম।

সভার সবার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে নীরবে শুনলাম। মানুষগুলোকে কতদিন পরে দেখছি!

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক আন্তরিকতাপূর্ণ, সৌজন্যমূলক এবং ভাল।

আমি নজরুলভক্ত। সমাজসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্ম করার চেষ্টা করি। নজরুল জীবন ও সৃষ্টির নানান দিক নিয়ে গঠনমূলক কাজকর্মগুলো গণমানুষের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন বলে মনে করি। ফলে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার একটা মমত্ববোধ আছে, একটা টান আছে।

নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে অজস্র হাতে নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক কাজগুলো যতখানি হতে পারে, কোনো একজনের হাতে অত কাজ, অতখানি কাজ কোনোক্রমেই হওয়া সম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি কিছু কিছু কাজ ঠিকই করছি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন দিকের কাজ যেভাবে যতখানি হতে পারে, কারো একার পক্ষে অতখানি কাজ, অত দিকের কাজ করা সম্ভব নয়। নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমার আকর্ষণ ঠিক এ কারণেই। আমি কাজের কথা বলি, কারো প্রতি আমার পছন্দ-অপছন্দের কারণে নয়। এটা হয়নি, সেটা হয়নি, এটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে না— এসব যে বলি সেটা কাজগুলোকে অত্যন্ত জরুরি এবং অপরিহার্য মনে করি বলেই! অন্য কোনো কারণে নয়।

www.pathagar.com

।। আট ।।

নির্বাহী পরিষদের ২০০২ তারিখের সভায় সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান সাহেব যে পাঁচজন সদস্যের নাম মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন এবং তার প্রস্তাবক্রমেই যে নামগুলো অনুমোদিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আমার নাম নেই। মনোনীত হলেন ঃ ১. সিদ্দিকুর রহমান সাহেব (যিনি এখন গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক); ২. ইঞ্জিনিয়ার এম. আতিকুর রহমান সাহেব (যিনি এখন যুগ্ম-সম্পাদক); ৩. শাহাবুদ্দীন খান সাহেব (যিনি এখন কোষাধ্যক্ষ); ৪. সৈয়দ আবু জাফর আহমদ রসুল সাহেব (যিনি এখন শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক); ৫. জি. এম. হেদায়েতুল ইসলাম (যিনি আগে ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক এবং এখন নির্বাহী সদস্য)।

বুঝলাম!

কিন্তু উঁনি আমাকে বিষেশভাবে কেন আসতে বলেছিলেন সেটা কিন্তু বুঝলাম না!

নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করার ব্যাপারে আমি ছাড়া ওখানে সভায় আর তো কেউ নেই!

মনোনয়নের জন্য একজনের নাম করতে হলেও কেবল আমার নামটাই তো করার দরকার ছিল! বিশেষত, বিশেষভাবে আসার আহবান জানানোর পরও এটা কী করলেন তিনি?

নির্বাহী পরিষদের উপস্থিত সদস্যদেরকে তো দেখলাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী রকম সেটা জানলাম।

এই প্রতিষ্ঠানে আমি এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ছিলাম ১৯৮৭-৮৮তে। আর ন'বছর নির্বাহী পরিষদে!

কৌতূহল হলো, এবার দেখা দরকার সাধারণ সদস্য কারা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বা কী রকম!

গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিয়ম হলো ৫ জন সদস্য মনোনীত হবেন এবং ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এবং নির্বাচনের পর এই ৫ ও ১৫ মিলে এই ২০ জন সদস্য আরো পাঁচজন সদস্যকে কো-অপট করবেন। সব মিলে নির্বাহী পরিষদ হবে ২৫ জন সদস্যের।

আমি নির্বাচনে প্রার্থী হলাম।

১৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে মনোনয়নপত্র দাখিল করলাম।

জানতাম, অধিকাংশ সাধারণ সদস্য সাধারণ সম্পাদক সাহেবের এখতিয়ারে।

লক্ষ্য স্থির করলাম, অন্তত আমার একটা ভোট তো আমি পাবো। অধিকাংশ ভোটার কারা সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করার জন্যই নির্বাচনে প্রার্থী হলাম।

ভোট দেওয়ার জন্য আমি কাউকেই অনুরোধ করিনি।

ওভাবে হওয়ারও নয়!

www.pathagar.com

নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যের এখতিয়ারে কত ভোট, সেটাই হলো কার্যত সবচেয়ে বড় কথা!

আমি জানি!

আমি জানতাম!

।। নয় ।।

তালিকা পেলাম, মোট সদস্য সংখ্যা ১১৫।

নজরুল বিষয়ক যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাদের মধ্যে আছেন ডক্টর রফিকুল ইসলাম আর আমি। আমারই মতো আজীবন সদস্য ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেব গত ৬ বছর নজরুল একাডেমীর কোনো সাধারণ সভায়ও আসেননি।

সদস্যদের অধিকাংশকেই আমি চিনি না।

কিন্তু আমি না চিনলেও অন্য কেউ যে তাদেরকে চিনবেন না, তাও তো নয়।

তবু মনোনয়নপত্র দাখিল করলাম।

আমার নিজের একটা ভোট তো আমি পাবো!

২০০০ সালের মে মাসের পর থেকে প্রকাশনার কাজ-কর্মও তো আর হয় না।

অন্য কোনো গঠনমূলক কাজকর্মও তো আর হয় না।

ওদিকে প্রেসের টাকা বাকি!

ওসব কারণে দু'আড়াই বছর তো আসি না।

গঠনমূলক কাজকর্ম করার সুযোগ যদি এখানে কারো জন্য থাকে তাহলে সাধারণ সম্পাদক সাহেব, কোষাধ্যক্ষ সাহেবরাই ভোটের ব্যবস্থা করে দেবেন। তা না হলে তো আর হবে না।

।। দশ ।।

১৮ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায় নির্বাহী পরিষদের একটা সভা ছিল। অফিস থেকেই গেলাম।

একজন নির্বাহী সদস্য দেখলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলছেন সেটা এই যে, অন্য সময় কোরাম হয় না; কিন্তু এখন অনেকেই এসেছেন। ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার সময়ও দেখলাম সাধারণ সম্পাদক সাহেব আমাকে সভায় উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বলে তিনি খুশী নন।

মিটিং শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর আমি তাকে বললাম, 'গঠনমূলক কাজকর্ম হলে কোরাম ঠিকই হতো। গত দু'আড়াই বছরে আপনার সঙ্গে আমার তফাৎটা হয়েছে এই যে, নির্বাহী পরিষদের সভার চা আপনি বেশি খেয়েছেন আর আমি কম খেয়েছি।'

ভদ্রলোক একজন নামকরা নাট্যশিল্পী।

নজরুলের একটা নাটক করলেও বোঝা যেতো!

www.pathagar.com

একাডেমীতে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মে তার পরমাণু পরিমাণ অবদানও নেই। সেই তিনিই এই নতুন নির্বাহী পরিষদে নজরুল একাডেমীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক।

নজরুল একাডেমীর গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকের পদে, কোষাধ্যক্ষের পদে এবং অন্যান্য পদে দু' টার্মের বেশি (অর্থাৎ ৩ বছর করে ৬ বছরের বেশি) অনির্দিষ্টকাল থাকার যে সংস্থান বা সুযোগ এবার কয়েকদিন আগে সৃষ্টি করা হয় সে কাজে এই ভদ্রলোকেরও ছিল একজন সমর্থকের ভূমিকা। এ বিষয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে 'নজরুল একাডেমীর প্রয়োজন এখন উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা, গঠনতন্ত্র সংশোধন নয়', এই শিরোনামে নিবন্ধ লিখেছিলাম।

।। এগারো ।।

২৫ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে নির্বাহী পরিষদের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন সদস্যের যে নির্বাচন হয়েছিলো সাধারণ সম্পাদক সাহেবের তালিকায় সেখানে যার নাম দেখেছিলাম, যাদের নাম ছিল সেই নামগুলো হলো ঃ

১. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ২. সাবির আহমেদ চৌধুরী, ৩, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর, ৪. খায়রুল আলম সবুজ ৫. মিন্টু রহমান, ৬. মাহবুব আলম কমল, ৭. নাশিদ কামাল ওয়াজেদ, ৮. মুর্শিদ জাহান, ৯. নাসিম আহমেদ, ১০, সৈয়দ হোসেন সাঈদ, ১১. রেজা মতিন, ১২. ইদরিস আলী, ১৩. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান মজুমদার, ১৪. এসডি সুমন, ১৫. মাহতাবুল আলম।

এদের মধ্যে অন্তত দু'জন স্বনামধন্য নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আছেন! কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সঙ্গীত শিল্পী হওয়া আর আবদুস সাত্তার সাহেব আর আসাদুল হক সাহেবের মতো নজরুল সঙ্গীত গবেষক হওয়া এক কথা নয়।

সাধারণ সম্পাদক সাহেবের এই তালিকায় যাদের নাম ছিল তারাই নির্বাচিত হয়েছেন। কর্মকর্তা হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক সাহেবের মনোনীত প্রার্থী এবং সাধারণ সম্পাদকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই।

।। বার ।।

১০ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে নতুন নির্বাহী পরিষদের সভায় যে পাঁচজনকে কো-অপ্ট করা হয়েছে তারা হলেন নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আবদুল মান্নান সৈয়দ, কবির পৌত্রী এবং নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খিলখিল কাজী, হাসনা মওদুদ, হাকীম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভুঁইয়া এবং ম. মিজানুর রহমান।

কো-অপট করার জন্য একমাত্র নজরুল গবেষক হিসাবে পাওয়া গেলো নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেবকে।

নজরুল সঙ্গীত গবেষক আবদুস সাত্তার সাহেব এবং আসাদুল হক সাহেব নেই। নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম সাহেব, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ সাহেব,

www.pathagar.com

করুণাময় গোস্বামী মহাশয়, শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, অনুপম হায়াত সাহেব, ডক্টর এসএম লুৎফর রহমান সাহেব, মফিজুল ইসলাম সাহেব, বাবু রহমান সাহেবরা নেই। ৫ জন মনোনীত সদস্য এবং ৫ জন কো-অপট করা সদস্যদের তালিকায় এঁদেরকে ঠাঁই দেওয়া যেতো।

একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে মানুষগুলো নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন, তারা নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে নেই, নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদেও নেই। কেন নেই? এঁদের জায়গাগুলো পূরণ করার জন্য নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন না তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে। নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে এবং নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদে কিন্তু তাঁদেরই থাকার কথা যাঁরা নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন, কাজকর্মগুলো বোঝেন এবং কাজকর্মগুলোর কথাই কেবল বলেন।

পাঁচ জন মনোনীত করার এবং পাঁচজন কো-অপট্ করার যে সংস্থান নজরুল একাডেমীর গঠনতন্ত্রে আছে, সেই দশ জনের মধ্যে কি এঁদেরকে ঠাঁই দেওয়া যেতো না? আমি কেবল দু'একজনের কথা বলছি না। এঁদের সবাইকে রাখার কথাই বলছি। তা না হলে নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে নজরুলবিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্ম করার বিষয়ে আলোচনা করার পরিবেশ তো অনেক দূরের কথা, কথা বলার পরিবেশটুকুও তো থাকবে না।

কোনোখান থেকে কোনো রকম পৃষ্ঠাপোষকতা ছাড়াই আমি নিজে নিছক ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী যতখানি পারি নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করার চেষ্টা করি। ১৯৮৭-৮৮তে নজরুল একাডেমীর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ছিলাম। গত ৯ বছর ছিলাম নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সদস্য। এর মধ্যে গত ৬ বছর ছিলাম নজরুল একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক। আমার সম্পাদনায় নজরুল একাডেমী পত্রিকার ৪টি সংখ্যা এবং নজরুল বিষয়ক গোটা চারেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির, অবস্থার এবং সমস্যাদির কথা জানি।

১৯৬৪-তে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নজরুল একাডেমীতে কোনো রকম সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ভাষাভিত্তিক বিভাজন, দলীয় পরিচয়ের সমস্যা, এরকম কোনো রকম অনুদারতা ঠাঁই পায়নি।

গত ২০০১ সালে নজরুল একাডেমীর সাধারণ সভায় একজন কর্মকর্তার ভাষণে প্রথম শুনলাম, প্রশ্ন উঠেছে নাকি নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর দু'জন লোক আছেন!

সে দু'জন কারা সেটা আমার জানা নেই।

এখন একজন সাংবাদিক সহকর্মী এসে বলছেন, তিনি নাকি শুনে এসেছেন, নজরুল একাডেমীর একজন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে গিয়ে বলছেন, নজরুল একাডেমীর নির্বাচনে পরাজিত একজন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী নাকি আওয়ামী লীগের লোক।

www.pathagar.com

আবার অন্যদিকে শুনি, নজরুল একাডেমীর নতুন নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক এবং সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক নাকি আওয়ামী লীগের লোক এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাকি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য।

নজরুলবিষয়ক কাজে মানুষের দলীয় পরিচয় নিয়ে কোনো অনুদারতার কথা ১৯৯৬ পর্যন্ত শোনা যায়নি। ওসব বিবেচনায় এনে কাউকে কাউকে কোণঠাসা করা শুরু হলো পরবর্তীকালে।

আমি নিজে কখনও কোনো দলের সদস্য হইনি, কখনো কোনো দলের সদস্য বলে নিজের পরিচয়ও কোথাও দিইনি। কিন্তু আমি মনে করি, কোনো ব্যক্তি যথার্থ নজরুলভক্ত কিনা, নজরুল বিষয়ে যথার্থ গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন কিনা সেটাই নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের এবং নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং কর্মকর্তা হওয়ার ব্যাপারে তার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। অন্য কেনো বিষয় নয়। তারা যে কেউ নজরুল গবেষক নন, নজরুলবিষয়ক কোনো গঠনমূলক কাজকর্ম যে তারা করেননি, সেটাই কেবল আপত্তির বিষয় হতে পারে। অন্য কিছু নয়। নজরুলবিষয়ক গঠনমূলক কাজের ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

নজরুল ইনস্টিটিউটেও নতুন অর্গানোগ্রামে মহাপরিচালকের একটা পদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার এক একজন পরিচালককে দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে হলেও নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্ম করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে ক্বচিৎ কখনও কখনও ভাষণ ও সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে সে কাজ হবে না।

নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডে এবং নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদে কবি পরিবারের লোকদের থাকার ব্যাপারটা ভিন্ন। তাঁরা সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সব প্রতিষ্ঠানেই থাকতে পারেন এবং তাদের থাকার একটা দরকারও আছে। তাদের কেউ থাকলে এবং নজরুলবিষয়ক গঠনমূলক কাজের কথাই হবে এবং কাজ হবে। এবং নজরুলকে খাটো করে দেখানো হয়, নজরুল গবেষকদের কাজকর্মকে খাটো করে দেখানো হয়, এমন কোনো লেখা এবং বইপত্রও প্রকাশিত হবে না।

।। তেরো ।।

২৫ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে নজরুল একাডেমীর সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের নাম এবং পরিচয়ের কথা বলে ভোট চাওয়ার সুযোগ নিতে চাওয়াটা আমার কাছে অনর্থক মনে হয়েছিল। কারণ, ফলাফল কী হবে সেটা আমি জানতাম। কেননা, অনেকের কাছেই শুনেছিলাম, সদস্যদের সিংহভাগটাই সাধারণ সম্পাদক সাহেবের এখতিয়ারে। সামান্য কিছু সদস্য থাকতে পারেন কোষাধ্যক্ষ সাহেবের এখতিয়ারে। কিন্তু এরা উভয়েই যে চাইছিলেন না আমি নজরুল

www.pathagar.com

একাডেমীতে থাকি সেটা আমার কাছে অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল। তাই কোনো সময়েই কারো কাছে অযথা ভোট চাওয়ার কাজটা আর করিনি।

তাই আমার 'নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা' বইটা নজরুল একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য সাধারণ সম্পাদক সাহেবের হাতে দিয়ে কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গেই সৌজন্যমূলক আলাপ করে পরিস্থিতি বুঝে নিজের ভোটটা কেবল নিজেকে দিয়ে চলে এসেছিলাম।

কেননা, আমি তো কারো প্যানেলের লোক নই!

আমি তো কেবল নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মের পক্ষের লোক। আর কাজকর্ম কত কী যে করার আছে সে বিষয়ে নজরুল একাডেমী পত্রিকায় আমিই লিখেছিলাম। আরো কাউকে কাউকে দিয়ে লিখিয়েও ছিলাম। আমার এই নিঃসঙ্গতা, এই একাকীত্বটা এমনই যে, ভোটের ফলাফল কী হবে সেটা জানতাম বলেই ভোট গণনার সময়েও উপস্থিত থাকিনি। কোথায় কী কারণে সেটা জানতাম বলেই, আগের নির্বাহী পরিষদ থেকে যে ৫ জন সদস্য মনোনীত করা হবে, কোন্ ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং এরপর কোন্ ৫ জনকে কো-অপট্ করা হবে, এবং কাজ কী হবে না হবে এসবই তো নির্ধারণ করেন সাধারণ সম্পাদক সাহেব। ওখানে নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের টীম ওয়ার্ক বলতে যা বোঝায় সে রকম কোনও কিছুই গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। এজন্য দায়-দায়িত্ব কেবল সাধারণ সম্পাদক সাহেবের একার ওপর বর্তায় না। অন্তত প্রকাশনার কাজকর্ম যে সময়টুকুতে হয়েছে সে সময়টুকুতেও লক্ষ্য করেছি, কেবল নির্বাহী পরিষদের সভায় নয়, গবেষণা ও প্রকাশনা সাব-কমিটিতেও অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। এর কারণটা যে গভীরে নিহিত সেটা এই যে, নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য নজরুলবিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্ম করার কোনো প্রমাণ থাকার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি সে প্রয়োজন নজরুল একাডেমী নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং কর্মকর্তা হওয়ার জন্যও হয় না। ফলে নজরুলের বইপত্র এবং নজরুল জীবন ও সৃষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন দিকের জরুরি এবং অপরিহার্য কাজকর্মগুলোর বিষয়েও নির্বিঘ্নে উদাসীন থাকা যায়। নজরুল বিষয়ক যাঁরা গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর রফিকুল ইসলামের নাম এবং আমার নাম ছাড়া আর কারো নাম নজরুল একাডেমীর সাধারণ সদস্যদের তালিকায়ও নেই। অথচ নজরুল বিষয়ক কোনো গঠনমূলক কাজকর্ম করেন না, গঠনমূলক কাজকর্ম যাতে হয়, সে বিষয়েও যাদের উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় না সেই সব লোকেরাও যে অনেকেই একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সদস্য হন এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের নাম যুক্ত থাকার ব্যাপারটা অনেকেই স্রেফ কেবলমাত্র তাদের সামাজিক মর্যাদার বিষয় বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

।। চৌদ্দ ।।

নজরুল ইন্সটিটিউটের এখানকার ট্রাস্টি বোর্ড এবং নজরুল একাডেমীর এখানকার নির্বাহী পরিষদের এই হতাশাজনক চিত্র তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনার্স এবং এমএ ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় উপযুক্ত মর্যাদায় নজরুল সাহিত্যকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে বারংবার লিখেও তো তেমন কোনো কাজ হয়নি!

তবু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচি সম্পর্কে যেমন উদাসীন থাকা যায় না, তেমনি উদাসীন থাকা যায় না নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কেও।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্ম যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য অনেক সীমাবদ্ধতার কারণে গঠনমূলক কাজকর্মগুলোর জরুরী ও অপরিহার্য অনেক কিছুই কারো পক্ষেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা সম্ভব নয়। তদুপরি সরকারি ও বেসরকারি নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরুল বিষয়ক জরুরি ও অপরিহার্য গঠনমূলক কাজকর্মগুলো করার সুযোগ সৃষ্টির কথা, নজরুলবিষয়ক যারা গঠনমূলক কাজকর্ম করেছেন তাদের পড়াশুনা, অভিজ্ঞতা এবং দিক-নির্দেশনা কাজে লাগানোর সংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার লেখার আবশ্যকতা আছে। এর মূল লক্ষ্য নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং গণমানুষকেও এ বিষয়ে সম্যক অবহিত করা। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এরকম একটা বিষয়ে লেখার অর্থ নিশ্চয়ই কারো প্রাইভেট লাইফে বা ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা নয়।

।। পনের ।।

কিন্তু নজরুল চর্চার বিষয়ে, নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মের অনেক কিছুতেই ক্রমাবনতির একটা মর্মান্তিক চিত্রও লক্ষ্য করা যায়।

সেই পরিবেশ পরিস্থিতির কথাটাই এখানে উল্লেখ করছি।

ছবিটা স্পষ্ট করার প্রয়োজনেই আমার নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটা কথা এখানে উল্লেখ করছি।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় আমার নজরুল বিষয়ক চারটে লেখা একক প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখাগুলোর খুব বড় করে বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছিল। একক প্রচ্ছদ নিবন্ধগুলো হলো যথাক্রমে 'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক' (২ জানুয়ারি ১৯৮২), 'রাজবন্দী কবি' (২৯ মে ১৯৮২), 'নজরুলের পরিচালনায় লাঙল' (২৫ আগস্ট ১৯৮৪), 'ঢাকায় নজরুল' (৩১ আগস্ট ১৯৮৫)। এই প্রচ্ছদ নিবন্ধগুলো ১৭ জুলাই ১৯৮৮-তে ঢাকার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত আমার "অজানা নজরুল" গ্রন্থে হুবহু আছে।

www.pathagar.com

'দেশ' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাগুলো অনেকের কাছে আছে, আমার কাছেও আছে। লক্ষ্য করলে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, আমি সেখানে মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে, কোনো মুসলমানকে পরমাণু পরিমাণও খাটো করে দেখাইনি। আমার লক্ষ্য ছিল বরং উপেক্ষিত একটা দিককেই তুলে ধরা। আমি কখনো কোনো কিছুর জন্য কোথাও কোনো কিছুই খাটো করে দেখাইনি, কোথাও হীনমন্যতার পরিচয় দিইনি। আমি নিজেকে কখন কোথাও ছোটো করিনি।

'বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী ও কবি সৈনিক' প্রকাশিত হওয়ার চার দিন পর কলকাতার দৈনিক আজকাল পত্রিকায় নিবন্ধটির রিভ্যু ছাপা হয়েছিল। এর পর একদিন একক প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'রাজবন্দী কবি'র রঙিন বিজ্ঞাপন আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপার জন্য দেওয়ার আগে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয় বলেছিলেন, "আপনাকে বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবো।"

'দেশ' পত্রিকায় যার লেখা সাধারণভাবেও ছাপা হয়, প্রতিবেশী সমাজের গুণীজনরা তাকে জাতে ওঠা লেখক বলে মনে করেন।

এই কথাটা আমি একটা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গেই উল্লেখ করলাম।

।। ষোল ।।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে শুরু হয় আমার সাংবাদিক জীবন। নিয়োগপত্র মোতাবেক ১৯৭২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা (জেনারেল অ্যামনেস্টি), গঠনতন্ত্র (সংবিধান), বাণিজ্যনীতি, এরকম দু'একটা বিষয়ে সম্পাদকীয় এবং শিক্ষানীতির মতো দু'একটা বিষয়ে উপ-সম্পাদকীয় উক্ত জাতীয় দৈনিকে লেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

সুমন্ত ছদ্মনামে 'বৈদেশিকী' কলামটা এক সময় আমিই লিখতাম।

যে বছর যে মাসে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেই ১৯৮৬ সালের জুন মাসে (সম্ভবত) ৬ তারিখে 'শেরে বাংলা ও কবি সৈনিক' শিরোনামে আমার একটা নিবন্ধ ছাপা হয়েছিলো উক্ত জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য পৃষ্ঠায় দু'পাতায় ১৬ কলামের মধ্যে ১৪ কলামে।

এই একই জাতীয় দৈনিকে একই সাহিত্য সম্পাদকের হাত দিয়ে গত ২০ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ শুক্রবার পত্রিকায় আমার লেখা "নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা" শিরোনামে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে স্ট্যাম্প সাইজে এবং গ্রন্থটির রিভ্যু ছাপা হয়েছে কনডেন্সড্ টাইপে এত ছোটো করে যে, অনেকের পক্ষেই হয়তো পড়া সম্ভব হবে না।

১৭ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে আর একটি জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য পৃষ্ঠায়ও উক্ত গ্রন্থটির রিভ্যু ছাপা হয়েছে কনডেন্সড্ টাইপে প্রায় অপাঠ্য করে। এবং প্রচ্ছদটি ছাপা হয়েছে অর্ধেক। প্রচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত ওপরের অংশে নজরুলের সুস্থাবস্থার ছবিটা ছাপা

www.pathagar.com

হয়েছে, প্রচ্ছদের নিম্নাংশে নজরুলের অসুস্থাবস্থার ছবিটা ছাপা হয়নি। প্রচ্ছদে লেখকের যে নাম ছিল সেটাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

এভাবে প্রায় সবখানেই নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। এই সব কিছুর পেছনে নজরুল চর্চাকে সঙ্কুচিত করে দেওয়ার কোনো একটা যোগাযোগ যে কোনোখান থেকে হোক কাজ করছে।

।। সতের ।।

গত ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমাদের সমাজের একজন অত্যন্ত নামকরা লোক একদিন আমাকে বললেন যে, তিনি ১৬ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে নজরুল ইন্সটিটিউটে নজরুলের স্বাধীনতা চিন্তার ওপর ভাষণ দেওয়ার দাওয়াত পেয়েছেন।

এজন্য তিনি আমাকে কিছু পয়েন্টস লিখে দিতে বললেন।

তার মুখ দিয়ে কিছু সঠিক এবং প্রয়োজনীয় কথা উচ্চারিত হোক, এই লক্ষ্যে কিছু পয়েন্টস্ আমি এক এক করে লিপিবদ্ধ করলাম।

এভাবে লিখতে লিখতে ফুল স্কেপ কাগজের সাত পৃষ্ঠা হয়ে গেলো।

তার হাতে দিলাম।

সংখ্যাগুলো তুলে দিলে ওটা একটা ছোটো-খাটো নিবন্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু বিষয়টা উল্লেখ করার লক্ষ্য কিন্তু এটা নয়। আমার এই উল্লেখের লক্ষ্যটা হলো এই যে, নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা যদি এই ধরনের প্রভাবশালী লোক-জনদেরকে নিয়ে নজরুল গবেষকদের আসনগুলো পূরণ করে দেন তাহলে নজরুল বিষয়ে যারা যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাদের মূল্যায়ন হবে কী করে?

নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে কোনো কোনো কর্মকর্তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অতিরিক্ত সুবিধাভোগী হওয়ার জন্য সমাজের এরকম কোনো কোনো ব্যক্তিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কিংবা ট্রাস্টি বোর্ডের অথবা নির্বাহী পরিষদের সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানান তাদেরকে একটা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষায় এবং যারা নজরুল বিষয়ে যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগ পাওয়ার মানসিকতায়।

যাঁরা নজরুল বিষয়ে যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাঁদের লেখা যে কোনো কোনো জাতীয় দৈনিকে অত্যন্ত অমর্যাদার সাথে ছাপা হয়, যাতে কেউ পড়তে না পারে, কিংবা যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে সেভাবে ছাপা হয়। সেটাও করা হচ্ছে কোন শক্তির ইঙ্গিতে খোদ নজরুল চর্চাকেই সঙ্কুচিত করে রাখার লক্ষ্যেই।

www.pathagar.com

।। আঠার ।।

গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি বহুল প্রচলিত জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য বিভাগের একজন সহযোগী ভদ্রলোক একটা গ্রন্থের রিভ্যু প্রকাশের ব্যাপারে কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তার একজন সিনিয়র সহকর্মী তাকে নাকি বলেছেন, 'শেখ দরবার আলমকে তুলে আমাদের কী লাভ?'

তার এই উক্তিটি আসলে অন্য কারো, না তার নিজের সে কথা আমি জানতে চাইনি। আমার নিজের জেনে কোন লাভও নেই। জানতে চাওয়ার মতো মানসিকতাও আমার নেই।

তাই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও আমি করিনি!

আমাকে তুলে কারো লাভ নেই, এ রকম একটা কঠিন হিসেব-নিকেশ তো যে কেউ করতেই পারেন। কিন্তু নজরুলকে তুলে ধরার ব্যাপারটা?

ওটাও কি এখন লোকসানের?

কিংবা ব্যাপারটি কি এ রকমই যে, নজরুল বিষয়ক যিনি যথার্থই গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন, তাকেও তুলে ধরা যাবে না, তিনি নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন বলেই!

নজরুল বিষয়ক যথার্থ গঠনমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে কি এদের উৎসাহ আছে?

আসলে নজরুল বিষয়ক যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মগুলোকে যারা গুরুত্ব দিতে চান না, যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলো যারা করছেন তাদেরকেও খাটো করে দেখানোটা বা গুরুত্বহীন করে দেখানোটাও তাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ব্যাপকভাবে নজরুল চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই বিষয়টা প্রশাসন, সরকার এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির না দেখলে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হবে না। নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাদের মূল্যায়নের ব্যাপারটা এই বিষয়টার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আসলে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে, রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে প্রতিবেশী সমাজ যে রকম সচেতন, সেভাবে নজরুল চর্চার বিষয়ে আমাদের সমাজের কর্ণধাররা সচেতন না হলে সমস্যাটার কোনো সমাধান হবে না। নজরুল বিষয়ে যিনি যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্ম করবেন তার অবমূল্যায়ন হবে— তিনি নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন বলেই!

নজরুল বিষয়ক যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্মের ব্যাপারে কি এদের উৎসাহ আছে?

আসলে নজরুল বিষয়ক যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মগুলোকে যারা গুরুত্ব দিতে চান না, যথার্থ গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলো যাঁরা করছেন তাঁদেরকেও খাটো করে দেখানোটা বা গুরুত্বহীন করে দেখানোটাও তাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ব্যাপকভাবে নজরুল চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই বিষয়টা প্রশাসন, সরকার এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা না দেখলে নজরুল চর্চার এবং নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হবে না।

www.pathagar.com

নজরুল বিষয়ে যারা গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাদের যথার্থ মূল্যায়নের ব্যাপারটাও এই বিষয়টার সাথেই সংশ্লিষ্ট।

আসলে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে, রবীন্দ্রচর্চার বিষয়ে প্রতিবেশী সমাজ যে রকম সচেতন, সেভাবে নজরুল চর্চার বিষয়ে, নজরুল বিষয় গঠনমূলক কাজ-কর্মের বিষয়ে আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজের কর্ণধাররা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সচেতন না হলে এই সমস্যাটার সমাধান হবে না।

।। উনিশ ।।

যাঁরা নজরুল গবেষক, নজরুল বিশেষজ্ঞ, যাঁরা নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন, দল-মত নির্বিশেষে তাঁদের সবাইকেই নজরুল ইন্সটিটিউটের মতো নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডে এবং গবেষণামূলক কাজ-কর্ম পরিচালনার প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগের দায়-দায়িত্বে না রাখা হলে নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক জরুরি, অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলো যেভাবে যতখানি হওয়া দরকার, সেভাবে ততখানি হবে না। সেই একই কথা নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমীর ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার। নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করেননি, অথচ নজরুলভক্ত এবং নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মে উৎসাহী এমন কাউকে হয়তো নজরুল একাডেমীর মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে রাখা যেতে পারে, প্রচার বিভাগের দায়িত্বেও রাখা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দায়-দায়িত্বে নজরুল গবেষকদের যদি না রাখা হয় তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজকর্মগুলো যেমন হবে না, তেমনি গঠনমূলক কাজ-কর্ম করার সুযোগ এবং পরিবেশও থাকবে না, গঠনমূলক কাজ-কর্মের বিষয়ে কোনো আলোচনাও হবে না। যারা নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করেন না তাদের কাছে নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের কথাগুলো স্বভাবতই অবান্তর এবং বিরক্তিকরও মনে হতে পারে।

কার্যত সেটাই এখন হয়েছে।

প্রশাসন এবং সরকার এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ না করলে স্রেফ ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম না করা লোকরা নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ড এবং নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের আসনগুলো অযথা অলংকৃত করে থেকে খোদ নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্মের পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকবেন। নজরুল চর্চাকেন্দ্রিক কোন প্রতিষ্ঠানের আসন চর দখলের মানসিকতায় দখল করার সংস্থান যাতে না থাকে সে বন্দোবস্তও করতে হবে।

নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম হোক, এটা যারা চান না তাদের কাছে এ রকম একটা ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত হতে পারে, কিন্তু নজরুলভক্ত গণমানুষের কাছে এটা নিশ্চয়ই মনে হবে একটা বিপর্যয়কর ব্যাপার। কার্যত সেটাই হয়েছে এখন। তা না হলে যারা নজরুল জীবন ও সৃষ্টিবিষয়ক গঠনমূলক কাজ-কর্ম করছেন তাঁদের প্রায় সবাইকেই এই প্রতিষ্ঠান দুটো থেকে কীভাবে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে?

www.pathagar.com

কেবল একটা ক্লাবের অনুষ্ঠানের মতো একটা সুনির্দিষ্ট পলিসি, গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা ছাড়া একটা নাচ, গান এবং বক্তৃতার অনুষ্ঠানও করা নজরুল ইন্সটিটিউট এবং নজরুল একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার সঙ্গে যে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেটাও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংরক্ষণের কাজ, প্রকাশনার কাজ, এসব জরুরি ও অপরিহার্য কাজগুলো এখন উপেক্ষিত হচ্ছে কেন এসব ভেবে দেখতে হবে।

এই ধরনের কথাবার্তাগুলো অবান্তর এবং বিরক্তিকর মনে হলে নজরুল বিষয়ে গঠনমূলক কাজ-কর্মগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অজস্র হাতে হোক এটা যাঁরা চান, তাঁদেরকে হয়তো নানান কৌশলে এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে; কিন্তু যাঁর নামে এই সব প্রতিষ্ঠান, সেই খোদ নজরুলের বিষয়ে গঠনমূলক কাজকর্মগুলো, জরুরি ও অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো আর হবে না!

নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর দু'জন লোক আছেন এটা বলা হলেও আমার জানা ছিল না এবং আজো জানা নেই সে দু'জন লোক কারা? নজরুল একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সবাই যখন নির্দল নন, কেউ কেউ যখন কোন কোনো রাজনৈতিক দলের লোক, এখন জামায়াতে ইসলামেরও কেউ কেউ থাকলে তাকে নীতিগতভাবে আপত্তি থাকারও তো কোন কারণ থাকে না। তদুপরি এরকম কেউ ছিলেন বা আছেন বলেও জানি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রথম নজরুল একাডেমীর কোন সভায় শোনা গেল যে, দু'জন লোক কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে কথা উঠেছে।

এর বছর দুয়েক আগে কবির জন্মদিনে তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে উক্ত কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন, নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক সাহেব নাকি বলেছেন যে, আমি ইসলামপন্থী এবং এ কারণেই নাকি আমাকে কার্যত দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমার সম্পর্কে ওই একই কথা ওঁরা নজরুল গবেষক ডক্টর বাঁধন সেনগুপ্ত এবং ডক্টর শিশির করকেও বলেছেন। অথচ ওই উভয় নজরুল গবেষককে নিয়ে কলকাতায় নানান প্রেক্ষাগৃহে আমি নজরুল বিষয়ক অনেক অনুষ্ঠানাদি করেছি। আমার স্বধর্মীদের কারও কারও কথাবার্তা ওঁদের কাছেও মনে হয়েছে যে, অন্তত পঁচিশ বছর আগে থেকেই তাঁরা যখন আমাকে চেনেন তখন তাঁদের কাছে এভাবে আমার এই পরিচয় দেয়া কেন? তাঁরা আমাকে বলেছেনও সে কথা।

আমাদের স্বধর্মীদের কেউ কেউ যে কতখানি হীনম্মন্যতা, অসূয়াপ্রবণতা এবং আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনায় ভোগেন, এটা যেমন তারই একটা দৃষ্টান্ত, তেমনি ও ধরনের শ্লোগানের পেছনে নজরুল বিষয়ক কাজকর্মের বিষয়ে তাদের আন্তরিকতাহীনতার, লুটপাটের এবং চরদখলের মানসিকতাও কাজ করে।

আসলে নজরুলের মতোই আমি আল্লাহর বান্দা এবং নবীর উম্মত, যথার্থ সাম্য ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মুসলমান, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভাষা, অঞ্চল ও ধর্মভিত্তিক যে বিভাজন যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষকে, এমনকি কোন নাস্তিক্যকেও যদি তার মানবাধিকার থেকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত করে সেটা আমি আমার নিজের মানসিকতার দিক দিয়ে কোনোদিন অনুমোদন করিনি।

আমি আমার পিছিয়ে পড়া সমাজ এবং সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সমাজ এবং সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাকার কারণেই। প্রতিবেশী কোনো সমাজ এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার সমাজ এবং সম্প্রদায়ের সম্পর্কটা যাতে প্রভু-ভৃত্যের না হয়, যাতে সমানে সমানে হয়, সৌহার্দ্যের, সাম্যের এবং সহাবস্থানের হয়, সেই সুস্পষ্ট লক্ষ্যেই আমি কাজ করি। কোন শ্লোগান বা উন্মত্ততার ভিত্তিতে নয়, একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসাবে আমি স্পষ্টতই এই তাত্ত্বিক চিন্তাকাঠামোর মধ্যে কাজ করি, যেটা পূর্বাপর মেনে চলেছেন স্বয়ং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভাজন সৃষ্টি করে কার্যত নজরুল চর্চার ক্ষেত্রেই অন্তরায় সৃষ্টি করার একটি উদ্যোগ লক্ষ্য করেছিলাম খোদ নজরুল ইন্সটিটিউটে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কমিটি গঠন করার সময়। পঁয়ত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির জায়গায় একশ' এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করার সময় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক সাহেবদের নামও যখন অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন আমি দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক সাহবের নামও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলি। কেননা, নজরুল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি লেখালেখি হয় এই জাতীয় দৈনিকটিতেই। দেখলাম, কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য এই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন। দেখলাম দৈনিক ইনকিলাবে যারা লেখেন এবং এই কাগজে ঘন ঘন যাদের ছবি ছাপা হয় তাদেরও কেউ আমার এই প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন না।

পরে তাদেরই কেউ আমাদের এক সাংবাদিক সহকর্মীকে নাকি বলেছেন, তিনিই নাকি প্রস্তাবটি তুলেছিলেন এবং আমি নীরব ছিলাম।

দেখলাম কাগজের সম্পাদক সাহেবের কাছে একটা মিটিঙে বিষয়টা এভাবেই পেশ করা হয়েছে। তিনি হয়তো যেভাবে শুনেছেন সেভাবেই বলেছেন।

কিন্তু ইতোপূর্বে নজরুল ইনস্টিটিউটের মিটিঙে সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ মিটিঙের পরেও আমাকে বলেছেন, 'এটা তো ঠিকই যে, দৈনিক ইনকিলাবেই নজরুল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা ছাপা হয়।'

কিন্তু সভামধ্যে তারা এ কথাটা যে বলেননি, তার কারণ সম্ভবত এই যে, একথা বলে তারা কারও বিরাগভাজনও হতে চাননি। কেননা, সত্য কথা বলে বিরাগভাজন হয়ে এখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কারও পক্ষেই সুযোগ-সুবিধা এবং প্রচার পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু খোদ নজরুল চর্চার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে এই অন্তরায়গুলো দূর করতে পারেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন এবং সমাজের আরো নানান ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ।

নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষত ১৯৯৬-এর পর থেকে রাজনৈতিক শ্লোগান ব্যবহারের বিষয়টি সবচেয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

এই নিবন্ধটি ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখ সোমবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

নজরুল ঃ তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক চেতনা

আমরা এখন সাম্রাজ্যবাদের সেই স্বর্ণযুগে পৌছে গেছি, যখন যুদ্ধই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যবসা এবং মজলুম মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী তৎপরতা। আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এবং সহাবস্থানভিত্তিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হলো একটা ঘৃণ্য মৌলবাদ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। তিনি আমাদের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক আঙ্গিনায় অবদানও রেখেছেন সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলেই। মূলত এই সময়কার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে, কুসংস্কার ও বাক্-স্বাধীনতাহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই তিনি 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর চারেকের মধ্যেই লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যখন তার স্বধর্মী এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের গুণীজনদের সম্পাদনায় বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হল সেই তখন থেকেই তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবেই মূলত পরিচিত হলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছর মাত্র। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি খ্যাত হলেন জাতীয় কবি হিসেবে।

কবি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাটা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। কবির পূর্ব পুরুষেরা এই উপমহাদেশে এসেছিলেন আরবের বাগদাদ থেকে, যে বাগদাদ এখন ইঙ্গ-মার্কিন বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে।

এই উপমহাদেশে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায় বসতি স্থাপনের অব্যবহিত আগে তাঁর পূর্ব পুরুষদের বসতি ছিল বিহারের পাটনায়।

মুঘল শাসনামলে তাঁর পূর্ব পুরুষরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুঘল শাসকদের কাছ থেকে এ জন্য তাঁর পূর্ব পুরুষরা আয়মা সম্পত্তি পেয়েছিলেন সে সময়েই।

মুঘল শাসনামলে পাওয়া তাঁদের বনেদি কাজী পরিবারের এই জায়গা-সম্পত্তি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কেড়ে নিলে এই পরিবার ক্রমে আর্থিক দিক দিয়ে দারিদ্র্যকবলিত হয়ে পড়ে।

বংশানুক্রমে তাঁর পরিবার ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধ প্রহসনের পর থেকে অত্যন্ত তীব্র ও গভীরভাবে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও সমস্যাদি সয়ে এসেছেন। তদুপরি তাঁর শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে স্বগ্রাম চুরুলিয়া বারবার বন্যাকবলিত হয়েছে। মূলত এ কারণেই বাল্যকালেই তাঁকে নিজ ঘর ছেড়ে নানান জায়গায় রুজি-রোজগার করে বিভিন্ন স্কুলে তাঁর পড়ার খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬-য় নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীর বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীতে তাঁর এই প্রশিক্ষণ উপমহাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে কেবল নয়, নিজের জীবিকার প্রয়োজনে না হোক, পরিবারেরও আর্থিক প্রয়োজনে। স্কুল জীবনেই পরিবারের লোকদের জন্য রুজি-রোজগারের প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর।

সেনাবাহিনীতে থাকতেই নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। সেটা মূলত দারিদ্র্যকে গভীরভাবে উপলব্ধির কারণেই।

ঊনিশ'শ বিশের গোড়ার দিকে কবি সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফেরার পর পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়েও ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি আদর্শ করেননি। তিনি আদর্শ করেছিলেন প্রাচ্য সাহিত্যকে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে।

এটা তাঁর তরফে কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা নয়, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধিতা।

এর স্বরূপটা বুঝতে হলে গণমানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মুসলিম শাসনামলে কেমনটা ছিল, আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কোন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা উপলব্ধি করতে হবে। ধনতন্ত্র, শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী সমাজ ক্রমে আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আঙিনায় কেমন সমস্যা সৃষ্টি করে সেটা বুঝতে হবে।

১৮ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত "অতি ইচ্ছার সংকট" শিরোনামে এক নিবন্ধে 'দেশ' পত্রিকায় দিল্লীর ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ভাইস চেয়ারপার্সন শুভেন্দু গুপ্ত সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পরিস্থিতির ক্রমাবনতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অসামান্য প্রতিভাদীপন আর বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আজ একুশ শতকে সদ্য পা ফেলে দেখছি, বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষ অনশনক্লিষ্ট, দারিদ্র্যপীড়িত, ক্ষুধার্ত। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ আরও দুস্তর হয়ে উঠেছে।"

উপমহাদেশে অর্থনৈতিক সুবিচারের ব্যাপারটা মুসলিম শাসনামলে ছিল। তদুপরি মুসলিম শাসনামলে ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থান। কিন্তু বৈষম্যের ব্যাপারটা এলো ১৭৫৭-য় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে। শুভেন্দু গুপ্ত তাঁর উক্ত নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

১৭৫০ সালে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় সমান সমান। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উন্নত দেশগুলোর মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ালো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের চার গুণ। আশির দশকে হ'লো সাত গুণ। ১৯৮৭-তে এক হিসাবে দেখা গিয়েছিল বিশ্বের জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী এক-পঞ্চমাংশ ভোগ করে পৃথিবীর মোটা জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮৩ ভাগ। এই অঙ্ক ১৯৯১-৬-এ বেড়ে হয় শতকরা ৮৪.২ ভাগ। সেই সময়ে বিশ্বের দরিদ্রতম

www.pathagar.com

এক-পঞ্চমাংশের ভাগে জুটেছে যথাক্রমে শতকরা ১.৪, শতকরা ০.৯ ভাগ। কী করে আমরা এই অমার্জনীয় পরিস্থিতি বদলাব?

"গত একশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের বিকাশ ক্রমশ হয়ে উঠেছে বৈষম্যময়, পক্ষপাতদুষ্ট, ছায়াচ্ছন্ন। তা জন্ম দিয়েছে এক অদ্ভুত আঁধারের। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, সহমর্মিতা, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঁচার যে প্রসন্নতা অর্থাৎ যে বিশ্বাস এই নিখিল ভুবনে সকলের সুস্থতা, হৃদয়ের কিরণ দাবি করে— তা এই অদ্ভুত আঁধারে ক্রমশ মর্যাদা হারিয়ে পাণ্ডুর থেকে পাণ্ডুরতর হয়ে উঠেছে।"

"পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নতি ও প্রাচুর্য আর তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রায়ন একই প্রক্রিয়ার দু'টি দিক। অস্বীকার করা যায় না, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের এই প্রাচুর্য ও তার আবহমানতার পথ মসৃণ রাখা সম্ভব হয়েছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পদ ছলে-বলে-কৌশলে আত্মসাৎ করে।"

"পৃথিবীতে ভালভাবে লালিত কয়েকটি জাতির কিছু মানুষের ভাল থাকার, রিরংসারক্তিম হয়ে থাকার প্রয়াস পৃথিবীর অন্য অংশে খরা, মরু প্রসার ও অরণ্যের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে।...

"উন্নত ও উন্নয়শীল দেশে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের মেরুকরণ অচিরেই উভয় দেশের বিপর্যয় ডেকে আনবে। একের মৃত্যু ঘটবে রোগ-দারিদ্র্যে, অনশনে, ক্ষুধায়, অশিক্ষায়— বাঁচার পক্ষে ন্যূনতম সম্পদের অভাবে। আর অন্যের হবে প্রাচুর্যের মৃত্যুবীজে। রোজ রোজ ভুরিভোজ আর ভোগবাদী জীবনযাত্রা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের শতকরা ৪০ জনের মেদ বৃদ্ধিজনিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রকাশ ঘটেছে হৃদরোগ, রুক্তচাপ বৃদ্ধি এবং ডায়াবেটিসে।

"ভাবতে পরিতাপ হয়, পশ্চিমী সভ্যতার কলুষ দিকগুলোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কুপ্রথাগুলোও কি অনায়াস আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে।...

"পশ্চিমের প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন ও তার সঙ্গে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা আমাদের তৃতীয় বিশ্বে বৈষম্য কমানো দূরে থাক, তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। ফলে আমাদের দেশ মূলত দুটি সমাজে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এর একদিকে রয়েছে অল্পসংখ্যক সম্পদশালী, ভোগপ্রবণ, বিত্তসচেতন গোষ্ঠী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মোড়লেরা— যারা পশ্চিমের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণকেই অভীষ্ট ভাবছে, অন্যদিকে রয়েছে বিপুলসংখ্যক দরিদ্র মানুষ, যারা কর্মহীন থাকায় উৎপাদন ও ভোগবৃত্তের বাইরে দারিদ্র্যসীমার নিচে কোনওভাবে টিকে আছে। দেশের অর্ধেকেরও বেশি দাস, অধিকাংশই জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত।"

শুভেন্দু গুপ্তের দেওয়া এই বিবরণের পাশাপাশি ৫ এপ্রিল ১৯৪১ (২২ চৈত্র, ১৩৪৭ ঃ ৭ রবিউল আউয়াল ১৩৬০) তারিখ শনিবার অন্নপূর্ণা পূজার দিন এবং এর পরদিন ৬ এপ্রিল, ১৯৪১ তারিখ রবিবার কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে জাতীয়

www.pathagar.com

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের শেষ দিককার অভিভাষণে বলেন,

"যদি আর বাঁশী না বাজে— আমি কবি বলে বলছিনে— আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি- আমায় ক্ষমা করবেন— আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি— আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম— সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

"হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে— এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম— আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।"

লক্ষণীয় যে, নজরুল ইসলাম তাঁর অভিভাষণের উদ্ধৃত স্তবক দুটির প্রথম অংশে বলেছেন যে, মানুষকে তিনি ভালোবাসতে এবং মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি ভালোবাসলেও সে ভালোবাসা তিনি পাননি 'এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে'। কিন্তু পৃথিবীটা 'প্রেমহীন নীরস' হলো কেন? এর জবাবটা কবি দিয়েছেন দ্বিতীয় স্তবকে, যেখানে তিনি এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন শ্রেণী সমাজের এবং শ্রেণী বৈষম্যের কথা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানির কথা এবং অর্থনৈতিক শোষণজাত সাম্প্রদায়িকতার কথা।

নজরুলের মূল লক্ষ্যটা কী সেটা এ থেকে বোঝা গেল। তিনি রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিক এ কারণেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের ১২ জুলাই রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের চুক্তি হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে নজরুল কোনোদিন আপোসের দৃষ্টিতে দেখেননি।

রাজনীতি নজরুলের কাছে ছিল ব্যবসা নয়, পেশাও নয়, একান্তই সেবা। বাস্তব প্রয়োজনে তাঁকে যা-ই বলতে হোক কিংবা লিখতে হোক না কেন, নজরুলের চেতনায় সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে তাহলে কী ছিল?

এর জবাব রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়েই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দিয়েছেন ১১ আগস্ট ১৯২৬ তারিখ সকালে কৃষ্ণনগর থেকে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে লেখা চিঠিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ।"

১৯২৬-এর ১১ আগস্ট বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে চিঠিতে যে নজরুল লিখেছেন, তাঁর চিন্তা ও চেতনার মোট ষোল আনা জায়গার মধ্যে পনেরো আনা

www.pathagar.com

জায়গা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর এবং সৃষ্টির ব্যথায় ব্যাকুল, সেই কবিই এর পনেরো বছর পর ৬ এপ্রিল ১৯৪১ তারিখ রবিবার কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণে বললেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন জাতিতে জাতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিগ্রহ ও শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণী সমাজ ও শ্রেণী সমাজের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

সক্রিয় রাজনীতিতে চরম ব্যস্ত থাকার সময় পনেরো বছর আগে তিনি লিখলেন যে, তাঁর অন্তরের মোট ষোল আনা জায়গার মধ্যে পনেরো আনা জায়গা সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় কাতর, ব্যথামগ্ন; আর অন্যদিকে মাত্র এক আনা জায়গা জুড়ে আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের অনুসঙ্গ হিসেবে এসেছে যে সাম্প্রদায়িকতা, সেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের রাজনীতি। সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে আসার প্রায় বারো বছর বা এক যুগ পর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই তাঁর আসল এবং একমাত্র লক্ষ্য বলে অভিহিত করছেন। কারণ, সব সমস্যারই আকর হলো ধন বৈষম্য, শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী সমাজ। কেননা, শ্রেণী সমাজে ভালোবাসা, সততা, নৈতিকতা ও গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা ঠাঁই পায় না। কোনো গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা, এমনকি ধর্মীয় আদর্শ ও মূলবোধও ঠাঁই পায় না। অতএব বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদকে চিঠি লেখার পনেরো বছর পর যখন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসেছেন তখন সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকেই, ধন বৈষম্যটাকেই তিনি এক আনার জায়গায় পনেরো আনা নয়, ষোল আনা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পার্টির সার্বভৌমত্বকেন্দ্রিক কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রও যে ব্যর্থ হবে সেটাও তিনি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সুস্থাবস্থার শেষের দিকে, ঊনিশ'শ একচল্লিশ-বিয়াল্লিশে তাঁর নানান লেখায় দেখা যায়, কেবল ইহকাল নয়, পরকালের চিন্তাটাও মাথায় রেখে একমেবাদ্বিতীয়ম আল্লাহকে সার্বভৌম জ্ঞান করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য কায়েম করার কথা বলেছেন।

তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তা স্বীকার করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন ধনতন্ত্রের অবসান আর বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের সুস্পষ্ট কর্মসূচিই কেবল সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে পারে। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-বঞ্চনার শিকারে পরিণত হওয়ার পর মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিচর্চার কী দশা হয়েছে সেটাও যে তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সে প্রমাণও তিনি সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং শিল্পের নানান আঙিনায় রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীতে তাঁর স্বধর্মীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সবটুকুই উঠে এসেছে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা, সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎসমুখটা কী সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎসমুখ হলো সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্র।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বিপান চন্দ্র উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতার ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার সেই কাজটা প্রকাশিতও হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল থেকে শুরু করে খোদ গ্রেট ব্রিটেনের সরকারের ঔপনিবেশিক শাসনামল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ সৃষ্টি করার এবং তা জিইয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে অনেক সরকারি নথিপত্রের উদ্ধৃতিও গ্রন্থটিতে আছে। এ রকম তথ্যাদি আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

নজরুল সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতিকে এবং সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারটিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি।

নজরুল যে তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে চলচ্চিত্রে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অজস্র পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাদানাদি ব্যবহার করেছেন এবং অনুরূপভাবে সহাবস্থানের নীতিতে স্বধর্মীদেরও ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ রূপটা তুলে ধরেছেন, এর সুদূরপ্রসারী একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, তাঁর ধনতন্ত্র বিরোধিতা।

সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে, নিজের জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে চায়, কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে ভাষাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, গোত্রভিত্তিক বিভাজন তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন সুবিধার জন্য সৃষ্টি করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশকে অখণ্ড রাখার জন্য নৃশংস গৃহযুদ্ধ চালিয়েছে, কিন্তু সেই দেশটিই এখন ইরাককে শিয়া অঞ্চলে, সুন্নী অঞ্চলে এবং কুর্দী অঞ্চলে ভাগ করতে চায়।

নজরুল জীবন ও সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি, ভাষা, অঞ্চল, গোত্র ইত্যাদির সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন আন্তর্জাতিকতায়।

আমাদের যে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার কথা, আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সহাবস্থান চিন্তার কথা নজরুল বলেছেন সেটা অনুসরণ করলে আমাদের এই এখনকার দশা হতো না।

www.pathagar.com

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা ঃ জাতীয় কবির দৃষ্টিতে

এটা জ্যৈষ্ঠ মাস। ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে ১৮৯৯) তারিখে নজরুলের জন্ম। গতকাল গেলো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন।

আমরা ইতোমধ্যে আর এক নতুন পৃথিবীতে এসে পৌছেছি। আমরা আবার পৌছে গেছি সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগে। বিশ্বের সম্পদহীন, ক্ষমতাহীন গণমানুষ আবার দেখছে 'জোর যার মুল্লুক তার' হয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ এতদিনে ক্ষমতাবানদের হাতে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহৃত হতে হতে এখন উন্মুক্ত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদের সিংহভাগটাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভোগে আসে, চিরস্থায়ীভাবে তাদের সেই ভোগের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনে পৃথিবীকে আবার তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগে পৌছে দিয়েছে। সহায়সম্বলহীন গণমানুষ এ ক্ষেত্রে অসহায়। এই জাতিসঙ্ঘ, সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অনেক কথাই নজরুলের লেখায় আছে।

কেবল শ্রেণী সমাজের বা শ্রেণী বৈষম্যের সমস্যা নয়, এক সময়কার একটা শ্রেষ্ঠ জাতির অধঃপতনেরও সমস্যা এটা।

নজরুল এক সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন ঃ

'নাই তাজ তাই লাজ/ ওরে মুসলিম তোরা খর্জুর শীষে সাজ।'

ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে মুসলমানদের সেই ঐক্য ও সংহতি বহুদিন হ'লো আর ফিরে আসেনি। না আসার অনেক কারণই আছে। এর একটা বড় কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থা ভুলে কিংবা অস্বীকার করে অথবা খর্ব করে দেখে অন্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থা বা অন্যের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ঐক্য ও সংহতি আনা যায় না।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদেরকে নানান দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেটা হিন্দু ও মুসলমান, উপমহাদেশের এই দুটো জাতির ওপরও যে কীরকম বিরূপ প্রভাব ফেলেছে সে উল্লেখটাও নজরুল করেছেন এভাবে ঃ

"ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে এই যে, তার শিক্ষাদীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, কৃষাণ, মজুরদের আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া।...

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যতার ইতিহাস

www.pathagar.com

ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে- ও শুধু কাহিনী। হয়তো এক দিন ছিল যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করতো না। তখন রাজভাষা— State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন— এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তারা মুসলমানদের বিশ্ব সভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা কোন মুসলমান নওয়াব-বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেনি। শিবাজী প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে, Person-এর Against-এ— গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।...

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না; অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতোই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী।... কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরখা মুক্ত হ'লো না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব অন্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেয়ার অধিকার আমাদের নেই।... কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গিন উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করে ফেলেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।'

খোদ নজরুলের বক্তব্য, নজরুলের উক্তিটা কী ছিল, কীভাবে ছিল সেটা হুবহু পেশ করার জন্য আমি একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

জানুয়ারি ১৯২৯ (পৌষ-মাঘ ১৩৩৫ ঃ রজব-শাবান ১৩৪৭)-এ চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে অভিভাষণ দেন উদ্ধৃতিটি তারই একটা অংশ।

"মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা" শিরোনামে এই ভাষণে কবি এর আগে এক জায়গায় বলেছেন,

"আপনাদের শিক্ষা সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাঙলার সমগ্র মুসলিম সমাজের, বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,— আমি যে মহান স্বপ্ন দিবারাত্রি ধরে দেখেছি, তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই, তা নয়। এই স্বপ্ন বাঙলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।...

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান— আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করবো না— ঋণদানও করবো, আমরাও আমাদের দানে জগৎকে ঋণী করবো— এই হোক আমাদের চরম

www.pathagar.com

সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্যপানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করবো। আজ আমাদের হাত উপুড় করার দিন এসেছে। তা যদি না পারি, সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন— আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি-আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক— ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শামশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে— এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওয়াতের, আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকীর মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণ ধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলবো এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলবো মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি— শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে— তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে।..."

প্রভু-ভৃত্যে যে সৌহার্দ্য হয় না, সম্প্রীতি হয় না, সহাবস্থান হয় না; বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, সহাবস্থান— এসব যে হয় কেবল সমানে সমানে, এই কঠিন বাস্তবতার কথাটাই নজরুল এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সংস্কৃতি কী, আমাদের সাংস্কৃতিক আঙিনার মনীষী কারা, আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় কোন্ কোন্ ভাষায় কোথায় বন্দী হয়ে আছে, শান্তি নিকেতন যে প্রতিবেশী সমাজের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির পীঠস্থান, মুসলমানদের জন্য যে অনুরূপ পীঠস্থান আমাদের তৈরি করতে হবে, এসব কথা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

তিনি বুঝেছিলেন, মক্কার যে শরীফ হোসেনদেরকে লরেন্স অব্ আরাবিয়া আরবী ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে এবং আত্মকেন্দ্রিক ক্ষমতালিপ্সায় মাতাল করে তুর্কী ভাষী খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তুর্কী খেলাফতের, অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে পারে এবং তামাম আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলকে অনেকগুলো ছোটো

www.pathagar.com

ছোটো তথাকথিত জাতি-রাষ্ট্রে ভাগ করে সেখানে তাদের সহযোগী, অনুগত, বশংবদ লোকদেরকে সহযোগী হিসাবে বসিয়ে দেয়ার পর ইহুদী-খ্রিস্টানরা যেমন মুসলমানদেরকে আর শ্রদ্ধা করে না, চাকর-বাকর হিসাবেই দেখে, তেমনি ইতোপূর্বেকার পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধ প্রহসনের পর উপমহাদেশে ক্রমে নানান দিক দিয়ে অধঃপতিত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং হীনবল হয়ে যাওয়া মুসলমানদেরকে দেখে, বিশেষত নানান দিক দিয়ে, বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙলাভাষী মুসলমানদের যে চরম অধঃপতন ঘটেছে সেসব দেখে প্রতিবেশী বাঙলাভাষী হিন্দু বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে কেবল অশ্রদ্ধাই করতে শিখেছে। বিশেষত সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙলাভাষী মুসলমান কার্যত ক্রমে বাঙলাভাষী হিন্দুর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

এই অসহনীয় দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সে উল্লেখও নজরুল করেছেন।

তবে নজরুল ইসলাম যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের কথা বলেছেন, সেটা যে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে হওয়ার নয়, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরের দিক দিয়ে সমানে সমানে হওয়ার ফলে যে কেবল সেটা হয়, সেটা তাঁর বক্তব্যের ভাষা প্রয়োগের দিকটা লক্ষ্য করলেও বোঝা যায়।

ডিসেম্বর ১৯২৭-জানুয়ারি ১৯২৮ (পৌষ ১৩৩৪ঃ জমাদিউস সানি-রজব ১৩৪৬)-এর 'সওগাত'-এ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর 'চিঠির উত্তরে' কবি এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও জানি এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।"

১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ ঃ ১৩ রজব ১৩৪৮) তারিখ রবিবার কলকাতার এলবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সেই সংবর্ধনা সভায় সভাপতি বিজ্ঞানাচর্য শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ শেষে 'নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ'-র তরফে যে মানপত্রটি প্রদান করা হয়, সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলী সেই মানপত্রটি যখন পাঠ করে শোনালেন তখন এই অভিভাষণের উত্তরে 'প্রতিভাষণ'-এ কবি এক জাগায় বলেছিলেন ঃ

"কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কোনোটিই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে

www.pathagar.com

হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাট্‌তে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না।"

স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, হাতে হাত মেলানোর ব্যাপারটা প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে হওয়ার নয়, সমানে সমানে হওয়ার। নজরুল মুসলিম সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তাটা অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলমানদেরকে ভৃত্যের স্তর থেকে উন্নীত করার লক্ষ্যেই, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে।

কবি নজরুল ইসলাম কেবল মুসলমানের কবি হতে চাননি। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের চিন্তাধারায় আন্তরিক ও বিশ্বাসী থেকে তিনি সবার কবি হতে চেয়েছিলেন। সেজন্য সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পে বিভিন্ন ধর্মের অজস্র পৌরাণিক উপাদানাদি তিনি ব্যবহার করেছেন। একদিকে মুসলিম সংস্কৃতির চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য কীর্তন, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন।

এই সাম্যবোধ ও সহাবস্থানের শিক্ষা তিনি ইসলামেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে পেয়েছেন।

সামাজিক সুবিচার এবং অর্থনৈতিক সুবিচারের ওপর কবি খুবই গুরুত্ব দিতেন। সামাজিক সুবিচার, অর্থনৈতিক সুবিচার, ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাস নির্বিশেষে সব মানুষেরই পাওনা হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তিনি স্পষ্টতই সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁর সেই সাম্যবাদী চিন্তাধারার মূল উৎসটাও কিন্তু ইসলাম।

২ নভেম্বর ১৯৪০ (১৬ কার্তিক ১৩৪৭ ঃ ১ শাওয়াল ১৩৫৯)– তারিখ শনিবার ছিল ঈদ-উল্-ফেৎর।

৯ জানুয়ারি ১৯৪১ (২৫ পৌষ ১৩৪৭ ঃ ১০ যিলহজ্ব ১৩৫৯) তারিখ বৃহস্পতিবারে ছিল ঈদুজ্জোহা।

এই ঈদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ্ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে কবি বলেন ঃ

"কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামে সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ কোরবানী করতে হবে। একটা গরু কোরবানী করে সবাইকে ফাঁকি দেয়া যেতে পারে কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া সম্ভবপর নয়।

সকল ঐশ্বর্য, সকল বিভূতি আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা

www.pathagar.com

যায়, তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে— এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোনো ধর্ম এতবড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি।"

যে মনীষী কবি আমাদের জাতিসত্তার এবং জাতীয় জীবনের সব কিছুকেই অত্যন্ত গভীরভাবে খতিয়ে দেখে সমস্ত বিষয়েই পথনির্দেশ করে গেছেন, সেই তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদায় ধারণ করার, চর্চা করার ক্ষমতা আমরা ১৯৪৭-এর পর থেকে ক্রমে হারিয়ে ফেলছি। এটা তো আমাদের জাতীয় জীবন নিয়ে আর এক গবেষণার বিষয়। আমরা তো ক্রমে আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তাটাই হারিয়ে ফেলছি!

পাশ্চাত্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কেও নজরুল ব্যাপক পড়াশোনা করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কেবল নয়, পাশ্চাত্যের সাহিত্যকেও তিনি তাঁর আদর্শ করেননি। নজরুল সান্নিধ্যধন্য শান্তিপদ সিংহের স্মৃতিকথা এবং কবির লেখা 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি যারা পড়েছেন তারা বিষয়টি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবেন। 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের ওপর তাঁর পড়াশোনার পরিধিটা যে অনন্য সাধারণ এবং ব্যাপক সেটা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধিতে এনে শেষের দিকে তিনি এক জায়গায় বললেন ঃ

"ধূলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশী, তুরস্কের নেকাব পরা মেয়ের মোমের মতো দেহ!"

তাঁর বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য নিবন্ধটি 'প্রাতিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ (১৯৩২-৩৩)-এ। নজরুল এমন কিছু আদর্শ করতে চেয়েছিলেন যেটা মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থী নয়।

নজরুল বিশ্ব সাহিত্যে আদর্শ করতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যকে নয়, প্রাচ্যকে। বিশেষত প্রাচ্যের মুসলিম সাহিত্যকে।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যকে, বিশেষত ইসলামকে আমরা আদর্শ করলে ঐক্য, সংহতি, আত্মমর্যাদাবোধে এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতায় ও জাতিসত্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারতাম, নিজেদের মানবিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও আমাদের আগেকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতেও স্বনির্ভর থেকে বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানুষদের প্রতি সহাবস্থানের হাত বাড়াতে পারতাম। আমাদের এই হাতটা তখন আর ভিক্ষুকদের হাত, ভৃত্যের হাত হতো না; তাই বিশ্বের কোন উন্নত জাতির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতও হতো না।

www.pathagar.com